শতোত্তর রজত জয়ন্তী স্মরনিকা

১৯৮৩ – ২০০৭

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল

জি. টি. রোড, বর্ধমান

পিন-৭১৩১০১

শতোত্তর রজতজয়ন্তী
স্মরণিকা

প্রকাশক ঃ বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের পক্ষে
অরুণাভ চক্রবর্তী

প্রকাশকাল ঃ ২০০৭-০৮

প্রাপ্তিস্থান ঃ বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল,
জি. টি. রোড, বর্ধমান

প্রচ্ছদ ঃ শ্যামলবরণ সাহা

মুদ্রক ঃ সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

গ্রন্থস্বত্ব ঃ বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল
কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

বিনম্র নিবেদন

মিউনিসিপ্যাল স্কুল তার গৌরবের ১২৫তম বর্ষে পদার্পণ করল। শতোত্তর রজতজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হলো এই স্মারক গ্রন্থ। এই স্মারক গ্রন্থে বিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাভাবিক আমাদের শতবার্ষিকী সংখ্যা (প্রকাশকাল-১৯৮৩) থেকে অনেক লেখা পুনর্মুদ্রন করতে হয়েছে। শিক্ষক-জীবনী ও ছাত্র-জীবনী-তে বহু স্মরণীয় ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছে। অনুল্লেখিত সেই শিক্ষককূল যাঁদের ত্যাগ, সততা, নিষ্ঠা ও সেবাধর্ম এই বিদ্যায়তনকে গৌরবের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে তাঁদের সকলকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। ছাত্র-জীবনীতে অনুচ্চারিত রয়েছে বহু নাম—যাঁরা দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই বিদ্যামন্দিরের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, তাঁদেরকেও জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। বিদ্যালয়ের পত্রিকা ‘কাকলি’ ও ‘চিরন্তনী’-র স্মরণিকা থেকে ‘উজ্জ্বল সংগ্রহ’ এই শিরোনামে কয়েকটি লেখা পুনর্মুদ্রন করা হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছেন শিক্ষক শ্রী শান্তনু, শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্তী, শ্রী অভিজিৎ ঘোষ, শ্রী ফাল্গুনী মিস্ত্রী এবং শ্রী সুকান্ত মণ্ডল — তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। স্মারক উপসমিতির আহ্বায়ক শ্রী দেবাশিস মজুমদার ও দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং ১২৫ বছর উদ্‌যাপন কমিটির সম্পাদক শ্রী স্বপন বিশ্বাস নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে এই গ্রন্থটি প্রকাশে সাহায্য করেছেন। অভিনন্দন জানাই সাধনা প্রেসের কর্মীবন্ধুদের, যাঁদের নিরলস শ্রম এই স্মারক গ্রন্থের প্রকাশে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে। যাঁর কথা সবচেয়ে বেশি বলতে হয় তিনি আমাদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী অমিতজ্যোতি সামন্ত মহাশয়, যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা ছাড়া এত বড়ো কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। প্রাক্তন ছাত্র যাঁরা বিদ্যালয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে আর্থিক অনুদান ও বিজ্ঞাপণ দিয়েছেন তাঁদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ। অভিভাবক ও পরিচালক সমিতির সদস্যরা যেভাবে তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাতে আমরা অভিভূত।

বিগত বছরগুলিতে যে লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও সৃজনকর্মের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা মারা গেছেন তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই। দাঙ্গা ও দুর্ঘটনায় প্রাণ দিয়েছেন যাঁরা তাঁদের প্রতি জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা। আমরা আশাবাদি অভিভাবক, ছাত্র ও শিক্ষকের এই সম্পর্ক অতীতের মতোই ভবিষ্যতেও অটুট থাকবে।

অরুণাভ চক্রবর্তী

তারিখ ঃ ২১ ডিসেম্বর, ২০০৭ প্রকাশক

अर्चना दत्ता (मुखोपाध्याय)
विशेष कार्याधिकारी (जन सम्पर्क)
Archana Datta (Mukhopadhyay)
Officer on Special Duty (Public Relations)

राष्ट्रपति सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली -110004
President's Secretariat,
Rashtrapati Bhavan,
New Delhi -110004

MESSAGE

The President of India, Smt. Pratibha Devisingh Patil is happy to know that the Burdwan Municipal High School, Burdwan is celebrating its 125th Year.

The President extends her warm greetings and felicitations to the Principal, staff and the students of the School and wishes the Celebrations all success.

Officer on Special Duty (PR)

GOVERNOR OF WEST BENGAL

RAJ BHAVAN
KOLKATA 700 062

I am glad to learn that Burdwan Municipal High School is celebrating its 125th year anniversary.

I wish the celebration every success.

Gopalkrishna Gandhi

Raj Bhavan,
Kolkata,
December 10, 2007

सत्यमेव जयते

अध्यक्ष, लोक सभा
SPEAKER, LOK SABHA

No. HS/ RR/ M – 497/ 2007/ 26977

New Delhi
6 November, 2007

Message

I am happy to learn that Burdwan Municipal High School, Burdwan is celebrating 125th year of its foundation this year and is bringing out a Souvenir to mark the occasion.

Education is the most important agent of development. Throughout its long years of existence, the school has been making significant contributions by providing high level of education, and has earned great popularity for its dedicated service to the cause of education.

On this occasion, I congratulate the management, teaching and non-teaching staff and the students and wish the School a still brighter future.

Somnath Chatterjee

(Somnath Chatterjee)

सत्यमेव जयते

प्रणब मुखर्जी
PRANAB MUKHERJEE

जय हिन्द

विदेश मंत्री, भारत
MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS
INDIA

Message

I would like to extend my heartiest felicitations to the Burdwan Municipal High School on their 125th anniversary in November, 2007.

The school which was founded by the legendary Maharshi Debendranath Tagore has made an illustrious journey since its inception by playing a pivotal role in propagating the light of knowledge to the students.

I hope the school will achieve greater heights in the years to come.

I wish the school all success in their endeavour.

(Pranab Mukherjee)

Office : 172, South Block, New Delhi-110011 Tel : 23011127, 23011165 Fax : 23011463
Residence : 13, Talkatora Road, New Delhi-110011 Tel : 23737623, 23323042, 23737658

सत्यमेव जयते

NIRUPAM SEN

Minister-in-Charge
Departments of Commerce & Industries, Industrial Reconstruction & Public Enterprises and Development & Planning
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

No.F-1A/AD-1574 Date: 18.12.07

MESSAGE

It gives me much satisfaction to learn that Bardhaman Municipal High School is going to celebrate its 125th year from 4th to 6th January, 2008.

I sincerely hope that the institution will continue its efforts in the future for the betterment of proper education to its students that will enable them to shape their future.

I wish the students, the teachers and staff and everyone associated with its activities the very best.

(Nirupam Sen) 18/12

Shri Swapan Biswas
Secretary
125th Year Celebration Committee
Burdwan Municipal High School
P.O. & Dist. Burdwan

Writers' Buildings, Kolkata 700 001 • Ph : 2214 5919/3475 • Fax : 2214 4900 • E-mail : Sen.Nirupam@gmail.com

Partha De
Minister-in-Charge
Department of School Education
Government of West Bengal
☎ : (033) 2334 2256
(033) 2358 8858 (Fax)

NO 318/M(Message)/Edn/07

Dated, Kolkata 11.12.07 200

Message

I am glad to know that the Burdwan Municipal High School is celebrating its 125th Year.

It is even more praiseworthy that they are publishing a Souvenir on this occasion.

I convey to all associates my best wishes.

Yours,

11.12.07

(**Partha De**)
Minister-in-Charge.

Sri Amit Jyoti Samanta,
Teacher-In-Charge,
Burdwan Municipal High School,
G.T. Road, P.O. & District – Burdwan,
Pin – 713 101.

Manish Jain, IAS
District Magistrate & Collector
Burdwan, West Bengal, Pin-713101
Phone No: (Office):2662428
(Residence): 2625700
2625702
Fax : 91-342-2625703
PBX : 2662408-412 Extn. 100

e-mail : dm-burd@wb.nic.in

21st November 2007

MESSAGE

I am very happy to know that Burdwan Municipal High School, GT Road, Burdwan is going to celebrate its "**125th year Celebration**" this year in a befitting manner. It is learnt that the school authority is going to bring out a souvenir to commemorate the occasion.

The century old Burdwan Municipal High School is a prestigious institution of Burdwan town which started its journey 125 years ago. Completion of 125 years of any institution is a matter of pride. At present many personalities of teachers and taught associated with the institution are not with us. It will indeed be a very proud moment for the teachers and the students, past and present, when the school completes 125 years. I am sure that everyone associated with the school has pleasant memories of association with the school which they would like to recall.

While congratulating everyone associated with the 125th Celebration Committee and all teachers & students of the school, I would like to wish the school many more years of success ahead. I wish the **Celebration of the school a great success.**

(Manish Jain)

To
Shri Amit Jyoti Samanta,
Teacher-in-Charge,
Burdwan Municipal High School,
Burdwan

THE UNIVERSITY OF BURDWAN
BURDWAN, WEST BENGAL

Office : (0342) { 2634900 (Direct)
2533-913, 2533-914, 2533-917,
2533-918, 2533-919 (Ext. 225)

Resi. : (0342) { 2634444 (Direct)
2657715 (Krishnapur)
2533-913, 2533-914, 2533-917
2533-918, 2533-919, (Ext. 223)

Gram : BURDSITY, Fax : 91-0342-2530452
e-mail : vc@buruniv.ac.in
website : www.buruniv.ac.in

Professor Amit Kumar Mallik
Vice-Chancellor

28 November 2007

MESSAGE

I am glad to know that Burdwan Municipal High School has observed its 125th Year through a number of programmes spread over the year and the concluding functions will be held from 4th January to 6th January, 2008. A Souvenir will be published on this occasion and I am sure that reminiscence and reflections of persons connected with the renowned institution will be published in the Souvenir. I wish the concluding ceremony of 125th Year and the publication of the Souvenir all success.

(A K Mallik)

Teacher-in-Charge
Burdwan Municipal High School
P.O. & Dist. Burdwan.

Office of the Burdwan Municipality

From: - **Suren Mondal**
Chairman
Burdwan Municipality

Ph No: - 0342-2662518
" 2664121
" 2662777
Fax No: -0342-2560717

Memo No: - 1354/X(1)-6

Date: - 22.11.2007

Message

I am glad to know that Burdwan Municipal High School has been celebrating the 125th year of her existence with a year-long programme in the town.

It is a matter of pride that this school has occupied a special place in the state and particularly in the district Burdwan.

I am also happy to know that a souvenir will come to light on the occasion shortly.

I wish all success of the celebration ceremony and also warmly congratulate all concerned with the celebration committee and the students community at large.

Surendal 22/11/07
(Suren Mondal)
Chairman
Burdwan Municipality

To
Shri Amit Jyoti Samanta
Teacher – in – Charge,
Burdwan Municipal High School
G.T. Road, P.O. & Dist. Burdwan.
Pin. 713101.

Office of the Burdwan Municipality

From: - **Ainul Haque**
Vice - Chairman
Burdwan Municipality

Ph No: - 0342-2662518
" 2664121
" 2662777
Fax No: -0342-2560717

Memo No: - 543/E/XII-6 **Date: -** 26.11.07

Message

It is Pleasure to learn that the 125th year Celebration ceremony of Burdwan Municipal High School is being held in a befitting manner. It is also heartening to know that a souvenir is going to be published on this occasion shortly.

I wish every success of the celebration ceremony and convey my congratulation to the members of the committee and to the students fraternity.

23.11.07

Vice - Chairman
Burdwan Municipality

To
Shri Amit Jyoti Samanta
Teacher – in – Charge,
Burdwan Municipal High School
G.T. Road, P.O. & Dist. Burdwan.
Pin. 713101.

Phone No.(0342) 2662495(Office)
(0342) 2624400(Resi.)
Fax No.(0342) 2662495.

Peeyush Pandey, IPS
Superintendent of Police, Burdwan

MESSAGE

I am very glad to know that Burdwan Municipal High School is celebrating its 125th year. It is also learnt that to commemorate the important milestone of the above Institution a Souvenir will be brought out in this month.

I take this opportunity to convey my hearty congratulations to all the teachers, non-teaching staff, students and others who are associated with the observance of 125th year celebration of the above Institution and wish grand success of the same.

Thanking you.

4.12.07

Peeyush Pandey
Superintendent of Police, Burdwan.

Shri Amit Jyoti Samanta,
Teacher-in-Charge,
Burdwan Municipal High School,
Burdwan.

Sub-Divisional Officer
BURDWAN SADAR
Phone :
Office : 2662353 ~~562353~~
Residence : ~~563200~~ 2625212

D.O. No.....

Dated.....

Message

I am very happy to learn that Burdwan Municipal High School is going to observe the 125th year Celebration in their Institution and on this occasion a Souvenir will be published.

I wish grand success of the Celebration in all respect and convey my best compliments to all members of the celebration Committee.

27.11.07

[Subhas Sinha, W.B.C.S.(Exe.)]
Sub-Divisional Officer, Sadar (North), Burdwan.

To
Shri Amit Jyoti Samanta
Teacher-in-Charge,
Burdwan Municipal High School
Burdwan.

GOVT. OF WEST BENGAL
Office of the District Inspector of Schools (Secondary Education) Burdwan
P. O. & DIST.– BURDWAN
Phone No. : (0342) 562351

শুভেচ্ছা

সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দেশের আর পাঁচটা পুণ্যভূমির মতো বর্ধমান শহরের বেশ কিছু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা শিক্ষানুরাগী জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ভেবেছিলেন উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত পথ উন্মুক্ত হবে। শুরু হল সেই প্রচেষ্টা। স্থাপিত হল বর্ধমান শহরের প্রাণকেন্দ্রে শিক্ষাদানের পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা, ১৮৮৩ সালে স্বপ্ন সার্থক হল। শুরু হল বিদ্যালয়টির পথচলা।

তৎকালীন যুগের সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টা আজ সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় অবস্থান করছে। শহর ছাড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য শিক্ষার্থী দীর্ঘ ১২৫ বছর ধরে লাভ করে আসছে শিক্ষালাভের সুবর্ণসুযোগ। শিক্ষাগ্রহণান্তে দেশ বিদেশে কর্মরত থেকে তাঁরাও বৃদ্ধি করে চলেছেন প্রতিষ্ঠানটির গর্ব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিরও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। সেই স্মৃতি সামনে রেখে আগামী ৪-৬ জানুয়ারি ২০০৮ হতে চলেছে শতোত্তর রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান প্রকাশিত হতে চলেছে স্মরণিকা। যাতে থাকবে বিগতদিনের স্মৃতিচারণ, থাকবে আগামী দিনের দৃঢ় পরিকল্পনা।

বিদ্যালয়টি শতোত্তর সুবর্ণ জয়ন্তীর পথে সগর্বে এগিয়ে চলুক আজকের দিনে এই আমার আন্তরিক কামনা।

সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক
(মাধ্যমিক)
বর্ধমান

আমি ও বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল

১৯৭৮ সালের ১৩ই এপ্রিল এই বিদ্যালয়ে সহশিক্ষক হিসাবে যোগদান করেই উপলব্ধি করেছিলাম, যে বিদ্যালয়ে আমি এলাম তা কেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মানচিত্রে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। এই বিদ্যালয় ক্রীড়া, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই দেশ তথা বিশ্বকে বিভিন্ন সময়ে বহু কৃতীছাত্রকে উপহার দিয়েছে — যাঁরা তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর জ্ঞানের গভীরতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি আজও ছাত্র সমাজকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বেলিত করে। আমার যোগদানের পাঁচ বছরের মধ্যেই বিদ্যালয় ১০০ বছরে পদার্পণ করে। ওই সময়ে শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির তরুণতম সদস্য হিসাবে বিভিন্ন প্রাক্তন ছাত্র এবং শিক্ষকদের সাথে কাজ করেছিলাম, অংশগ্রহণ করেছিলাম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত পদযাত্রায় — সেই সুখস্মৃতি আজও আমার হৃদয়ের গভীরে দীপ্যমান। সেদিন ভাবিনি, ১৯৮৩ সালের এই তরুণতম সদস্যের হাতেই আবার ১২৫ বছর উদ্‌যাপনের পতকা বহন করার দায়িত্ব আসবে। অবশ্য এর মাঝেই ২০০২ সালে প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন চিরন্তনীর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০২ সালেই। 'চিরন্তনী'র পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল তার সাথে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। বিভিন্ন সময়ে এই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সাংগঠনিক কাজে নিজেকে যুক্ত রেখে ও এই বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধিতে সব সময় নিজেকে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করতে করতে কখন এই বিদ্যালয়ের সাথে একাত্ম হয়ে গেছি — তা খেয়াল করিনি। আজ বিদালয় ১২৫ বছরে পদাপর্ণ করছে — এই মুহূর্তে এই কর্মপ্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।

সময় বহমান। আমারও কর্মজীবনের প্রায় ত্রিশ বছর এই বিদ্যালয়ে কেটে গেল। এই ত্রিশ বছরে বিদ্যালয়ের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে পড়েছি আমিও, টের পাইনি কখন মিউনিসিপ্যাল স্কুলের সুখ-দুঃখের আবেগের সাথে আমি গভীরভাবে একাত্ম হয়ে গেছি। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে আমি উদ্যোগী হয়ে প্রাক্তন ছাত্র, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা আমি পেয়েছি, তার জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ছাত্রদের বহুদিনের দাবি মেনেই নির্মিত হয়েছে শৌচাগার, বিদ্যালয়ের 'শতোত্তর রজতজয়ন্তী ভবন' নির্মাণের কাজও সম্পূর্ণ হতে চলেছে। ছাত্র সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রদের জন্য আরও অনেক কিছু করতে হবে। বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এই বিদ্যালয় ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করবে — এই প্রত্যাশা আমাদের সকলের। এই বিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভবিষ্যতের ছাত্র সমাজকে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে — সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। বিদ্যালয়ের সেই ঐতিহ্যের ধারাকে আগামী প্রজন্মের যে ছাত্ররা ও শিক্ষকমণ্ডলী এগিয়ে নিয়ে যাবেন — তাঁদের জন্য রইল আমার অভিনন্দন ও আশীর্ব্বাদ।

শ্রী অমিতজ্যোতি সামন্ত
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

বর্ধমান পৌর উচ্চবিদ্যালয়
১২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন সমিতি

উপদেষ্টা সমিতি

শ্রী নিরুপম সেন— মাননীয় শিল্পমন্ত্রী
শ্রী উদয় সরকার — মাননীয় সভাধিপতি
শ্রী নিখিলানন্দ সর—মাননীয় সাংসদ
শ্রী নিশিথরঞ্জন অধিকারি— মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল, ত্রিপুরা
শ্রী বলাই রায়—মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল, প. ব.
শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল—মাননীয় চেয়ারম্যান, বর্ধমান পৌরসভা
শ্রী আইনুল হক— মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান, বর্ধমান পৌরসভা
শ্রী সুভাষচন্দ্র সিংহ — এস. ডি. ও., বর্ধমান সদর
শ্রী তপন বসু — ডি. আই. মাধ্যমিক বিভাগ, বর্ধমান
শ্রী অরিন্দম কোনার (প্রাক্তন ছাত্র)
শ্রী তাপস ব্যানার্জী— পি. পি.
শ্রী শৈল মিত্র (প্রাক্তন ছাত্র)
শ্রী সত্যজিৎ চৌধুরী (প্রাক্তন ছাত্র)
শ্রী ললিত কুমার মজুমদার (প্রাক্তন ছাত্র)
শ্রী শিশির রঞ্জন ভট্টাচার্য (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, প্রাথমিক বিভাগ)
শ্রী অনিল ব্যানার্জী (প্রাক্তন শিক্ষক)
শ্রী বিমল চ্যাটার্জী
শ্রী অজিত মুখার্জী
দুর্গাশিবপ্রসাদ রায় (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক)
মহঃ সৈয়দ মসীহ, মুখ্য সচেতক
শ্রীমদনমোহন রায় (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক)
শ্রী শক্তিপদ কার্ফা, জাতীয় শিক্ষক (প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)
শ্রী মুরারী মোহন কুমার

১২৫ বছর উদ্‌যাপন সমিতি
(কার্যকরী সমিতি)-র সদস্যবৃন্দ

১। মাননীয় শ্রীযুক্ত অমিতজ্যোতি সামন্ত
২। শ্রীসুনীল কুমার চক্রবর্তী
৩। শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষ
৪। সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেন
৫। চৌধুরী সৈয়দুল ইসলাম
৬। শ্রী বলরাম যশ
৭। শ্রী রবীন্দ্রনাথ দত্ত
৮। শ্রীযুক্ত স্বপন বিশ্বাস
৯। শ্রী অরুণাভ চক্রবর্তী
১০। শ্রী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১। শ্রী তরুণ কুমার খান
১২। শ্রী অভিজিৎ ঘোষ
১৩। শ্রী দেবু গোস্বামী
১৪। শ্রীমতী রীতা মুখার্জী
১৫। শ্রী চঞ্চল রায়
১৬। শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭। শ্রী প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮। শ্রী সজল রাজা
১৯। শ্রী পবিত্র গাঙ্গুলী
২০। শ্রী সত্যদর্শন দত্ত
২১। শ্রী অশোক সামন্ত
২২। শ্রী সূর্য দে
২৩। শ্রী শান্তনু সেন হাজরা
২৪। শ্রী শ্যামল রায়
২৫। ডঃ অমিতাভ মুখার্জী
২৬। শ্রী কেষ্ট চৌধুরী
২৭। শ্রীমান্ হর্ষ ঘোষ (ছাত্র প্রতিনিধি)
২৮। শ্রী অরিত্র সাহা (ছাত্র প্রতিনিধি)
২৯। শ্রী নবেন্দু মাজি (ছাত্র প্রতিনিধি)

ক্রীড়া উপসমিতি

আহ্বায়ক —
১। শ্রী রবীন্দ্রনাথ দত্ত
২। শ্রী গোপাল ব্যানার্জী

সদস্য ঃ
১। শ্রী সজল ব্যানার্জী
২। শ্রী মদনচন্দ্র সিং
৩। শ্রী সৌমেন গাঙ্গুলী
৪। শ্রী রণজিৎ মুর্মু
৫। শ্রী রঘুনাথ ঘোষ
৬। শ্রী দেবাঞ্জন মজুমদার
৭। শ্রী সাগির হোসেন
৮। শ্রী সুবোধ চ্যাটার্জী
৯। শ্রী সত্যনারায়ণ রায়
১০। শ্রী পার্থ চট্টরাজ
১১। শ্রী কমলেশ ঘোষ
১২। শ্রী দেবাশিষ কোনার
১৩। শ্রী অপরেশ মিত্র
১৪। শ্রী বরুণ পাল
১৫। শ্রী আশিস বটব্যাল
১৬। শ্রী শ্যামল রায়
১৭। শ্রী উৎপল দাস

সাংস্কৃতিক উপসমিতি

আহ্বায়ক ঃ
১। শ্রী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
২। শ্রী অনুপম চট্টোপাধ্যায়

সদস্য ঃ
১। শ্রী শান্তনু মিত্র
২। শ্রী কমল কুমার গোস্বামী
৩। শ্রী বুদ্ধদেব সাহা
৪। শ্রী শ্যামাপ্রসাদ থাণ্ডার
৫। শ্রী তাপস চ্যাটার্জী
৬। শ্রীমতী রীতা মুখার্জী
৭। শ্রী স্বরূপেন্দু বিশ্বাস
৮। শ্রী সন্তোষ কুমার গায়েন
৯। শ্রী সমীর রায়
১০। শ্রী কল্লোল কোনার
১১। শ্রী কেশব সরকার
১২। ডঃ সমীর হাজরা
১৩। মেহেবুব হাসান
১৪। দেবাশিস মজুমদার
১৫। সুতনু মিত্র
১৬। শ্রীমতী সোমা সাহানা
১৭। রীনা মাঝি
১৮। দেবদ্যুতি কোনার
১৯। শ্রীমতী সোমা রায়

স্মারক (Souvenir) উপসমিতি

আহ্বায়ক ঃ
১। শ্রী শম্ভু হরি পান
২। শ্রী দেবাশিষ মজুমদার

সদস্য ঃ
১। শ্রী সমীর কুমার সামন্ত
২। শ্রী চিন্ময় কুমার বিশ্বাস
৩। শ্রী ফাল্গুনি মিস্ত্রি
৪। শ্রী সুধারামন সামন্ত
৫। শ্রী রামকৃষ্ণ কর্মকার
৬। শ্রী শুভ্রকমল হাজরা
৭। ডঃ উজ্জ্বল সিদ্ধান্ত
৮। ডঃ মৈনাক মুখার্জী
৯। শ্রী সুজয় মিত্র
১০। শ্যামলবরণ সাহা
প্রকাশক — শ্রীঅরুণাভ চক্রবর্তী

প্রচার ও অলংকরণ উপসমিতি

আহ্বায়ক ঃ
১। শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্তী
২। ড. সায়ন দত্তরায়

সদস্য ঃ
১। শ্রী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। শ্রী মনিকাঞ্চন ভট্টাচার্য
৩। কাজী মহঃ আবুল হায়াত
৪। শ্রী গদাধর রূজ
৫। শ্রী চঞ্চল কুমার রায়
৬। শ্রী দেবাশিস দত্ত
৭। শ্রী বুধন টুডু
৮। শ্রী রবীন্দ্রনাথ বেসরা
৯। শ্রী লোহারাম হাজরা

১০। শ্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ
১১। শ্রী নিরোদ দে
১২। শ্রী সনৎ ব্যানার্জী
১৩। শ্রী বিদ্যাসুন্দর রাউৎ
১৪। শ্রী জয়দেব ঘোষ
১৫। ডাঃ নিতাই পরামানিক
১৬। শ্রী সোমেশ্বর মুখার্জী
১৭। শ্রী অভিজিৎ কোনার
১৮। শ্রী অমিতাভ মজুমদার

অর্থ উপসমিতি

আহ্বায়ক ঃ
১। শ্রী কৌশিক রায়

সদস্য ঃ
১। শ্রী বলরাম যশ
২। শ্রী সোমনাথ মল্লিক
৩। শ্রী অনাথবন্ধু ঘোষ
৪। শ্রী সুকান্ত মণ্ডল
৫। শ্রী অমিত মণ্ডল
৬। শ্রী দেবব্রত গোস্বামী
৭। ডাঃ সুব্রত কুণ্ডু
৮। ডাঃ সত্যপ্রিয় পাল
৯। শ্রী কল্যাণ মুখার্জী
১০। শ্রী দেবনাথ নাগ
১১। ডাঃ সুমিত ব্যানার্জী
১২। ডাঃ তারক ব্যানার্জী
১৩। ডাঃ বিশ্বনাথ ঘর
১৪। ডাঃ স্বপন ব্যানার্জী
১৫। ডাঃ মামুদ হোসেন
১৬। ডাঃ অধীররঞ্জন বিশ্বাস

খাদ্য উপসমিতি

আহ্বায়ক ঃ
১। শ্রী সৌমেন ঘোষ

সদস্য
১। শ্রী জয়দেব কুণ্ডু
২। শ্রী গোপাল চন্দ্র সাঁতরা
৩। শ্রী সজিৎ কুমার রায়
৪। শ্রী অভিজিৎ ঘোষ
৫। শ্রীমতী হেলেন পাপড়ি ঘোষ
৬। শ্রী শম্ভুনাথ কোলে
৭। শ্রী শরদিন্দু পান
৮। শ্রী শ্যামল রায়
৯। শ্রী সত্যজিৎ দত্ত
১০। শ্রী প্রদ্যোৎ দত্ত
১১। শ্রী রবীন্দ্রনাথ সাঁতরা
১২। শ্রী শান্তনু সেন হাজরা

দপ্তর উপসমিতি

আহ্বায়ক ঃ
১। শ্রী দেবাশিস দত্ত
২। শ্রী সঞ্জয় মণ্ডল
৩। শ্রী সুখেন্দু মজুমদার

সদস্য ঃ
১। শ্রী দেবব্রত গোস্বামী
২। শ্রী শরদিন্দু পান

সংগ্রহশালার জন্য গঠিত কমিটি

১। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
(অমিতজ্যোতি সামন্ত)
২। সহপ্রধান শিক্ষক, অস্থায়ী
(শ্রী সুনীল কুমার চক্রবর্তী)
৩। শ্রী স্বপন বিশ্বাস
৪। শ্রী অরুণাভ চক্রবর্তী
৫। শ্রী সজল রাজা
৬। শ্রী প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। শ্রী পরেশ দত্ত
৮। শ্রী উৎপল সাহা
৯। শ্রী অনুপম চট্টোপাধ্যায়
১০। শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্তী

শ্রদ্ধার দর্পণে বিম্বিত কয়েকটি প্রিয় মুখ

১৯৮৩-এর পরবর্তী সময়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন যে শিক্ষককুল তাঁদের কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা হল। এই বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল যাঁদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, সেবা, প্রেমের ওপর এই গৌরবোজ্জ্বল ভিত্তি স্থাপন করেছে সেই শিক্ষকদের কথা বর্তমান প্রজন্মেরও জানা প্রয়োজন, কারণ অতীত ঐতিহ্যকে জানতে হলে, সেই উত্তরাধিকারের গৌরব গাথাকে জানতে হলে এই শিক্ষাব্রতীদের জানতেই হবে।

অমলেন্দু চক্রবর্তী ঃ ১৯৭৬ সালের ২৬ জুন প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দেন তিনি। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁকে দ্রুত ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও পাঠদানের দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। তাঁর সময়েই বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। 'শতবার্ষিকী ভবন' (বর্তমানে প্রাথমিক বিভাগ) নির্মাণের পরিকল্পনা তাঁর সময়েই গ্রহণ করা হয়েছিল। বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরাজিতে তাঁর সুগভীর জ্ঞান আজও সকলের স্মরণে আছে। ১৯৮৯ সালের ২৮ জুলাই এই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর মৃত্যু হয়।

রাজেন্দ্রনাথ নাগ ঃ বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন তিনি। তাঁর পাঠদান পদ্ধতির গুণেই ইংরাজির মত একটি বিষয় ছাত্রদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠত। বিদ্যালয়ের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। তাঁর মৃত্যুর ফলে প্রকৃত অর্থেই শিক্ষা জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

কমলকৃষ্ণ ঘোষ ঃ বংলার শিক্ষক রাসবিহারী অধিকারীর স্থানে ১৭.৬.১৯৪২-এ তিনি এই বিদ্যালয়ে বাংলার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। তাঁর সাথে এই বিদ্যালয়ের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাব্য ও প্রবন্ধ রচনা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘকাল এই বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতার সেবাধর্মে নিয়োজিত ছিলেন। ৩.১১.১৯৮১তে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'কাকলি'র প্রায় প্রতিটি সংখ্যার নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। তাঁর কথা মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্ররা কখনও ভুলবে না।

গদাধর রক্ষিত ঃ এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন তিনি। ১৯৬৩ সালে পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য (১০ টাকা) বৃত্তি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই বিদ্যালয়ে ইংরাজির শিক্ষক রূপে যোগদান করেন। অত্যন্ত অমায়িক, নম্র ও মৃদুভাষী এই শিক্ষক ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয়। দীর্ঘকাল এই বিদ্যালয়ের সেবা করে ৩১.৫.১৯৮৩-তে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্রদের হৃদয়ে এখনও তাঁর স্মৃতি অমলিন।

পাঁচুগোপাল রায় ঃ ২২.৭.১৯৫১-তে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর একটানা এখানে কাটিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১.২.১৯৮৪-তে। তিনি 'সাহিত্যিক' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। সুপণ্ডিত এই শিক্ষক পরম শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের সাহিত্যসভার নিয়মিত সদস্য ছিলেন। বিদ্যালয়ের ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্যোগ প্রথম যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর লেখা 'হে অতীত, কথা কও' (বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সংকলনে প্রকাশিত, ১৯৮৩) প্রবন্ধটিকে একটি গ্রন্থাগারে প্রকাশ করা হয়েছে। যে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বিদ্যালয়ের ইতিহাস রচনার কাজটি শুরু করেছিলেন, তা পরবর্তী প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে। এই শিক্ষাব্রতীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছিল।

ভোলানাথ ভট্টাচার্য ঃ ইতিহাসের শিক্ষকরূপে এই বিদ্যালয়ে তিনি ২২.৭.১৯৫১-তে যোগদান করেন। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি, তাঁর সুমধুর ব্যবহার, তাঁর সুললিত কণ্ঠ আজও ছাত্রদের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে। তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন। ১৯৮৩ সালের বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত 'শতবর্ষের বনস্পতি, শতেক তাহার শাখা' (গীত রচনা ঃ শ্রী পাঁচুগোপাল রায়) সংগীতটির সুরারোপ করেছিলেন তিনি। বিদ্যালয়ের সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ করে তিনি যে মহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা বিরল। এই শিক্ষাব্রতীর মৃত্যুর বেদনা আজও আমরা ভুলতে পারিনি।

মৃত্যুঞ্জয় খান ঃ ১৯৫২ সালে এই বিদ্যালয়ে অঙ্কের শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। পাঠদান পদ্ধতিকে একটি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কঠোর অনুশাসন বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করেছিল। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গৌরবের আসনে যাঁরা অধিষ্ঠিত করেছেন, সেই নিষ্ঠাবান সেবাব্রত অনুসরণকারী সৈনিকদের অগ্রগণ্য ছিলেন তিনি। বর্ধমান বইমেলা কর্তৃপক্ষ শিক্ষকতায় তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করেছিল। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি এই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে প্রকৃত অর্থেই শিক্ষাজগতের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিত্যানন্দ মিত্র ঃ বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল থেকে এই বিদ্যালয়ে এসেছিলেন তিনি বাংলার শিক্ষকরূপে। শ্রেণিকক্ষে তাঁর পাঠদান ও শব্দ প্রয়োগ ছিল দেখার মত। সেই সময়ে বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পুরোধা। শহর বর্ধমানে তাঁর অত্যন্ত পরিচিতি ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক অসামান্য শিল্পী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ও গায়কী ছিল অতুলনীয়। তিনি আছেন, আমাদের মধ্যেই আছেন– ''তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।''

বিমলপ্রসাদ কুমার ঃ এই বিদ্যালয়ে রসায়নের শিক্ষকরূপে যোগ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল এই বিদ্যালয়ে নিষ্ঠার সাথে কর্ম সম্পাদন করে অবসর গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়ের একজন একনিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন তিনি।

কামাখ্যা চৌধুরী ঃ অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন ১৯৮৩ সালের ৬ জানুয়ারি। ইংরাজির শিক্ষক রূপে ছাত্রদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, ১৯৮৪ সালে ১৮ ডিসেম্বর কিডনির জটিল অসুখে তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে।

কালীকৃষ্ণ মিত্র ঃ ১.২.১৯৪২-এ এই বিদ্যালয়ে যোগ দেন কালীকৃষ্ণ মিত্র। ১৭.৬.১৯৪২-এ তাঁর চাকরি স্থায়ী হয়। দীর্ঘকাল এই বিদ্যালয়ের সেবা করে ৩১.১২.৭৯-তে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ভাবমূর্তির অন্যতম রূপকার তিনি। তাঁর পাঠদান দক্ষতা ছিল অবিস্মরণীয়। তিনি অবসর গ্রহণের পূর্বে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধানের পদে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর অসংখ্য কৃতী ও গুণমুগ্ধ ছাত্র ভারতে এবং ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের হৃদয়ে এই প্রিয়তম শিক্ষকের স্মৃতির অনির্বাণ শিক্ষা সদা প্রজ্জ্বলিত থাকবে।

কালীকুমার মিশ্র ঃ এই বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে ১৯৪৯-এ শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘকাল এই বিদ্যামন্দিরের সেবা করে ১৯৭৮-এর ৩০ নভেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

শক্তিকুমার মণ্ডল ঃ প্রথম জীবনে এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে মাধ্যমিক বিভাগে এসেছিলেন। তিনি একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ইংরাজির শিক্ষক ছিলেন। তাঁর শারীরিক অসুবিধার কথা বলে কখনও কাউকে বিব্রত করেননি। এই অমায়িক শিক্ষকের কথা তাঁর ছাত্ররা ভোলেননি।

জগজ্জ্যোতি মিত্র ঃ ১৯৪৮-এর ১৪ মে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর পাঠদানের বিষয় ছিল ইতিহাস। ১৯৮৩ সালে শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় তিনি এই বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে বিদ্যালয়ের বহু উত্থান-পতনের তিনি সাক্ষী। বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল সুগভীর – আজও সকলে তা স্মরণ করেন।

গৌতম চৌধুরী — এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

শুভ্রভানু দত্ত

আকুই স্কুল থেকে ১৯৮৩ সালে আমাদের বিদ্যালয়ে রসায়নের শিক্ষকরূপে যোগ দেন তিনি। ১৯৯৬ সালে হঠাৎ তিনি পরলোক গমন করেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি ছাত্রদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। শিক্ষকতার বাইরে তিনি খুব ভালো আবৃত্তি শিল্পী ছিলেন। তাছাড়া তিনি খুব ভালো বেহালা বাজাতে পারতেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল – তিনি খুব বড়ো মনের মানুষ ছিলেন। বিদ্যালয়ের ক্যানভাসে তাঁর স্মৃতি আজও অমলিন হয়ে আছে। অভিনয় দক্ষতাও উল্লেখের দাবি রাখে। বিদ্যালয় শতবর্ষে তাঁর অভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। বিজ্ঞানমনস্ক এই মানুষটির ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অগাধ বিচরণ এবং সাহিত্য অনুরাগ বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কালের ধারা বেয়ে জীবন স্রোতস্বিনীর নিরন্তর প্রবাহ অসীমের পানে ধেয়ে চলেছে। সেই প্রবাহিনীর তরঙ্গে তাল মিলিয়ে আমার স্মৃতির তরীখানি বেয়ে চলেছি সময়ের বিভিন্ন তীরে কিছু অমূল্য রত্ন সংগ্রহের প্রয়াসে। এই রত্ন সম্ভারের একটি আমাদের প্রিয় গৌতমদা। গৌতমদা অর্থাৎ অকাল প্রয়াত গৌতম চৌধুরী। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন ঐতিহ্যমণ্ডিত শতোর্ধ রজত-জয়ন্তী বর্ষ অতিক্রান্ত বর্ধমান পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষক– এক অতুলনীয় সম্পদ। তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত ছিল ঐ বিভাগ। আর আমরা যারা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি উপভোগ করেছি সেই প্রজ্ঞার দ্যুতি, প্রতিভার উষ্ণতা; রোমাঞ্চিত হয়েছি উদ্বেলিত হয়েছি বারংবার। তাঁর দৃঢ় চারিত্রিক গুণাশ্রিত বৈশিষ্ট্য আমাদের হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে আছে। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে বসে আমার এই লেখনী ভাষার প্রতুলতার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে অনুক্ষণ। তবুও আবেগের তাড়নায় দু-চার কথা আজ অনায়াসে প্রকাশন্মুখ।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে গৌতমদা আমাদের বিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে বাঁকুড়া জেলার একটি বিদ্যালয়ে তিনি প্রায় দশ বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে আমি যখন এই বিদ্যালয়ে যোগদান করি তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ক্রমশঃ বন্ধুত্বের গভীরতায় তাঁর স্নেহের উষ্ণ পরশ পাই। সেই স্নেহার্দ্র ভালোবাসায় তাঁর বিরাটত্বের যে সন্ধান পেয়েছিলাম সে কথা লিখতে গেলে আমার ভাষার মরুভূমিতেও হয়তো মরুদ্যান রচিত হয়ে যাবে। তাঁর অবাধ সাবলীল বিচরণ কেবলমাত্র রসায়ন শাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, স্বচ্ছন্দ সন্তরণ ছিল সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতি, সঙ্গীতেও। খেলাধূলায় ছিল সহজাত দক্ষতা আর ছিল অদম্য উৎসাহ। সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধ ছিল স্ফটিক স্বচ্ছ। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি ঘটনা। কোনো এক সময়ে একটি ছেলে অভাবের তাড়নায় কোন এক স্কুলের ছাত্র হিসাবে মেকী পরিচয় দিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার টাকা চেয়ে আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে আসে। কিন্তু গৌতমদার চোখে সে ছেলেটির প্রবঞ্চনা ধরা পড়ে যায়। অথচ তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে কিংবা তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার না করে তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে দেন যাতে সে কিছু খাবার কিনে খায় এবং বাসে ভাড়া দিয়ে তার গ্রামে ফিরে যায়। তাকে বলেন যে সে প্রবঞ্চনার আশ্রয় না নিয়ে সৎ ভাবে নিজের কাজ করে। এই ঘটনার কেন্দ্রে যে সত্যের আলোকবর্তিকা জেনে ছিলেন তার সারমর্ম ছিল, ছেলেটির সবকিছু মিথ্যে হলেও খিদে ছিল সত্য। এ যেন এক সম্যবাদী সমব্যাথীর অত্মোপলব্ধি।

এই মহান বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের বর্ষে তিনি শিক্ষকতা করতে এসে সেই উৎসবে সামিল হয়েছিলেন এবং নিশ্চিতভাবে এই শতোর্ধ রজত জয়ন্তী বর্ষেও তিনি হয়তো সক্রিয়ভাবে সামিল হতেন। কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে ১৪০৩ বঙ্গাব্দে শ্রাবণের এক তমসাচ্ছন্ন নিশীথে অকালে হারিয়ে গেলেন চিরতরে। বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। তাই কাজী নজরুলের গানের ভাষায় সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করি–

''তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো কভু / আমরা অবোধ অন্ধ মায়ায় তাইতো কাঁদি প্রভু।''

হেমেন্দ্রমোহন বসু ঃ মহাপ্রাণ আচার্য

শ্রীকালীপদ সিংহ

একটি জীবনী-গ্রন্থে পড়েছিলাম, দার্শনিক কান্ট যখন বাড়ীর বাইরে বেড়াতে বেরুতেন তখন অনেকেই ঘড়ি মিলিয়ে নিত। জীবনযাত্রার মধ্যে ছিল তাঁর একটা অপূর্ব নিয়মানুবর্তিতা। বর্তমানে আমরা এই রকম মানুষকে দেখেছি। তাঁর নাম হেমেন্দ্রমোহন বসু। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে সাতাশ বছর শিক্ষকতার পর ১৯৩১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বহুদিন ধরে সেকেণ্ড মাস্টার (অর্থাৎ অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার) ছিলেন বলে লোকে তাঁকে 'সেকেণ্ড মশাই' বলতেন — কদাচিৎ কারো মুখে শুনেছি 'হেমেন্দ্রবাবু' নাম। তাঁর জীবনযাপন প্রণালীতে ছিল একটি সুনিয়মিত ছক — নড়বার চড়বার উপায় ছিল না। চারটের সময় তিনি বেরিয়ে পড়তেন লাঠি হাতে পার্কাস রোড দিয়ে, উদ্দেশ্য ভ্রমণ। তাঁকে দেখেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠত, 'ঐ রে চারটে বেজে গেছে, সেকেণ্ড মাস্টারমশাই বেরিয়ে পড়েছেন।'

আজকাল 'পাংচুয়ালিটি', ডিসিপ্লিন' কথাগুলি সমাজ থেকে অভিধানে নির্বাসিত হয়েছে, কিন্তু মস্টার মশাইয়ের জীবনে এ দুটির কোনো দিন ব্যতিক্রম ঘটেনি। অন্যেরা না মানলেও তিনি নিজেকে নিয়মবন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। টাউন হলে অথবা স্কুলে কিংবা সাহিত্যসভায় মিটিং হবে, নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে তিনি উপস্থিত। অনেকেই দেরি করে যেতেন, কিন্তু তিনি আদৌ দেরি করতেন না। চিঠি লেখার ব্যাপারে দেখেছি, প্রতিটি চিঠির তিনি সযত্নে জবাব দিচ্ছেন, জবার দেবার পর প্রাপ্ত চিঠির উপর 'রিপ্লায়েড' কথাটি লিখে নীচে তারিখ বসিয়ে দিয়ে বাণ্ডিলভুক্ত করে রাখছেন। ভবিষ্যতে উত্তর না পেলে পুনরায় চিঠি লেখার সময় আগের চিঠির রেফারেন্স দিতেন। তাঁর হাতের লেখা ছিল জড়ানো, বড় বড় গোল গোল অক্ষর, দূর থেকে মনে হতো ঠিকানার ঘরে তালগোল পাকানো ছবি। আমি অনেকদিন ধরে তাঁর চিঠি লেখার কাজ করেছি। ভয়ানক কঠিন কাজ। একটু অন্যমনস্ক হবার জো ছিল না। ইংরেজি, বাংলা বানান ঠিক হওয়া চাই, কমা, সেমিকোলন, ফুলস্টপ, ড্যাশের এদিক-ওদিক হবার উপায় ছিল না। সামান্য ত্রুটিতেই অগ্নিশর্মা হয়ে যেতেন। সে চেহারা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝবেন তিনি কি রকম ছিলেন। চিঠি লেখার মধ্যে অনেক কিছু থাকতো, নানান পয়েন্ট তিনি নীল লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দিতেন। নীলের অর্থ অল্প জরুরী, আর লালের অর্থ মাস্ট, না করলেই নয়। বিচিত্র বর্ণের এই চিঠি একটি অপূর্ব বস্তু হয়ে উঠত। তিনি চিঠি লিখতেন অনেক প্রাক্তন ছাত্র আর আত্মীয় স্বজনকে। আমার এইটুকু মনে আছে, তাঁর বন্ধু, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ডি. কে. মুখার্জিকে তিনি প্রায়ই লিখতেন। ডি. কে. মুখার্জির হাতের লেখা ছিল সার সার ক্ষুদ্র পিপীলিকার মতো। আমি পাঠোদ্ধার করতে পারতাম না, তিনি ঠিক বুঝতে পারতেন। বোম্বাইয়ের টীর্চার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ কর ছিলেন তাঁর ছাত্র, মাঝে মাঝে তাঁর খোঁজ খবর নিতেন। ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জিকে তিনি প্রায়ই চিঠি দিতেন। কলকাতায় পড়বার সময় তিনি আমার হাত দিয়ে জ্ঞানবাবুর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, উপরের ঠিকানাটা নিজেই লিখেছিলেন। জ্ঞানবাবু দিল্লীর কাজ সেরে সায়েন্স কলেজে সেইদিন ফিরেছেন, আমি দেখা করে চিঠি দিতেই তিনি তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। মনে হয় ওটা যেন চিঠি নয়, মাস্টারমশাইয়ের সশরীর উপস্থিতি। বারংবার নিজের অপরাধের কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে বেয়ারার হাত দিয়ে পোস্ট করিয়ে তবেই তিনি আমার সঙ্গে কথা

বলেছিলেন। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে জ্ঞানবাবু অতীতের কথা বলতে লাগলেন, 'স্কুলে মাস্টার মশাই এই দরিদ্র ছাত্রটিকে সাহায্য না করলে আজকে এই আসনে বসতে পারতাম না।' অত বড় বিজ্ঞানীর চোখ দুটি কৃতজ্ঞতার স্নিগ্ধ আলোকে ভরে উঠেছিল। এই হচ্ছে মাস্টার মশাইয়ের চিঠি, অন্তরের স্নেহমাখানো কথামালা। কাউকে তিনি যেন ভুলতে দিতেন না। ছাত্রেরা তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। দুটি জায়গায় আত্মীয় স্বজনদের চিঠি দিতেন—একটি মনোহরপুকুর রোডে, অপরটি বিহারের ভাগলপুরে ওয়াটার ওয়ার্কসে। এই দুটি জায়গায় তিনি মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা নিয়ে যতখানি না ব্যস্ত হতেন, তার চেয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত হতেন শুভযাত্রার দিনক্ষণ নিয়ে। প্যারীচাঁদ মিত্র লেনের কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় শুভক্ষণ দেখে দিয়ে বলতেন, 'জীবনে তো উনি সংসার করলেন না, শুভক্ষণের জন্য এত ব্যস্ততা কেন?' হয়তো এইটিই ছিল তাঁর দুর্বলতা। অথচ কোনোদিন ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করতে কিংবা তীর্থযাত্রা করতে দেখিনি।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৫) মাস্টারমশাই মিউনিসিপ্যাল স্কুলে শিক্ষকতা করতে শুরু করেন। তার আগে তিনি কলকাতাতেই কাটিয়েছিলেন। ওখান থেকে বি. এ. পাশ করেন, ওকালতি পাশ করার ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠেনি। কলেজ জীবন থেকেই সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সেই পরিচয় আমৃত্যু ছিল। মাস্টারমশাই নানা ধরনের গল্প করে আড্ডা জমাতে ভালোবাসতেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদের বেশ একটি বড় আড্ডা ছিল কলকাতায়। মাস্টারমশাইয়ের মুখে শুনেছি, দেশনেতা গোখলে কলকাতার আড্ডায় এসে হেমেন্দ্রবাবুর খোঁজ করছিলেন, সেই সময় দুই হেমেন্দ্র অনুপস্থিত, আড্ডার জনৈক সদস্য হেমেন্দ্রবাবু বলতে হেমেন্দ্রমোহন বসু মনে করে তাঁকে মাস্টারমশাইয়ের কাছে নিয়ে যান। গোখলে ও মাস্টারমশাইয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলল, বন্ধুত্বও জমে উঠল। হঠাৎ সংবাদপত্রের প্রসঙ্গ ওঠায় মাস্টারমশাই বুঝতে পারলেন, নামের গোলমালে গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে গোখলেকে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বাড়ী নিয়ে যান। গোখলের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের বড় জামাই শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর (বিহারীলাল চক্রবর্তীর) সঙ্গেও তাঁর বিশেষ আলাপ ছিল। ভাগলপুরে বনফুলের (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) সঙ্গেও পরিচয় হয়। অনেক কাহিনীই তিনি বলতেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে ছিল ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ থেকে কলকাতার ইতিহাস আর শিক্ষক-জীবনের ঘটনাবলী। তাঁর বর্ণনার গুণে অতীতের ঘটনাগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠত।

বর্ধমানের দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল তাঁর প্রাণের সামগ্রী। একটি মিউনিসিপ্যাল স্কুল, অপরটি সাহিত্য-সভা। অবসর গ্রহণের পরও তিনি স্কুলটিকে ভুলতে পারেন নি। প্রত্যেক দিন বেলা চারটের পর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তেন, লক্ষ্য মিউনিসিপ্যাল স্কুল। অফিসে গিয়ে সকলের সঙ্গে গল্প। নতুন বিল্ডিং-এ অফিস উঠে আসার পর তিনি হলের পাশে, এখন যেখানে হেডমাস্টারের ঘর, সেখানে একটি চেয়ারে বসে থাকতেন রাস্তার দিকে তাকিয়ে। পরিচিত কোনো ছাত্র গেলে লাঠি উঁচিয়ে ডাকতেন, 'এই শুনে যা'। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। বার্মা-প্রত্যাগত উদ্বাস্তু দীনেন্দ্রনাথ সোম আমার কাছে গল্প করেছিলেন, বর্ধমানে ঘরের সন্ধানে এসে একদিন থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি স্টেশনে। হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন 'দীনেন' 'দীনেন' বলে ডাকছেন। আমি গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড থেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের পশ্চিম দিকে এক বৃদ্ধ ছড়ি তুলে ডাকছেন। পঁচিশ বছর পর বর্ধমানে ফিরছি। কোনো বন্ধুই আমাকে চিনতে পারেনি, কিন্তু মাস্টার মশাই ঠিক চিনেছেন। এতদিন পর আমাকে চিনলেন কি করে? এই প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, 'তোর চলার ভঙ্গী একটুও বদলায়নি, তাই ভাবলাম দীনেন ছাড়া আর কেউ হোতে পারে না।' আরও আশ্চর্য, বাড়ী ভাড়ার সমস্যা তিনিই করে দিলেন। আজ মাস্টারমশাই আমাদের অভিভাবক, আমি নিশ্চিন্তে কলকাতায় কাজ করি। মাস্টার মশাই অবসর জীবনটা এইভাবেই কাটিয়েছেন। ছাত্রদের বিশেষত পুরোনো ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেই তাঁর বিকেলটা কেটে যেত। তাছাড়া স্পোর্টস আর সরস্বতী পুজোর সময় নিমন্ত্রণের খামের উপর নাম-ঠিকানা লিখতে ব্যস্ত থাকতেন। একটা খাতা ছিল, তাতে শুধু নাম-ঠিকানা ছিল না, নামের সঠিক বানান ভালো করে লেখা থাকতো; কারণ সেযুগে নামের বানানে হেরফের হলে মালিক চিঠি নিতেন না। স্কুলের সব অনুষ্ঠানেই তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের স্বাগত জানাতেন।

স্কুলই ছিল ধ্যান-জ্ঞান। তাঁর অপর প্রাণের সামগ্রী — বর্ধমান সাহিত্য-সভা। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন সভাপতি ছিলেন। অধিকাংশ সময়ই ডক্টর সুকুমার সেনের বাড়ীতেই অধিবেশন বসতো। তিনি প্রত্যেক মিটিং-এ হাজির থেকে সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনা করতেন। ডক্টর সেন তাঁর প্রিয় ছাত্র, যখনই তিনি বর্ধমানে আসতেন তখনই মাস্টার মশাই যেতেন। আমি তাঁর সঙ্গী হতাম। কলেজে পড়বার সময় তিনিই চাঁদা দিয়ে আমাকে সাহিত্য-সভার সদস্য করে দিয়েছিলেন।

মাস্টার মশাইয়ের আমি সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু আমার উপরের ক্লাসের ছাত্রেরা তাঁর পড়ানোর সুখ্যাতি করতো। তিনি উঁচু ক্লাসে ইতিহাস পড়াতেন (তখন ইংরেজী মাধ্যমে পড়ানো হোত) আর নীচু ক্লাসে ইংরেজি। খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর খুব লক্ষ্য ছিল। নিজে বেশ ক'খানা ইতিহাস বইও কিনেছিলেন। মেকলের রচিত কয়েকখণ্ড ইংলণ্ডের ইতিহাস আর গ্রীণের ইংরেজ জাতির ইতিহাস। কথায় কথায় বিশ্ব-ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন। সাহিত্যের প্রতিও তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। স্কট ও ডিকেন্সের ভয়ানক ভক্ত। এই দুই লেখকের সব গ্রন্থই তাঁর কাছে ছিল। আর ছিল রবীন্দ্রনাথের দু-খণ্ড কাব্যগ্রন্থাবলী। মধুসূদন ছিল তাঁর প্রিয় কবি। গুরু গম্ভীর স্বরে মেঘনাদবধ-কাব্যের অংশ বিশেষ আওড়াতেন। আর ভক্ত ছিলেন ডিটেক্টিভ উপন্যাসের, ডক্টর সুকুমার সেনের কাছ থেকে ডিটেক্টিভ উপন্যাস এনে পড়তেন।

মাস্টার মশাইয়ের হৃদয় ছিল আকাশের মতোই উদার। কত ছাত্র যে তাঁর চেষ্টায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। জ্ঞানবাবুর কথা আগেই বলেছি। আমার জীবনে প্রতিপদে তিনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি না থাকলে আমার ভাইদেরও পড়াশোনা হোতো না। তাঁর জীবনে এইটিই দেখেছি, সাহায্য করা মানে দায়িত্ব নেওয়া, আর সে দায়িত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দুশ্চিন্তার অবসান হতো না। অপরিচিত মেধাবী ছাত্রেরাও কোনোদিন তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হননি। এমনি এক চাটুজ্যে পরিবারের কথা জানি, যাঁরা দেশ-বিভাগের পর বর্ধমানে এসে খুবই বিপদে পড়েছিলেন। তাঁদের দুরবস্থার কথা শুনে তিনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে যান। আজ তাঁদেরই এক মেয়ে লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যাপিকা, দুটি ভাইয়ের মধ্যে একজন বম্বেতে বৈজ্ঞানিক গবেষক, অপর জন টাটার অফিসার। অদৃষ্টমানা জীবনে পুরুষাকার উদ্বোধনই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে দু-চারটি কথা বলে এই সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করব। তাঁকে দেখতে ছিল ঠিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মাথার চুল সহজভাবে বিন্যস্ত, সিঁথি বলে তেমন কিছু ছিল না, গোঁফে-দাড়িতে মেশামেশি। তিনি গল্প করতেন, অনেকে তাঁকে পি. সি. রায় বলে ভুল করত। গ্রীষ্মকালে তিনি পরতেন ধুতির উপর পাঞ্জাবী, শীতকালে চাইনীজ কোট। পায়ের জুতোটিও সে যুগের প্যাটার্নের — কখনো বা কেডসের ব্যবহার। তাঁর গলার চাদর বদলাতো ঋতুর পরিবর্তনে। গ্রীষ্মকালে সিল্কের চাদর পাট করা, শীতকালে একটি পশমী শাল। ও দুটির বয়স নির্ণয় করা কঠিন। প্রত্যেক জিনিসেই ছিল অসামান্য যত্ন। তাঁর একটি আদ্যিকালের 'ডীজ' হ্যারিকেন ছিল, অরিজিন্যাল কাঁচটি তখনো অক্ষত। তিনি থাকতেন উকিল দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়ের পশ্চিম দিকের একটি বাড়িতে। একটি মাত্র ঘর, তাতে দুটি জানলা, দুটি দরজা। প্রথম দরজা দিয়ে তিনি বাড়ীর উঠোনে আসতেন, দ্বিতীয় দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকতো, কেবল দুপুরে একবার খুলে দুর্গাদাসবাবুর বাড়ীতে চান করে আহার সেরে ফিরে আসতেন। খড়ের চালে ছাওয়া বারান্দাটি ছিল তাঁর বৈঠকখানা। ওখানে একটা উঁচু নড়বড়ে খাট ছিল, পুর্ব-দক্ষিণ দিকের পায়াটা ছিল আলগা। তাই সেখানে এক ঘটি জল রেখে দিতেন, পাছে সেখানে কেউ খাটশুদ্ধ উলটে যায়। বসতে বলার সময় তিনি সাবধান করে দিতেন। একফালি উঠান পেরিয়েই সদর দরজা।

তাঁর ঘরটি অন্ধকার — দিনের বেলাতেও। একটি শোবার খাট। পশ্চিম দিকে শিয়রের কাছে ছোট্ট একটি টেবিল ও চেয়ার, কিন্তু সেগুলিতেও কাগজ ও বই ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। খাটের দক্ষিণ দিকে কিছুই ছিল না, কিন্তু উত্তর ও পূর্ব দিকে কেবল প্যাকিং বাক্স। সেই সব বাক্সে ছিল স্পেসিমেন কপি, যা পাবলিশাররা বছরে বছরে দিয়ে গেছে, আর চিঠিপত্রের অজস্র বাণ্ডিল। খাটের নীচে ছিল খান দুই ট্রাঙ্ক — ওতে থাকতো কাপড়-চোপড়, কিছু কেনা বই। দেওয়ালে ইংরেজি বাংলা ক্যালেণ্ডার মেলা — নতুন ও পুরোনো ক্যালেণ্ডার পাশাপাশি ঠাঁই পেয়ে আসছে। বড় বড় ক্যালেণ্ডারের গায়ে খবরের কাগজ আঠা দিয়ে

সাঁটা। মিউনিসিপ্যাল স্কুলের গণিত-শিক্ষক (পরে প্রধান শিক্ষক) রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইকে দিয়ে এ. ও. হিউমের রচিত স্বদেশ প্রেমমূলক একটি কবিতা লিখিয়ে নিয়ে ক্যালেণ্ডারে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন।

মাস্টারমশাই হাঁপানি রোগে ভুগতেন। হাঁপানিতে যখন কষ্ট পেতেন তখন তা দেখা যেত না। শেষ বয়সে আরেকটি দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিল, তা হচ্ছে একজিমা। বছর দুয়েক এই রোগে কষ্ট পাওয়ার পর কলকতায় পড়ে গিয়ে হাতে প্রচণ্ড চোট পেলেন। ছাত্রেরা বর্ধমানে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ডেকে আনলেন। তিনি সব দেখে শুনে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে চলে যাচ্ছেন, এমন সময় মাস্টারমশাই যন্ত্রণা কাতর কণ্ঠে বললেন, 'আপনার ফী-টা'। শৈলেনবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'না মাস্টারমশাই, ওটা আমি নিতে পারব না। বর্ধমানশুদ্ধ আপনার ছাত্র। আমি এখানে পড়লে আপনার ছাত্র হবার সৌভাগ্য লাভ করতাম। আমাকে আপনার ছাত্র বলেই মনে করবেন।' তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন। এরপর তাঁর জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে এলো। যন্ত্রণার তাড়নায় তাঁকে বিজয়চাঁদ হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। তিনি আর সুস্থ হয়ে ফিরলেন না। সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া। ১৯৫০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি, ৭৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হল। সেই সঙ্গে একটি পুরাতন যুগের শেষ অগ্নিশিখা নিভে গেল।

শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ

এমন একদিন ছিল যখন শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলকে ভাবা যেত না। শান্তিবাবু এই স্কুল হতে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সসম্মানে পাশ করেন ও পরে বর্ধমান রাজ কলেজ হতে ইংরাজিতে সম্মান সহ বি. এ. পাশ করেন। প্রায় ৪০ বছর তিনি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। শেষ কয়েক বছর সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শান্তিবাবুকে চিন্তা করলেই মনে পড়ে শিক্ষকদের বিশ্রাম-কক্ষ যেখানে — কয়েক বাণ্ডিল খাতার সামনে শান্তিবাবু বসে খাতার পর খাতা সংশোধন করে চলেছেন। ছাত্রদের খাতা দেখায় তাঁর ছিল অনাবিল আনন্দ। অসুস্থ শরীর, কিন্তু তখনও তাঁর খাতা দেখার বিরাম ছিল না। রোগজীর্ণ শরীর, ভাইপো-ভাইঝি নিদারুণ অসুস্থ, তবুও এরই মাঝে ছেলেদের খাতা দেখে গেছেন।

শান্তিবাবু কিন্তু নিজের আহারে অমনোযোগ অসংযমের জন্য মৃত্যুকে অকালে ডেকে আনেন। শীর্ণ শরীরেও তাঁর হাস্যরস ছিল মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অম্লান। কথায় কথায় রুগ্ন পেশী দেখিয়ে বলতেন— আমি ফয়েজ খাঁর শিষ্য, যমকেও ভয় খাই না। বিজয়চাঁদ হাসপাতালে যখন শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে তখনও মৃদু কণ্ঠে বন্ধুদের বললেন,

'বন্দরের বন্ধন কাল এবারের মত হল শেষ— স্কুলের নতুন ঘরগুলি তৈরির জন্য তখনও বন্ধুদের বলে যাচ্ছেন ডাঃ পবির সঙ্গে কোথায় কোথায় যেতে হবে। কিছু পরে আবার গুনগুন করে আবৃত্তি করলেন,

''যা কিছু পেয়েছি, যা কিছু গেল চুকে

.....

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,

ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা

পূর্ণের পদ পরশ তাদের পরে।।''

— ২০ শে জানুয়ারি, ১৯৬৫, শান্তিবাবু চির শান্তিধামে চলে গেলেন।

(লেখা দুটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

হৃদয়নাথ কাব্যতীর্থ স্মরণে

শ্রীভবতোষ চক্রবর্তী

গত শতাব্দীর শেষের দিকে এক সরকারি পরীক্ষা কেন্দ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের পরীক্ষা চলছে। নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার ঘন্টা পড়তেই পরীক্ষার্থী ছাত্রটি পরিদর্শকের হাতে খাতা জমা দিতে উদ্যত হল। তখনও তার শেষ উত্তরটির কিছুটা লেখা বাকি ছিল। পরিদর্শক মশাই ছাত্রটির লেখার উপর নজর রেখেছিলেন। তার নির্ভুল ও সুন্দর উত্তর দেখে তিনি এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি শেষ উত্তরটি সম্পূর্ণ করতে তাকে আরও কিছুটা সময় দিয়েছিলেন। পরে ফল বেরোলে দেখা গেল ঐ ছাত্রটিই সকলের মধ্যে প্রথম হয়েছে। মুখে মুখে গণ্ডগ্রামের দরিদ্র এই মেধাবী ছেলেটির সাফল্যের কথা শুনে আশেপাশের গ্রামের ভদ্রলোকেরা আসতেন তাকে দেখতে।

পিতৃদেবের নিকট তাঁর বাল্যকালের এই গল্প শুনেছি। যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার অধীন বারুইখালি গ্রামে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা গ্রামের টোলের অধ্যাপক ছিলেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে হৃদয়নাথ সবার ছোট। অল্প বয়সে পিতৃহারা হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও পড়াশুনা শেষ করে উপার্জন করতে আরম্ভ করার পর অকালে মারা যান — একটি পুত্র ও কন্যা রেখে। এই পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও মধ্যম ভাইয়ের পুত্র কেশবচন্দ্র পিতৃদেবের কাছে থেকে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়াশুনা করে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন।

অভাবের সংসার। অতএব কাব্যের উপাধি কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করার পর পিতৃদেবকে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্রতী হতে হয়। বাঁকুড়া প্রভৃতি দুই এক জায়গায় শিক্ষকতার পর তিনি বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে প্রথমে সেকেণ্ড পণ্ডিত ও পরে হেড পণ্ডিত রূপে ত্রিশ বছরের বেশি শিক্ষকতা করেন। তখন শিক্ষকদের বেতন খুবই কম ছিল। পরিবার (চার পুত্র ও এক কন্যা) ও আত্মীয় স্বজনদের ভরণ-পোষণের জন্য তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হত, যার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৩১ সালের ১০ মে তারিখে সেরিব্রাল স্ট্রোকে তিনি বর্ধমানেই কার্য্যকালীন অবস্থায় মারা যান।

তাঁর অগণিত ছাত্রের মধ্যে বিজ্ঞানী ড. জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যসেবী ড. সুকুমার সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন এরূপ বহু ছাত্র তাঁর অধ্যাপনা নৈপুণ্যের স্মৃতি বহন করছেন।

তাঁর সরল ও অমায়িক ব্যবহারে ও বিমল চরিত্রের গুণে সকলেই গুণমুগ্ধ হতেন। মৃত্যুর পর স্কুল ম্যাগজিনের বিশেষ সংখ্যায় তাঁর ছাত্র ও সহকর্মীরা আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছিলেন।

বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ

বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নামটি বলার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে চোখের সামনে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল। স্কুল বাদ দিয়ে বিনয়বাবুকে ভাবা যায় না। তিনি এই স্কুলের ছাত্র। ১৯৩১ সালে এখান হতেই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন; ১৯৩৫ সালের বর্ধমান রাজ কলেজ হতে তিনি বি. এ. পাশ করেন। কিছুকাল পরে তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষক রূপে আসেন এবং যোগ্যতার সঙ্গে সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর শিক্ষকতা করেন। শেষ কয়েক বছর তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইংরাজী পঠন-পাঠনে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁর ইংরাজি উচ্চারণ নিয়ে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে এখনও নানা গল্প শোনা যায়। ইংরাজি বিষয়ে অনুরাগ তিনি লাভ করেন কাকাবাবু আদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট, তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তরুণ বয়সে স্ত্রী বিয়োগের পর বিনয়বাবু বিদ্যালয়কেই তাঁর দিনের কর্মস্থান ও রতের স্বপ্ন বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে ২০/২১ ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করে এসেছেন। ছাত্ররা সেই সুখ স্মৃতি জীবনে ভুলবে না। স্কুল থেকে বিদায় নেওয়ার পর প্রায় ৩/৪ বছর শরীর অসুস্থ থাকে এবং পরিশেষে ২৭ শে নভেম্বর, ১৯৮২ সালে পাপ পুণ্য পৃথিবীর ক্ষুদ্র কারা কক্ষ ত্যাগ করে বিনয়বাবু অমর ধামে প্রস্থান করেন।

(লেখা দুটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

দেবেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

প্রয়াত দেবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের সঙ্গে তিনি প্রায় ষোল বছর যুক্ত ছিলেন। ১৯০৯-১০ সালে তিনি ইংরাজী, বাংলা, দর্শন ও গণিত নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। সেই সময় কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। স্নাতকদের তখন সরকারী চাকরী পাওয়া খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু এই চাকরীর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করেলও তিনি মনে প্রাণে ছিলেন জাতীয়তাবাদী। তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের অধীনে চাকরী না করার প্রধান কারণও এই। স্বেচ্ছায় দরিদ্র শিক্ষকের জীবনই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। স্পষ্টবাদিতা, সত্যনিষ্ঠা, আদর্শবাদই ছিল তাঁর জীবনের পাথেয়।

শিক্ষক জীবনের সূচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ১৯০৭ সালে বি. এ. পরীক্ষার শেষ দিনে কিছুটা চিন্তা মুক্ত হয়ে কলেজ স্কোয়ারে তিনি বেড়াচ্ছিলেন। এই সময় ইটাচুনার (হুগলী জেলার খন্যানের নিকটবর্তী) বিখ্যাত ধনী ও সমাজসেবী বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু মশাই তাঁকে তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। তিনি সানন্দে সম্মতি জানান। তবে ওই বৎসর তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। ইটাচুনা স্কুলে শিক্ষকতার সময় ১৯০৯-১০ সালে তিনি বি. এ. পাশ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি ইংরাজী অনার্স, দর্শন, গণিত ও বাংলা নিয়ে পরীক্ষা দেন। কিন্তু বাংলায় অকৃতকার্য হওয়ায় ইংরাজী অনার্স পাওয়া আর তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি।

ইটাচুনা স্কুলে তিনি ১৯০৭ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন। শেষের দিকে তিনি প্রধান শিক্ষক ও হস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। স্কুলে ছাত্রদের বেতন লাগত না এবং হস্টেলে খুব কম খরচে থাকা যেত বলে শুনেছি। আমার পিতা ছিলেন নির্ভীক ও ন্যায়বাদী। তাঁর ইটাচুনা ত্যাগের কাহিনীই তার প্রমাণ। বিজয়নারায়ণবাবুর এক আত্মীয়ার মৃত্যুর পর কোন কারণবশত তাঁর শবদাহ হয়নি। আমার পিতা ছাত্রদের নিয়ে অদূরবর্তী ত্রিবেণীতে তাঁর দাহকার্য সম্পন্ন করেন। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার পিতা মতান্তর ঘটে। তাঁর কাজের কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। প্রতিবাদে পরদিন প্রাতেঃ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে ইস্তাফা দিয়ে তিনি বর্ধমানে চলে আসেন। তাঁকে পরে স্কুলে ও ইটাচুনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিজয়নারায়ণবাবু বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি আর যাননি। ইটাচুনা ত্যাগের সময় বিজয়নারায়ণবাবুর দুই পৌত্রের শিক্ষার দায়িত্ব ছিল আমার পিতার উপর। অবশ্য এই দায়িত্ব তিনি অস্বীকার করেননি। ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত অন্যত্র (মধুপুর) তিনি এঁদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। এঁদের একজন হলেন খন্যান থেকে নির্বাচিত রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য রাজনারায়ণ কুণ্ডু। হঠাৎ একদিন ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর এক কামরায় তাঁর নাম শুনে তাঁকে কিছু করতে যাই। কিন্তু কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বলেন, আমি জানি আপনি কে? আপনি আমার শিক্ষাগুরুর সন্তান। তাঁদের দু'ভাই ও অন্যান্য ছাত্রদের উপর আমার পিতার প্রচণ্ড প্রভাবের বিষয় বিবৃত করেন। রাজনারায়ণবাবু ট্রেনের সহযাত্রীদের সমক্ষে তাঁর স্বর্গত শিক্ষকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিলেন, আদর্শবাদ, সত্যনিষ্ঠা ও সেবার শিক্ষা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মী ছিল কিন্তু সরস্বতীর আরাধনার সূচনা তিনিই ঘটিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার পিতা ছিলেন নিরামিষাশী। পান, বিড়ি সিগারেট চায়ে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না।

তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁরা ছাত্র হিসাবে এসেছিলেন তাঁদেরও আমি কোনোদিন ধূমপান করতে দেখিনি।

বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের খণ্ডঘোষ থানার নারিচা গ্রামে ১৮৮৬ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠ মাতুল তাঁকে পুত্ররূপে প্রতিপালন করেন। ১৯০৩ সালে তিনি বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন। বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে ১৯০৫ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পাশ করেন। সেসময় রাজ কলেজ ডিগ্রী কোর্স ছিল না। তাই তিনি কলকাতায় সিটি কলেজে ইংরাজী অনার্স, বাংলা, দর্শন ও গণিত নিয়ে বি. এ. পড়া শুরু করেন। কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে তাঁর মাতুলের পরিচিত এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে তিনি থাকতেন। এর সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে

কলকাতায় তাঁর পড়াশুনা করা সম্ভব হত না।

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে তিনি সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন ১৯২৮ সালে। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কাজ করার পর তাঁর প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালের পর তিনি উত্তর বিহারের খাগারিয়া অঞ্চলে এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বর্ধমান জেলার রায়না হাই স্কুলের সঙ্গেও তিনি কিছুকাল সংযুক্ত ছিলেন।

পরবর্তী জীবনে তিনি বর্ধমান শহরে হোমিওপাথিক চিকিৎসকরূপে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। ১৯৫৮ সালের এপ্রিলের শেষ নাগাদ কিছুকাল আন্ত্রিক রোগ ভোগের পর কলকাতায় পি. জি. হাসপাতালে ৭২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীগতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গা গ্রামে মাতুলালয়ে নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা ঁবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি. এ. লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী, মা তমালিনী দেবী ধর্মপরয়ণা নারী। মাত্র ৩ বছর বয়সের সময় নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। বীরেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে বালক নরেন্দ্র মায়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে মা ও মাতুল (কবি সুধাকর মুখোপাধ্যায়) এর তত্ত্বাবধানে বর্ধমান শহরের মিউনিসিপ্যাল স্কুলে এবং উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ কলেজে অধ্যয়ন করেন।

নরেন্দ্রনাথ ১৯০৯ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা ও ১৯১২ সালে আই. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৪ সালে বি. এ. পরীক্ষায় ও ১৯২২ সনে ডেভিড হেয়ার কলেজ হতে বি. টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পূর্ব-পুরুষের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার সামন্তি গ্রামের সন্নিকট কুরমুন গ্রামের বিদ্যালয়ে ১৯১৪ সালে প্রথমে শিক্ষক হন এবং অল্প দিনের মধ্যে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন।

এই সময় তিনি সরকারি উচ্চপদে নিযুক্তির পত্র পান, কিন্তু সরকারি চাকুরি প্রত্যাখান করেন এবং শিক্ষাব্রতেই মনপ্রাণ সর্মপণ করেন।

শিক্ষক নরেন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভাও ছিল। তাঁর লেখা 'ভূগোলের ছড়া' ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। শিক্ষাকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতেন। এর এক দৃষ্টান্ত হল—তাঁর পৈতৃক গ্রামেও একটি বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক।

পরাধীন দেশে তিনি শিক্ষকতায় রত ছিলেন। তখন শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তিনি তাই 'সংঘ-শক্তি কলি যুগে' এই আদর্শে শিক্ষক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে 'এ. বি. টি. এ.' এর মাধ্যমে সারা বাংলার শিক্ষকদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারে বিশেষ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন ভূগোলের পরীক্ষক ছিলেন।

শিক্ষকতার আদর্শ, কেবলমাত্র পঠন ও পাঠনেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই শরীরচর্চা, সাহস, শৌর্যবীর্যের বিকাশে তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

অবসর গ্রহণের ৪ বছর পূর্বে ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উপস্থিত ৪০ জন ছাত্রের সামনে স্থানীয় পুলিশ লাইনের চাঁদমারি মাঠে প্রবীণ শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম গুলি ছুঁড়ে বন্দুক চালনা শিক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি ছিলেন হাস্যরসিক সদানন্দময়। কখনও তাঁকে কেউ বিমর্ষ দেখেনি। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-দারিদ্র্য, অম্লান বদনে সহ্য করে গেছেন। সমবয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে রহস্যালাপ মধুময় ছিল, এমনকি সহকর্মী ছাত্রদের সঙ্গেও নির্মল হাস্য-কৌতুকের অভাব ছিল না। ১৯৬০ সালের ৭ই জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। সহধর্মিনী, ছয় পুত্র, চার কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী প্রভৃতি রেখে তিনি চিরশান্তিধামে গমন করেন।

(লেখা দুটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

ফকিরচন্দ্র ঘোষ ঃ পিতৃস্মৃতি

শ্রীভবানীপ্রসাদ ঘোষ

সেদিনের কথা। ১৩৭৬ সাল ১০ জ্যৈষ্ঠ, বাবা আমাদের ছেড়ে গেলেন। সে বেদনা কখনও ভুলবার নয়। তিনি তো শুধু আমাদেরই আপনজন ছিলেন না; ছিলেন বর্ধমানের অসংখ্য মানুষের শিক্ষক।

আমাদের বাবা ফকিরচন্দ্র ঘোষ বর্ধমানে সুপরিচিত। তাঁর কর্মজীবন বর্ধমানেই কেটেছে। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের কৃতী শিক্ষক হিসাবে তিনি আজও স্মরণীয়। তবে তাঁর জীবনের সবটা অনেকের জানা নেই। সেই অজানা কথাটাই এখানে বলছি।

তাঁর জন্ম পানিপথে ১৪ আশ্বিন ১৩০১ সাল। আমাদের পিতামহ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন পানিপথের স্টেশন মাস্টার। পিতামহীর কয়েকটি সন্তান আঁতুড়েই মারা যায়। সন্তানদের অকাল মৃত্যু তাঁকে পাথর করে তুলেছিল। তাই বাবার যখন জন্ম হয়, তিনি তাঁকেও মৃত মনে করেন। সদ্যোজাত শিশুকে কবর দেবার জন্য খালাসির হাতে তুলে দেন। খালাসী কবর খুঁড়ে শিশুটিকে রাখতে গিয়ে দেখে, তার চোখ পিট্‌পিট্ করছে। সে তখনই তাকে কোলে তুলে পিতামহীর কাছে ছুটে আসে, বলে ''মাইজি লেড়কা জিন্দা হ্যায়''। পিতামহী তার কথা কানেই তোলেন না। তাঁর ভাগ্যে কি আর সন্তান সুখ আছে?

কিন্তু সন্তান সুখ ছিল। নইলে তখনই সেখানে এক ফকির সাহেবের আবির্ভাব হবে কেন? ফকির সাহেব সব দেখে শুনে বললেন, শিশুটি জীবিত। তাঁর নাম যেন 'ফকির' রাখা হয়, আর তার অন্নপ্রাশনে যেন দু-মন দুধের পায়েস বিতরণ করা হয়। ফকিরসাহেবের কথা মতো তাই করা হয়েছিল। ফকিরচন্দ্র জীবনের সাত বছর পানিপথে কাটিয়ে এলেন।

এই সময় পিতামহ ভাগল্‌পুরে বদলী হন। কাজে কাজেই ফকিরচন্দ্রের জীবনের আরো কটি বছর এখানে কাটে। তারপর তাঁকে কলকাতায় সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করা হয়। রমাকান্ত মিস্ত্রি লেনের এক মেসে থেকে তিনি পড়াশুনা করতেন।

স্কুল জীবন শেষ করে তিনি সিটি কলেজে পড়তে থাকেন। কলেজ জীবন তাঁর শুধু পড়াশোনাতেই কাটেনি, তিনি খেলাধূলায় যথেষ্ট নাম করেছিলেন। নাট্যাচার্য্য শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে তিনি অভিনয়ও করতেন। বস্তুত নাট্যাচার্য্যের সঙ্গে তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। আর পড়াশুনায় তাঁর অনুরাগ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক — হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় যিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন। হরেন্দ্র কুমারের স্নেহ তাঁর জীবনকে চালিত করেছিল সুস্থ ও সুন্দর পথে। হরেন্দ্রকুমার তাঁর একমাত্র পুত্রের শিক্ষার ভার ফকিরচন্দ্রের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। যাহোক সসম্মানে বি. এস. সি. পাশ করে তিনি গণিত নিয়ে এম. এস. সি. পড়তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও হন। তার আগে তিনি জামালপুরে অ্যাপ্রেনটিসশিপ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় প্রথম হলেন। কিন্তু চাকরি হল না। কারণ তিনি অন্যায় দাবির কাছে মাথা নত করেননি। তিনি ডি. এস. পি-র চাকুরীও পেয়েছিলেন। কিন্তু পিতামহের ঐ চাকুরীতে যোগ দিতে আপত্তি থাকায় যোগ দেননি। তাঁর পিতার মৃত্যুতে সংসারের ভার তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। তখন তিনি শিক্ষক-বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি ওকালতি পরীক্ষাও পাশ করেছিলেন। কিন্তু আদর্শের তাড়নায় তিনি উকিল না হয়ে, হলেন শিক্ষক। শহরের কয়েক পুরুষের কৃতী শিক্ষক, নিঃসন্দেহে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের গৌরব। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। দীর্ঘ ৪৭ বছর সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৯৬৫ সালে।

তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ কী শিক্ষক হিসাবে, কী সংসারী হিসাবে। তাঁর দুই ছেলে, আট মেয়ে। বর্তমান লেখক তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। মেয়েদের তিনি যথাসময়ে যোগ্যপাত্রে সম্প্রদান করেছেন। ছেলেদেরও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে যথাসাধ্য করেছেন।

আমরা কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছি তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে তার জীবনের মধ্যে আমরা এক মহান আদর্শের সন্ধান পেয়েছি। তাঁর পবিত্র স্মৃতি আজও আমাদের কাছে অম্লান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের গ্রাম খণ্ডঘোষ, বর্ধমান থেকে মাত্র ১৭ কিলোমিটার পথ এবং আমরা স্যার রাসবিহারী ঘোষের বংশধর। আমাদের বাড়ীতে প্রায় ১৭৫ বৎসরের দুর্গোৎসব আজও নিষ্ঠা সহকারে হয়ে থাকে এবং বারমাস কালীপূজা হয়ে থাকে। ঐ মন্দির আমার পিতামহ কালীমাতার স্বপ্নাদেশে নির্মাণ করেছিলেন ১৩৪৬ সালে।

(লেখাটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

আদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আউসগ্রামে ইং ১৮৯৪ সালের জুন মাসে আদ্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম দামিনী দেবী। আদ্যনাথের আর একজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁর নাম বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ, আদ্যনাথ অপেক্ষা ৫ বছরের বড়।

আদ্যনাথের বয়স যখন মাত্র ৪ বছর তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। দামিনী দেবী অতি কষ্টে ছেলে দুটিকে মানুষ করতে থাকেন।

তখন আউসগ্রামে একটি এম. ই. স্কুল ছিল। এই বিদ্যালয় হতেই বাল্য শিক্ষা শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বর্ধমান আসেন ও বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল-এ ভর্তি হন। এই বিদ্যালয় হতেই তিনি ১৯১০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। তাঁদের সময় হতেই প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা চালু হয়। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের অপর একজন শিক্ষক শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ১৯১০ সালে রাজ কলেজে আদ্যনাথের সহপাঠী হন। ম্যাট্রিকুলেশন এগজামিনে আদ্যনাথ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। রাজ স্কুলের পড়ার সময় তিনি ১নং পাকমারা গলির এক মেস বাড়িতে থাকতেন।

রাজ কলেজে তখন কেবলমাত্র আই-এ পড়ান হত। তাঁদের ছাত্রাবাস ছিল 'বেড়ে' অবস্থিত নির্মলবাগ। এই নির্মলবাগের এলাকা ছিল বিস্তৃত ও সেখানে একটি দ্বিতল বাড়ীতে ছাত্রাবাস ছিল। ছাত্রদের মধ্যে তখন জাতপাতের যথেষ্ট বিচার ছিল। ছাত্রদের মধ্যে অনাথশরণ মালিক বলে একটি চাঁড়াল ছেলে ছিল। ছাত্ররা অর্থাৎ উচ্চবর্ণের ছাত্ররা যে চৌবাচ্ছায় স্নান করত সেই চৌবাচ্ছায় অনাথকে স্নান করতে দিতে আপত্তি জানায় ও এক পংক্তিতে ভোজনেও আপত্তি জানায়। কিন্তু আদ্যনাথ ও বিজয়চন্দ্রের প্রবল প্রতিবাদের জন্য ছাত্রদের এই আপত্তি টেকে নি। আর অনাথ এক পংক্তিতে খেতে না পেলেও এক ঘরে থাকবার ও একসঙ্গে খাবার অধিকার পেল।

রাজ স্কুলের পড়ার সময় প্রতিবার আদ্যনাথ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করতেন ও এর জন্য প্রতি বছর পুরস্কার পেতেন। তখনকার দিনে পুরস্কার বিতরণের সময় ছাত্রদিগকে বাংলা বই পুরস্কার দেওয়া বিশেষ রীতি ছিল না। ছোট ছোট ছেলেদেরও গোল্ডস্মিথ, কুপার, শেক্সপীয়রের বই প্রাইজ হিসেবে দেওয়া হত। আদ্যনাথ স্কুলে পড়াকালীন এই সময় ইংরাজী বই পড়বার চেষ্টা করতেন। এইভাবে পড়ার ফলে তাঁর ইংরাজী বই পড়া প্রবল নেশার মত দাঁড়ায়।

তখনকার দিনে অধিকাংশ ছাত্রের হুঁকো খাওয়া অভ্যাস ছিল। কলেজের ছাত্রাবাসের চাকরেরা ছাত্রদের জন্য হুঁকো সেজে দিত। এ বিষয়ে বিজয়কুমার তাঁর বন্ধু আদ্যনাথ সম্বন্ধে বলেছেন, ''আদ্যনাথ Gibbon-এর লেখা Decline & Fall of the Roman Empire বইখানির পাতা এক মনে উল্টাইয়া যাইতেছে। হুঁকা হাতে ধরা আছে। হুঁকার আগুন কখন নিভিয়া গিয়াছে সেদিকে খেয়াল নাই। নিবিষ্ট মনে Gibbon-এর বই পাঠরত।'' আর একটা কথা আদ্যনাথের পড়ার সম্বন্ধে বিজয়কুমার বলেছেন, ''আদ্যনাথ যাহা একবার পড়িত তাহা আর দ্বিতীয়বার পড়িত না। এমনকি পরীক্ষার সময়ও পাঠ্যসূচী বারবার পড়িত না। অনেক সময়, তখন অন্য বই পড়িত। ফলে পরীক্ষায় যত ভাল হওয়া উচিত ছিল তাহা হইত না।''

১৯১২ সালে আদ্যনাথ রাজ কলেজ হতে আই. এ. পাশ করেন প্রথম বিভাগে। এই সালেই বর্ধমানে প্লেগ

রোগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। সেজন্য পরীক্ষার কেন্দ্র রাজ কলেজে বা না হয়ে ঐ বছর রানীগঞ্জ বাজারের (বর্তমান নীলবাবুর বাজার) মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলে হয়েছিল। ১৯১২ সালে আই. এ. পাস করে আদ্যনাথ বি. এ. পড়বার জন্য বহরমপুরের কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন সাহেব — নাম ই. এম. হুইলার।

বি. এ. পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে সাহেব খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাহেবকে দেখবার তেমন লোক ছিল না। পরীক্ষা আসন্ন। ছাত্ররাও সাহেবের সেবার ভার নিতে ইতস্তত করছিলেন। আদ্যনাথ অগ্রসর হয়ে বললেন যে, ''সাহেব আমাদের ছেলের মত ভালবাসেন। তাঁর রোগে আমরা যদি না দেখি তবে কে দেখবে?'' এই বলে তিনি রাত্রে সাহেবের সেবার ভার নেন ও সাহেবের লাইবেরী হতে বই নিয়ে রাত্রিতে পড়তে থাকেন ও দরকার মত সাহেবের সেবা করতে থাকেন। বহরমপুর কলেজ হতেই ১৯১৪ সালে ইংরাজিতে অনার্স সহ তিনি বি. এ. পাশ করেন। বহরমপুরে পড়বার সময় আদ্যনাথকে গুসকরা স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অমিয়গোপাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা (মাঝের গ্রামনিবাসী) অনেক উৎসাহ দেন ও সাহায্য করেন। বি. এ. পাশ করার পর কিছুদিনের মধ্যে আদ্যনাথ সীতারাম পুরের নিকট ইথোরা স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। এই সময় তিনি তাঁর বড় ভাই বৈদ্যনাথকে আই. এ. ও বি. এ. পড়বার জন্য অর্থ সাহায্য করতে থাকেন।

এর চার বছর পর অর্থাৎ ১৯১৮ সালে আদ্যনাথ প্রাইভেট ইংরাজিতে এম. এ. পরীক্ষা দেন ও সেকেণ্ড ক্লাস নিয়ে পাশ করেন। তখনকার দিনে দ্বারভাঙ্গা হলের উপর তলায় পরীক্ষা হত। এ সম্বন্ধে বিজয়কুমার বলিয়াছেন, ''পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। সেদিন ছিল ইংরাজী নাটকের পরীক্ষা, ছাত্ররা একে একে পরীক্ষার হল বইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। হলের বাহিরে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'স্যার ড্রামার আননোন প্যাসেজটি কোথায় হইতে দিয়াছেন?' প্রৌঢ় ভদ্রলোক মৃদু হাসিলেন ও ছাত্রদিগকে পাল্টা শুধাইলেন 'তোমরা বল।' কোন ছাত্রই সঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না। সেই সময় আদ্যনাথও হল হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন। তিনি বলিলেন 'মার্লো হইতে'। ভদ্রলোক আদ্যনাথের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কোথাকার ছাত্র?' আদ্যনাথ জবাব দিলেন তিনি প্রাইভেট এম-এ পরীক্ষা দিতেছেন। সেই 'ভদ্রলোক' হইলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক পি. সি. ঘোষ।''

এই ইথোরার স্কুল হতেই তিনি বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ১৯২০ সালে সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ও পরে প্রধান শিক্ষক হন। স্কুলের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করে তিনি ১৯৩৭ সালে অকালে অমরধামে প্রস্থান করেন।

আদ্যনাথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষার মধ্যেই নিবদ্ধ রাখতেন না, তাদের মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশ যাতে ঘটতে পারে সেই দিকেও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতেন। তিনিই মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ছাত্রদের গল্প-কবিতা প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ দানের জন্য প্রথম ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। বলতে গেলে বর্ধমান জেলার সব বিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বাগ্রে এখানেই পত্রিকা (১৯২৮) প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি নিজেও প্রবন্ধ লিখতেন, সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উপর মন্তব্য করতেন। তাঁর একটি প্রিয় বিষয় ছিল — বিতর্ক সভা। প্রতি মাসের দুটি শনিবার ছুটির পর ছাত্রদের নিয়ে প্রকাণ্ড হল ঘরে বিতর্ক-সভার আয়োজন করতেন। প্রথম দিকে ছাত্রেরা ইংরেজীতেই আলোচনা করত। তিনি ছাত্রদের দোষ ত্রুটি চমৎকারভাবে দেখিয়ে দিতেন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি অ্যান্টিসিনেমা লীগ গঠন করেছিলেন—ছাত্ররা যাতে চলচ্চিত্রের মোহে আকৃষ্ট না হয়ে জীবনকে যথার্থভাবে গড়ে তুলতে পারে। তাই বলে তিনি ভালো ছবির প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন না। 'এস্কিমো' বা 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' চলচ্চিত্র ছাত্রদের দেখাবার জন্য তিনি উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ছাত্রদের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

(লেখাটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীকালীপদ সিংহ

বর্ধমানের বহু সম্মানভাজন শিক্ষক, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র দেশবাসীর গৌরব। তাঁর অগণিত ছাত্র তাঁর শিক্ষাদানের অপূর্ব কৌশলের কথা আজও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে থাকেন। ছাত্রপ্রীতি ও সহৃদয়তার গুণে তিনি সর্বজন সমাদৃত। শুধু তাই নয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর অবসর গ্রহণ করে একটি নতুন বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় যে অসাধারণ কর্মোদ্যম দেখিয়েছেন, তার ফলে বর্ধমান শহরের অসংখ্য ছাত্র উপকৃত।

এই স্বনামধন্য পুরুষ ১৮৯২ সালে বর্ধমান শহরের অন্তর্গত রাধানাগর মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃপিতামহ এখানকার শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিতামহ মন্মথনাথ মিত্র অ্যালবার্ট ভিক্টর ইনস্‌টিটিউশন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে যা পরবর্তীকালে নিউস্কুল নামে খ্যাতিলাভ করে। ১৮৯৫ সালে মন্মথনাথ মিত্রের মৃত্যু হলে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ভবেন্দ্রনাথ মিত্র হাল ধরেছিলেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন চালাতে পারেন নি। এই ভবেন্দ্রনাথের পুত্র জিতেন্দ্রনাথ।

বিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষা সমাপন করে জিতেন্দ্রনাথ এমন দুরবস্থায় পড়েন যে চাকরি সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ কলকাতায় ও বর্ধমানে তাঁর ধনী আত্মীয়ের সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু শৈশবকাল থেকেই তিনি স্বাধীন চিত্ত। অপরের কাছে — তা তিনি আত্মীয়ই হোন, আর পরিচিত ব্যক্তিই হোন — কিছুতেই মাথা নত করে দাঁড়াতে চাননি। তাই, তরুণ বয়স থেকেই তিনি দারিদ্র্য বরণ করে নিয়েছিলেন। উদ্যমী পুরুষসিংহের কাছে দারিদ্র্যের কশাঘাত শ্রেয়, কিন্তু ধনীর আদর অসহ্য। ১৯১৭ সালের ১৭ আগস্ট তিনি বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক রূপে যোগদান করে অনতিকালের মধ্যে নিজের যোগ্যতা সপ্রমাণ করলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠা আর শিক্ষাদানের অপূর্ব কৌশল ছাত্রমহলে গভীর শ্রদ্ধার সঞ্চার করে। তিনি ছিলেন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। নিত্যনিয়মিত ব্যায়ামের ফলে সেই শরীরে অসামান্য বল ছিল। ছাত্রদের সর্বদা ব্যায়াম করতে তিনি উৎসাহ দিতেন। তাঁর কথাবার্তায় এমন একটা গাম্ভীর্য বিরাজ করত যে, ছাত্রেরা তাঁকে প্রথম দর্শনেই ভয় করত। কিন্তু পরিচয় হয়ে যাবার পর তারা দেখত, তাঁর মতো স্নেহপ্রবণ কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। তিনি সাধারণতঃ ইতিহাস ও ইংরেজি পড়াতেন। চমৎকার বর্ণনার গুণে ইতিহাস হয়ে উঠত সরল কাহিনী, একবার শুনলেই ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়ে যেত। কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন স্বদেশী। তাই পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ইংরেজদের কীর্তিকে তিনি বলতেন দস্যুতা, প্রবঞ্চনা। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি ইতিহাসের স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করতেন। ইংরেজি গ্রামার ছিল তাঁর প্রাণের বস্তু। বহুকাল চর্চার ফলে তিনি গ্রামার সম্বন্ধে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যা ছাত্রদের শিক্ষা দেবার পক্ষে খুবই উপযোগী। এ সম্বন্ধে তিনি একটি বইও লিখেছেন, কিন্তু তা মুদ্রিত হয়নি। শিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁর মৌলিক ধারণাগুলি পাণ্ডুলিপি বদ্ধ হয়ে পড়ে আছে।

তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে বাণীপীঠ বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায়। ১৯৪৮ সালের ১৬ জানুয়ারি তিনি মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষকতার পদ ত্যাগ করেন। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হোতে পারে। কিন্তু পদত্যাগের মূলে ছিল তাঁর বিদ্রোহী মনোভাব। তিনি দেখেছিলেন, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের ঘন ঘন পরিবর্তন একটা ব্যবসায়িক ব্যাপার। একদিকে পুস্তক-প্রকাশকদের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি, অপরদিকে দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্র অভিভাবকদের ক্ষতি। আগে স্টাণ্ডার্ড টেক্সট বুক ছিল, ঠাকুরদা বাবা ছেলে বংশানুক্রমে সেই বই

পড়তো। অনেক গরীবের ছেলে বিনা মূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে পুরোনো বই কিনে পড়তে পারতো। কিন্তু এই নয়া ব্যবস্থায় অভিভাবকেরা জেরবার হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া সেরকম স্টাণ্ডার্ড পাঠ্য-পুস্তক রচিত হচ্ছে না — সেখানে ভাষা ও তথ্যের ভুলের সমাবেশ। মাস্টারমশাই এর প্রতিবাদ জানালেন। স্কুলে ঘন ঘন বই পাল্টানো চলবে না। তিনি আরও জানালেন পাঠ্যপুস্তকগুলিতে বর্তমানের প্রয়োজন উপেক্ষিত। কিন্তু তাঁর সব প্রতিবাদই ব্যর্থ হয়ে গেল। তিনি চাইলেন ক্লাসে ভর্তি হবার আগে ছাত্রদের মেধার পরীক্ষা। তাহলে ধনী লোকের অপদার্থ সন্তানের চেয়ে দরিদ্র ব্যক্তির মেধাবী ছাত্র ভর্তি হবার বেশি সুযোগ পাবে। অবশ্য তাঁর এই অভিপ্রায় এখন সর্বত্র অনুসৃত।

দ্বিতীয় ঘটনাটি তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। দেশ-বিভাগের পর উদ্বাস্তু ছাত্রেরা স্কুলে ভর্তি হবার জন্য ভীড় করতে থাকে। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল স্কুল ঘরের অভাবের দরুন তাদের নিতে চাইলেন না। অপরদিকে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পক্ষে বেশি ছাত্রভর্তি নিয়মবিরুদ্ধ কার্য। তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, ছিটেবেড়ার ঘর করে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হোক। তখন শোনা গেল এমন বিধানও নেই। শেষকালে পদত্যাগ করে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হলেন। তাঁর এই মহান ব্রত শুধু সার্থক হয়নি, বাণীপীঠ নামে বিদ্যালয়টি এখন গৌরবময় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাব্রতী হিসাবে তিনি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কাছে স্বীকৃতি পেয়েছেন। ১৯৬৬ সালে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত উক্ত সমিতির ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদ ১৯৭০ সালে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে জাতীয় শিক্ষকের মর্যাদা দেন। ১৯৮৩ সালে বর্ধমান উদয় সংঘ বই মেলায় তাঁকে দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার দিয়ে তাঁর সমাজসেবার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ১৯৮৪ সালে বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদ দিয়েছেন ঋতেন্দ্র চৌধুরী পুরস্কার।

আমাদের স্যার বিজয়কুমার বসু

শ্রীপাঁচুগোপাল রায়

আমাদের স্যার বিজয়কুমার বসু,
বিদ্যায় ঘৃণ, শরীরে অক্ষম, মনে শিশু।
ঘাড়ে গর্দানে স্যার,
'আসুম' বলে গেলেন চলে এলেন না যে আর।
'ব্যাত যে দিমু' বলেছিলেন
সে বেত নিয়ে কোথায় গেলেন।
দুষ্টু ছেলে পড়াশুনায় নেই কো মনোযোগ
শেখ্যায়ে তোরে ছাড়মু তা সে যতক্ষণে হোক।
এ আশ্বাসে বিশ্বাসে আছি বসে।
শিখবো যদি বিজনবাবু আসে।
আমাদের স্যার, শরীরে ছিলেন অক্ষম
মনের জোরে বারবার সেই অক্ষমতাকে,
করে গেছেন অতিক্রম।
শেষে, স্যারের বড় দয়ার শরীর।
চোখে জল দেখলে হতেন অস্থির।
শেষে, সেই অক্ষমতাকে ক্ষমা করে
তার হাতে দিলেন ধরা।
মর্ত্য-ধরা ছেড়ে অমৃত লোকের
দিকে বাড়ালেন পা।

(লেখা দুটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আমার শিক্ষাগুরু

শ্রীকালীকৃষ্ণ মিত্র

'আচার্য' কথাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আচরণ। শুধু বিদ্যাবত্তাই শিক্ষাকার্যের লক্ষণ নয়, আচরণেও তিনি হবেন মহৎ। আমার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই ধরণের মানুষ, যিনি শিক্ষাজীবনে কৃতী ছাত্র, শিক্ষক জীবনে আদর্শ আচার্য। নিয়মনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, সহৃদয়াতা ও উচ্চাঙ্গের শিক্ষাপ্রণালীর জন্য তিনি কিংবদন্তী পুরুষ হয়ে আছেন। ছাত্রেরা আজও এই চিরকুমার শিক্ষাগুরুকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে থাকেন। আমার জীবনেই দেখেছি, এই মানুষটির আদর্শ আচরণ। প্রশ্ন লিখতে গিয়ে ভুল হয়েছে, তিনি তা উপেক্ষা করতে পারেন নি, আমাকে ডেকে মিষ্টি কথায় বলেছিলেন, ''তুমি বোধ হয় প্রশ্নটি ভালো করে দেখনি।'' আবার ঘন্টা পড়ার পাঁচ মিনিট আগে ক্লাস (সেটি আমার ক্লাস ছিল না, পরের অনুপস্থিতিতে নিয়েছিলাম) ছেড়ে দেওয়ায় তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেদের গোলমালের অন্য ক্লাসের অসুবিধা হতে পারে। ঝোড়ো হাওয়ায় ক্লাসের দুটি বড় বড় জানলা বন্ধ করে পড়াতে দেখে আমাকে বলেছিলেন, ''ঘর যে অন্ধকার। এত ছেলে বসে আছে। পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে। জানলা খুলে দাও।'' আশ্চর্য্যের বিষয়, সেইদিন ছিল তাঁর কর্মকালের শেষ দিন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিখুঁত ভাবে কাজ করে গেছেন। আর ছাত্র হিসাবে আমরা দেখেছি, ছোটখাট ভুলত্রুটি, যেগুলোকে আমরা অবহেলার চোখে দেখি, সেগুলি অভ্যাস হিসাবে জীবনের পক্ষে কত ক্ষতিকর তা তিনি আমাদের সস্নেহে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সাধারণ জীবনের শৈথিল্য তাঁর কাছে ছিল অমার্জনীয় ব্যাপার। আর একটি ঘটনার কথা বলে তাঁর নিয়ম নিষ্ঠার অসাধারণ পরিচয় দিচ্ছি। স্কুলে আসবার সময় রাস্তায় দাঁত দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। ডাক্তার তুলসী মুখোপাধ্যায়ের ডিস্‌পেন্সারিতে ওষুধ লাগিয়ে কিছুক্ষণ পর সুস্থ হয়ে স্কুলে পৌঁছাই। তখন রাধাকান্তবাবু শুধু রুটিন করতেন না, দেখতেন কে কে ঠিক সময় আসছেন। স্টাফ রুমে ঢুকতেই তিনি আমার বিলম্বের কারণ জিগ্যেস করলে আমি সব ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, ''আজকে তুমি না আসলেই পারতে। তোমার স্কুলে আসার রেকর্ড খারাপ হয়ে গেল।'' ক্লাসে পড়াতাম, তিনি কোনো কোনো দিন বাইরে থেকে শুনতেন। এমনি করেই কঠিন পরীক্ষা দিতে দিতে শিক্ষক জীবনের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি।

অবসর গ্রহণের পর তাঁর কাছে প্রত্যেক বছরই বিজয়ার প্রণাম করতে আমরা কয়েকজন শিক্ষক গিয়ে থাকি। গত জুলাই মাসে গিয়েছিলাম। তখন তাঁর বয়স বিরাশি বছর। বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থের জন্য তাঁর জীবনী সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়েছিলাম, প্রচার বিমুখ এই মানুষটি নিজের সম্বন্ধে মুখ খুলতে নারাজ। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তা লিখছি—

রাধাকান্তবাবুর পিতার নাম সঞ্জীবচন্দ্র বন্দ্যেপাধ্যায় এবং মাতার নাম তপতী দেবী। সঞ্জীবচন্দ্র কোনো একটি কাজে নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন না। নানা কাজ নানা সময়ে করতেন। অত্যন্ত পরিশ্রমী ও ধর্মাশ্রয়ী এই ব্যক্তি ছেলেদের উপযুক্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ছেলেদের লেখাপড়া বিষয়ে কোনো কার্পণ্য করতেন না। ছেলেরা সকলেই উচ্চশিক্ষিক হয়ে ওঠেন। রাধাকান্তবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. সি. (গণিত) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। বাল্যশিক্ষা উত্তরপাড়ায় পাঠশালায়। রাধাকান্তবাবু চার বৎসর সেই পাঠশালায় পড়েছিলেন। তারপর উত্তরপড়া গভর্ণমেন্ট স্কুলে পড়েন। পাশ করে প্রবেশ করেন রাজা পিয়ারীমোহন কলেজে।

কথা প্রসঙ্গে রাধাকান্তবাবু পুর্বতন শিক্ষকদের শিক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি

বিশেষভাবে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাইরেক্ট মেথডের উল্লেখ করে বললেন, কুপারের 'জন গিলপিন' কবিতার ব্যাখ্যা খুবই ভালো লেগেছিল। এখনও তা তাঁর স্মরণে আছে। তিনি এই সব আদর্শ শিক্ষকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষাগুরুদের নামোচ্চারণ করতে করতে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'সহকারী প্রধান শিক্ষক কবে থেকে হলেন?' 'উত্তরে তিনি বললেন' প্রথম থেকেই তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাজ করে আসছেন। কারণ প্রধান শিক্ষক আদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিনি শ্রদ্ধা করতেন আদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়কে এবং বিষ্ণুপদ বন্দোপাধ্যায়কে। বিষ্ণুবাবুর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি কিছুকাল মিউনিসিপ্যাল স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

রাধাকান্তবাবু তাঁর প্রধান শিক্ষকতার (১৯৫০-১৯৬২ জানুয়ারী) অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছুতেই বলতে চাইলেন না। শুধু জানালেন ওটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেইজন্য তিনি কিছুই বলতে চান না। তবে তিনি তাঁর সময়ের স্কুল সম্পাদকের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বললেন, মথুরাবাবু না থাকলে স্কুল চালাতে পারতাম না। তিনি সর্ববিষয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও স্কুলে রাজনীতি করেন নি। স্কুলের পক্ষে যা ভাল তা লক্ষ্য করেই কাজ করেছেন।

রাধাকান্তবাবু স্কুল-ফাইনালের যুগে শেষ ঘন্টায় দশম শ্রেণীতে অ্যাডিশনাল সায়েন্স পড়াতেন। ছুটির পরও অনেকক্ষণ তাঁর ক্লাস চলতো। ছেলেদের কারও ''স্যার, ছেড়ে দিন'' বলবার সাহস ছিল না। স্কুলের সীমানা-প্রাচীর হয় ডাঃ পবির চেষ্টায়। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রাচীর নির্মাণ দেখেছিলেন। তার পূর্বে স্কুলের মাঠের উপর দিয়ে পথ চলা রাস্তা ছিল। রাধানগরের অনেক উকিল ঐ পথ দিয়ে আদালতে যেতেন। তাঁদের বলতে শুনেছি, ''ক্লাস চলছে। এতো নিস্তব্ধতা, যেন মনে হচ্ছে ক্লাস চল্‌ছে না।''

রাধাকান্তবাবুর চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। যে ছাত্রকে তিনি ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেবো মনে করতেন শত অনুরোধেও অটল থাকতেন। স্কুলের কোনো কোনো প্রবীণ শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর কিছু মতান্তর ছিল। কিন্তু সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। একবার স্কুলের পুরস্কার বিতরণের সময় তৎকালীন স্কুল সম্পাদক ডাঃ শক্তিপদ পবি চেষ্টা করেছিলেন তাঁর মোটরগাড়ীতে রাধাকান্তবাবুকে নিয়ে এসে তাঁর হাত দিয়ে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তিনি আসতে রাজী হননি। স্কুলের কাজ শেষ হবার পর তিনি কোন বিদায় অভ্যর্থনা গ্রহণ করেননি। আবার একথাও বলেছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর যেন স্কুলের ছুটি দেওয়া না হয়। সেদিন যেন বেশি করে ছাত্রদের পড়ান হয়। তাহলে তাঁর আত্মা তৃপ্ত হবে। ২৯।১।৬২ তারিখে তিনি শিক্ষক জীবন হতে অবসর নেন।

Cleanlinesss is next to Godliness-এ প্রবাদ বাক্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পেতাম মেসের তেতলায় যে ঘরটায় তিনি থাকতেন তার মধ্যে প্রবেশ করে। ঘরে আসবাবপত্র খুবই কম। কিন্তু ঘরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ক্যালেণ্ডার প্রভৃতি যা আছে তা বেশ সাজানো গোছানো। একটি পিজবোর্ডে কতকগুলি কাটা ছবি আঁটা আছে। ছবিগুলি রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুর। এই ছবিগুলি তাঁর উত্তরপাড়ার বাড়ীতেও দেখতাম।

(লেখাটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

দিন যদি হল অবসান

দেবনাথ মল্লিক

১৯৭৮ সাল। আমরা তখন Class ten-এ পড়ি। সম্ভবতঃ Half yearly পরীক্ষা হয়ে গেছে। স্কুলে কয়েকজন নতুন মাস্টারমশাইয়ের মুখ দেখলাম। নতুন এসেছেন তাঁরা। আমাদের ক্লাসও দু-একজন স্যার নিয়েছেন। একদিনের ঘটনা মনে বেশ দাগ কাটে। কোন একজন স্যারের অফ্ পিরিয়ড্-এ চশমা পড়ে, ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিহিত একজন মাস্টারমশাই এলেন। ক্লাসের কেউই চিনতো না তাঁকে। সবাই জিজ্ঞাসা করছে — ''আপনি আগে কোথায় ছিলেন স্যার? কোথায় আপনার বাড়ী? আপনার নামটা বলুন স্যার।'' স্যার হাসিমুখে বলছেন—''তোমরা সব বসো। সব বলছি।'' — বলতে শুরু করলেন— ''আমার নাম রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। আগে এই স্কুলেই কালীবাবু, কমলবাবু, রাজেনবাবু ... স্যারদের কাছে পড়েছি। এর আগে রাণীগঞ্জে শিক্ষকতা করতাম।'' — কথাগুলো ছিল খুব হৃদয়স্পর্শী। কণ্ঠস্বরটাও যেন স্নেহমাখা। সবাইকেই আকর্ষণ করেছে কথাগুলো। জিজ্ঞাসা করলাম, ''কোথায় থাকেন বলুন স্যার।'' বললেন— ''একটা ঢিলকে বড় একটা সুতোয় বেঁধে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে মনে হয় আমার বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই পড়বে।'' দু-একজন বলল—''কোন্ দিকে স্যার?'' — স্যারও হাসিমুখে বললেন— ''ঐ পশ্চিমদিকে। রাধানগর চেনো তো? ওখানেই আমার বাড়ি।' আরও দুই-এক কথা হবার পর বললেন—''দাও বাংলা Text বইটা দাও।'' একটা গদ্য বার করে সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''ভারতবর্ষ''। ব্যাস একটা শুনেই সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ সাপ। সবাই পড়ানো দেখতে চায় এই নতুন স্যারের। স্যারও গদ্যটা পড়ে চললেন টেবিলের পশে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে ব্যাখ্যাও করতে লাগলেন। গল্পের শেষের দিকে একটা লাইনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। — সেই Tradition সমানে চলছে।' সবাইকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে দিলেন একটা প্রশ্ন, ''আচ্ছা বলতো Tradition কথাটার আক্ষরিক বাংলা প্রতিশব্দ কি?'' সবাই তো Tradition-ই ব্যবহার করে। বাংলা প্রতিশব্দ আর কারোর ঠিক হয় না। এক এক করে বলতে থাকে প্রত্যেক। শেষে একজন বন্ধু বলল—''ধারাবাহিকতা; হবে স্যার?''

''বাঃ। এটাই চাইছিলাম। এতেই মানেটা বেশ ভাল আসে তাই না?''

তারপর দু-এক কথা বলতে বলতেই ঘন্টা পড়ে গেল। নতুন স্যারও চলে গেলেন। কিন্তু সবার মুখে এক কথা — ''স্যারের পড়ানোটা কি সুন্দর বল? যেন মুখস্থ হয়ে যায়। স্যারের কথা বলাটা যেন কি সুন্দর বল?'' তারপর ঐ ক্লাসে কয়েকবার স্যার এসেছেন। তখন অবশ্য আমরা স্যারের পরিচিত হয়ে গেছি। যাইহোক মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হবার পর আমাদের বেশির ভাগই আমাদের স্কুলেই ভর্তি হল। নতুন Routine পেলাম। সেই রবিবাবুর সপ্তাহে একটি করে ক্লাস। মঙ্গল আর শুক্রবারে প্রথম ঘন্টাতেই। বেশ আনন্দ পেলাম। আবার রবিবাবুর ক্লাস করব। স্যারের ক্লাস সব রকম ছেলেরই ভাল লাগত। Classটাকে Class বলে মনে হত না। মনে হত যেন একটা নাটক চলছে। এগারো বারো ক্লাসে স্যার আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস ও নাটক পড়াতেন। সাহিত্যের ইতিহাসটা খুলতে একদম ভাল লাগত না। একবারে নীরস জিনিস। ররিবাবুর ঐ ক্লাস নেওয়াতে ওটাও আকর্ষণীয় লাগত। বিশেষ করে স্যারের নোটগুলো। মনে হত যেন চলতি কথা। তাঁর এমনি সাধারণ কথা এবং তাঁর Class note গুলোর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পেতাম না কিছু। আর নাটক? ওটা একেই তো আকর্ষণীয় তাতে আবার রবিবাবুর মতো স্যারের পড়ানো। তাঁর কথাগুলো এখনো মনে পড়ে। স্যার নিজেই বলতেন—''অনেকবার নাটক করেছি।'' নাটকের ক্লাসে সবাই যেন তন্ময় হয়ে যেত। বাড়িতে

এসে নাটকের জন্য note বই পড়তে ভাল লাগত না। Text বইটা, আর স্যারের Noteগুলো পড়তাম। স্যার আমাদের 'ঔরঙ্গজীব ও জাহানারা' এবং 'গান্ধারীর আবেদন' পড়াতেন। স্যারের পড়ানোতে সবার মনে সেগুলি বেশ দাগ কেটেছিল। ঔরঙ্গজীব, যশোবন্ত সিংহ, জাহানারার সংলাপগুলো যখন রবিবাবু বলতেন মনে হত না যে একটা ক্লাস করছি। নাটকের দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করেছি মনে হত। এখনো পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা হলে স্যারের নাটক পড়ানোর গল্প করতে তারা ভোলে না। এককথায় সেই সব ক্লাস যারা না করেছে, তারা বুঝতে পারবে না কি অমৃতের স্বাদ আমরা পেয়েছি। পড়ানো ছাড়া আরোও কতকগুলো বিশেষ গুণ আমাদের মুগ্ধ করত। মনে আছে ক্লাস শুরু হবার মাস খানেকের মধ্যে স্যারের বেশির ভাগ ছেলের নাম মুখস্থ।

সবাইকে সম্বোধন, ''তুই, তোরা, ইত্যাদি। কেউ গোলমাল করলে তার নামটি ধরে ডেকে যখন বলতেন—''বাবা, একটু চুপ কর। পড়াটা একটু দেখ।'' ক্ষমতা থাকত না কারো দুষ্টুমী করার। এককথায় — মিষ্টি কথা, ভালোবাসা জয় করে নেওয়াটা যেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আগেই তো বলেছি তাঁর নেওয়া যে কোন ক্লাস সাধারণ ক্লাসের মত লাগত না। তাঁর ক্লাসটা হয়ে যাবার পর মনে হত কি 'ম্যাজিক'-এর মধ্যে আমরা অতটা সময় কাটিয়ে দিয়েছি। একবার স্যার ক্লাসে এসেছেন। ক্লাসে বড্ড বেশি গোলমাল হচ্ছিল। রোল ডাকতে অসুবিধা হচ্ছিল তাঁর। পাঁচ-ছয় রোল ডেকে খাতাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর নাটকটা বার করে পড়তে শুরু করলেন। মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা। আশ্চর্য! মিনিট খানেকের মধ্যেই গোটা ক্লাসটা একবারে নিস্তব্ধ! যে কোন ক্লাস, যত গোলমাল করুক সামান্য কথায় বশে আনতে কিছুই অসুবিধা হত না তাঁর। পড়ানো ছাড়াও হাসির কথা দিয়ে সবাইকে আনন্দ দেওয়ার পদ্ধতিটিও ছিল চমৎকার। মাঝে মাঝে তাঁর পুরানো স্কুল জীবনের গল্প করতেন। বলতেন—'' স্যারদের দেখলে মাঝে মাঝে ভয় হয়। কখন আবার বকে দেবে!'' আচরণের মধ্যে ছাত্রের ভাবটুকু যায়নি তখনও। তখন আমাদের বারো ক্লাসের শেষের দিকে কথা। এমনি ক্লাস বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকজন মাস্টারমশাই বাড়তি ক্লাস নিতেন। একদিন স্যার সেরকম ক্লাস নিচ্ছেন, এমন সময় মৃত্যুঞ্জয়বাবু বাইরে থেকে দরজাটা খুলে বললেন — ''আমার ক্লাসটা নিয়ে নিচ্ছিস?'' এটা আমার নেওয়ার কথা ছিল যে?'' — স্যার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন— ''আমি তো স্যার জানতাম না। এরা ডাকল, তাই চলে এসেছি।'' মৃত্যুঞ্জয়বাবু যখন চলে গেলেন, তখন আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন — ''বাবাঃ, যা ভয় হয়। মনে হচ্ছিল একটা কিল যদি আগের মত পিঠে পড়ে!'' গোটা ক্লাসটা হাসির রোলে ভরে গেল। তখন স্যারকে দেখে একটা তরুণ ছাত্র ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিল না।

এখনো তখনকার কথা চিন্তা করলে ক্লাসে স্যারের কাছে শোনা নাটকের সংলাপগুলোর কথা বেশি মনে পড়ে। যখন বলতেন—'যশোবন্ত সিংহ জাহানারার রক্তবর্ণ চক্ষু আর অগ্নিময় গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করি'' বা ''চমৎকার, আবার বলি চমৎকার'' অথবা ''জয়, জয় চেয়েছিনু। জয়ী আমি আজ।'' তখন মনে হত স্বয়ং যশোবন্ত বা জাহানারা বা দুর্যোধনের চরিত্র প্রত্যক্ষ করছি। কি অদ্ভুত এক যাদু ছিল পড়ানোর মধ্যে।

এবার গ্রীষ্মাবকাশের পরই শুনলাম স্যারের শরীর খারাপ। নার্সিংহোমে ভর্তিও হয়েছিলেন। শুনে খারাপ লেগেছিল। স্যারের স্বাস্থ্য তো একেই ভাল নয় তাতে আবার গুরুতর অসুস্থতা। এর কয়েকদিন পরই ২৮ শে জুন (সোমবার) বিকালে দাদার মুখে শুনলাম স্যারের শরীর বেশ খারাপ। শনিবার দিন রাত্রি ১টা নাগাদ তাঁকে নার্সিংহোমে আবার দিতে হয়েছে। তখন থেকেই অজ্ঞান। শুনে খুব শঙ্কিত হলাম। সন্ধ্যাবেলায় দাদা নার্সিংহোম থেকে ফিরে বলল, ''স্যারকে অক্সিজেন ও স্যালাইন দিতে হচ্ছে। গলায় এক রকম শব্দ হচ্ছে। ডাক্তারে বলেছে বাঁচবার আশা। শুনে মনটা বিষণ্ণতায় ভরে গেল। পড়তে বসলাম পড়ায় মন আসছিল না। মনে হচ্ছিল স্যারকে গিয়ে দেখে আসি। ঠাকুরকে বলছিলাম যেন স্যার তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। ঠিকও করলাম পরদিন পড়ে ফেরবার পথে স্যারকে দেখে আসব। পরদিন (মঙ্গলবার) পড়ে ফেরার পথে G. T. Road-এ আমাদের স্কুলের একটা বাচ্ছা ছেলেকে বাড়ি ফিরে যেতে দেখেই বুঝতে বাকী থাকল না কি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, ''ছুটি হয়ে গেছে নাকি?'' — 'হ্যাঁ, রবিবাবু স্যার আজ মারা গেছেন বলে আজকের পরীক্ষা হবে না।' শুনেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

মনে হচ্ছিল এটা কি করে সম্ভব? বাড়িতে বইটা রেখেই সাইকেলে গেলাম শ্যাম ভিউ নার্সিংহোমে। শুনলাম মিনিট খানেক হল তাঁকে নিয়ে গেছে। তখন রাস্তা ধরে এগোলাম। রাণীসায়র-এর মোড়ে দেখা গেল। কয়েকজন মাস্টারমশাই, অনেক ছাত্র ও পরিচিতরা নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে। পেছু পেছু গেলাম। বাড়ির সামনে নামাল তাঁকে। দেখবার জন্য ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম মুখে ক্লান্তির ছাপ, কিন্তু মৃদু হাসি। রোগ যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান। নিয়তি যেন কোথায় ঘাপটি মেরে বসেছিল। এক থাবায় সদা কর্মব্যস্ত মানুষটাকে শেষ করে দিলে। জীবনের মধ্যাহ্নেই ত্যাগ করতে হল তাঁকে ইহধাম। মনে হচ্ছিল তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত জাহানারার সংলাপটি, ''চমৎকার, আবার বলি চমৎকার।'' সবাইকে ধাঁধাঁ লাগিয়ে বোকা বানানোর পদ্ধতিটা চমৎকারই লাগছিল। মৃতদেহ স্কুলে নিয়ে যাওয়া হল। অনেক মাস্টার মশাইও কাঁদছিলেন। বেশীর ভাগ স্যারই তো রবিবাবুর মাস্টারমশাই! দুই একজন মালাও দিলেন। বহু ছাত্র, লোকজন মৃতদেহ বয়ে চলল শ্মশানের দিকে। একরাশ ফুলে ঢেকে চৌদিকে সুগন্ধি ধূপ সাজিয়ে বি. সি. রোডের ওপর দিয়ে আমাদের ইস্কুলের পোষাক পরা অত ছাত্র যখন তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল এ যেন একটা বিজয়যাত্রা। এ হেন যাত্রাকে শোকযাত্রা বলা মিছে। স্কুলে শিক্ষকরূপে ছিলেন মাত্র চার বছর। কিন্তু ছাত্র, শিক্ষক বা অন্যান্যদের হৃদয় জয় করে নেওয়ার জন্য তাঁর পক্ষে এটুকু সময়ই যে যথেষ্ট! এলেন, সব জয় করলেন, চলে গেলেন। কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছিল তাঁরই কণ্ঠস্বর, ''জয়, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।''

মিউনিসিপ্যালের ছেলে ঃ কয়েকজনের কিছু পরিচয়

শ্রীপাঁচুগোপাল রায়

শিক্ষকগোষ্ঠী যদি হন মিউনিসিপ্যাল স্কুল ভাব-মূর্তির শিল্পী তবে ছাত্ররা তার উপকরণ—কাঠ, খড়, দড়ি, মাটি, খড়ি, রঙ। সেইজন্যে ছাত্রদের কথাই আগে বলা উচিত ছিল কিন্তু তাঁদের কথাই শেষ হয়ে গেল।

১৯০৮-এ প্রথম বিভাগে পাশ করেছেন শ্রীঅনুকূলচন্দ্র। তিনি একজন কৃষি বিজ্ঞানী। বর্তমানে মনে হয় তিনিই প্রবীণতম ছাত্র। তিনি একটি বিশিষ্ট গবেষণাগারে বিশেষ সুনামের সঙ্গে পরিচালকের কাজ করে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি বিজ্ঞান ভিত্তিক সরস প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ ক্ষিপ্র-হস্ত ছিলেন। 'বিজ্ঞান-ভিক্ষু' এই ছদ্মনামে তাঁর এই প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এই 'বিজ্ঞান-ভিক্ষু' এমন জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে বাজারে তাঁর নকল বেরিয়েছিল। সজনীকান্ত একটি সংখ্যায় এই বলে সতর্ক করেছেন যে আমাদের এই 'বিজ্ঞান-ভিক্ষুই' আদি ও অকৃত্রিম, দয়া করে এই নাম ব্যবহার করে কেউ যেন এর যশ অপহরণের চেষ্টা করবেন না। তিনি এই প্রবন্ধগুলি সঙ্কলন করে প্রবন্ধকারে প্রকাশ করেন, তাদের একটির নাম 'যদি'। উৎসবে উপস্থিত থাকার তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ছিল; ভগ্ন-স্বাস্থ্য হেতু তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি।

মিউনিসিপ্যালের সঙ্কট সময়ে পরিচালক সমিতির সভাপতি ছিলেন দেবেন্দ্রকুমার মিত্র। তাঁর পুত্র গিরীন্দ্রনাথ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন শিশু শ্রেণীতে ১৯০০-তে। মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাপ-মারা ছেলে। বড় করে বইয়ের ব্যবসায়ে এই গিরীন্দ্রকুমারই বাঙ্গালীদের প্রথম নামান।

—"এই প্রসঙ্গে হঠাৎ বুক কোম্পানীর গিরীনদা'র কথা মনে পড়িল। আমি তখন মেডিকেল কলেজে পড়িতাম। তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটে আমার মেস ছিল। বুক কোম্পানী ছিল আমাদের মেসের খুব কাছে কলেজ স্কোয়ারের পশ্চিম দিকে। বুক কোম্পানী হইতেই আমার ডাক্তারী বইগুলি কিনিলাম। তাহার পর কি করিয়া যেন জানিতে পারিলেন আমি ছদ্মনামে প্রবাসীতে লিখি। আমাকে বলিলেন, আপনি সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো বইতো কেনেন না। বলিলাম, কিনিতে ইচ্ছা করে কিন্তু কিনিবার পয়সা নাই। গিরীনদা তৎক্ষণাৎ বলিলেন— আপনি যদি পড়তে চান আপনাকে বই দিব। মলাট দিয়া পড়িবেন, বইটি যেন ময়লা না লাগে। পড়া হইলে ফেরৎ দিয়া যাইবেন। গিরীনদার দোকান হইতে অন্য বই পড়িয়াছিলাম। মনে হইতেছে কনটিনেন্টাল সাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় গিরিদার দাক্ষিণ্যের জন্যই হইয়াছিল। মনে পড়িতেছে, Maxim Gorkey-র Mother গিরীনদাই আমাকে পড়াইয়াছিলেন। টলস্টয়ের ছোট গল্প, সিমেন্ট বলিয়া আর একটি রাশিয়ান উপন্যাস। অনুবাদ, মমের বই সবই গিরীনদা'র দোকান হইতে পড়িয়াছি। ক্রমশ তিনি ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে আমার নানা দেশের সাহিত্যের সহিত পরিচয় ঘটিল। গিরীনদার মত পুস্তক বিক্রেতা আজকাল আছে।"[১]

'মণ্ডল-গ্রাম—বর্ধমান" এর দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের ছেলে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে ১৯০৯ এর ২৫ এপ্রিল। বয়স ছিল ১২ বছর ১১ মাস ২৮ দিন। সদ্য পিতৃহারা এই ছেলেটি সেকেণ্ড মাস্টার হেমেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে পিতার অধিক স্নেহ লাভ করেছিলেন। বিদ্যালয় জীবনে তাঁর কোনো অভাব-অসুবিধা হেমেন্দ্রবাবু হতে দেননি। ১৯১২-তে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথ এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের ছাত্র-জীবন আগাগোড়া কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে তিনি বিশেষ সম্মানের অধিকারী হন। বহু মৌলিক গবেষণা ও বিশিষ্ট গবেষকদের গবেষণা পরিচালনার জন্য তাঁর নাম ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশে বারবার বক্তৃতা দেবার জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও দীর্ঘকাল তাঁর কর্মধারা অব্যাহত ছিল। নানা ক্ষেত্রে তিনি আপন কর্মধারাকে প্রসারিত করেছিলেন। মৃৎ-বিশেষ রূপে তাঁর প্রভূত আন্তর্জাতিক

খ্যাতি। প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের জন্যে বিজ্ঞানী মহলে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার স্থান। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালক সমিতির পুরোধারূপে দেশের শিক্ষাবিস্তারে তাঁর বিশেষ প্রযত্ন ছিল। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে সুবৃদ্ধ বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

১৯১৩-তে মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে পাস করেন প্রফুল্লকুমার মণ্ডল। তিনি বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। উপন্যাস রচনায় তাঁর বিশেষ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বের হয়েছিল। গৃহ-কল্যাণী (১৯২০), ঝড়ের আলো (১৯২৪), ঘূর্ণি (১৯৩২) প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাস। অকাল তিরোধানহেতু তাঁর সম্ভাবনার সার্থক রূপায়ন সম্ভব হয়নি।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি নাড়ু গ্রামের প্রিয় গোপাল বসুর ছেলে প্রফুল্লকুমার ৬ বছর ৮ মাস বয়সে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। এই প্রফুল্লকুমার ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তখনকার দিনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার কতদূর বিস্তারিত তা জানতে পারলে এই কৃতিত্বের গৌরব অনুধাবন সম্ভব। বঙ্গ, বিহার, ওড়িষ্যা, আসাম, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান-নিকোবর, সিংহল ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। প্রফুল্লকুমার বসু ইন্টারমিডিয়েটেও প্রথম দশ জনের মধ্যে ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় নিজের গ্রুপে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। তিনি প্রথম কিছুদিন ফরিদপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সেই সময় কবি জসিমুদ্দীন ছিলেন তাঁর প্রিয় সঙ্গী ও বন্ধু। কবি প্রত্যহ তাঁর দেশের বাড়ী থেকে পেট-রোগা বন্ধুর জন্যে কাঁচা পেঁপে, কলা প্রভৃতি আনতেন, বিনিময়ে প্রফুল্লবাবুর সরস সাহিত্য আলোচনা শুনে জ্ঞান সঞ্চয় করতেন। ১৯২৭ থেকে তিনি বর্ধমান রাজ কলেজের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। মাঝে কিছুদিনের জন্যে দিল্লী রামজেস্ কলেজে ছিলেন কিন্তু শরীর না টেকায় চলে এসেছিলেন। প্রফুল্লবাবু প্রথম থেকেই অধ্যাপক হবেন বলে নিজের জীবনকে সেইভাবে গড়েছিলেন। নিজেকে তৈরি করেছিলেন স্টিফেন্স সাহেব ও বিজয় গোপালবাবুর আদলে। আলোচনা যত উচ্চ পর্যায়ের হোক তাকে বিদ্যালয়ের একটি উঁচু শ্রেণীর ছাত্রের শব্দ ভাণ্ডারের মধ্যে রাখবার দুর্লভ ক্ষমতার তিনি অধিকারী। শক্ত শব্দটি মাথায় এসে গেলে সেটিকে ফেরৎ পাঠিয়ে একটি সহজ শব্দ খুঁজে নিয়ে আসবার কষ্ট স্বীকারে তিনি কখনও কাতর ছিলেন না। শক্ত শব্দ বলে ফেললে তার চেয়ে সহজ, আরো সহজ, শেষে সহজতম শব্দটি বলে তিনি হাঁফ ছাড়তেন। এর ফলে প্রতিশব্দ বলার একটা প্রবণতা তাঁর বক্তৃতার মধ্যে এসে যেত। তিনি সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, প্রথম চেষ্টাতেই সবচেয়ে সোজা শব্দটি বলতে চাইতেন। তাঁর ভরাট গলা সমস্ত ক্লাস জুড়ে খাদে বইতো। সকলে সব কথা সহজে গ্রহণ করতে পারত। বাংলা ও সংস্কৃতেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। কালিদাস, সেক্সপীয়ার এক এক দিকে বড়, আমাদের রবীন্দ্রনাথ সকল দিকে বড় — এই ছিল তাঁর সুচিন্তিত অভিমত। ইংরেজী কবিতা পড়াবার সময়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিতেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা বিলম্বিত তালে আবৃত্তি করতে ভালবাসতেন। জমিয়ে কোন বিষয়ে আলোচনায় সঙ্গী এবং সুযোগ পেলে তিনি রোগের কষ্ট ভুলে যেতেন। R. L. Stevenson রোগ শয্যায় থেকে অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র পরিক্রমা করেছেন। রোগের শরীর গৃহকোণে আবদ্ধ হলেও প্রফুল্লবাবুর মন অতীত ও বর্তমানের নানা রণক্ষেত্রের যুদ্ধ-কৌশল পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত থাকত। যুদ্ধের সময় অনেকগুলি খবরের কাগজ সামনে রেখে কে কোনদিকে যাচ্ছে, কোনদিকে গেলে ভুল করবে, — গভীরভাবে এ সব আলোচনা করতে তিনি ভালবাসতেন। এ জিনিস কেন হচ্ছে, এ জিনিস হওয়া উচিত নয়, — এ দুটি কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। তিনি চলে গেছেন কিন্তু ছাত্র-পরম্পরায় তাঁর আলোচনা কোনোদিন ফুরোবে না। বর্ধমানে শিক্ষাসংস্কৃতির আলোচনা যেখানেই হবে সেখানেই প্রফুল্ল বসুর কথা উঠবে। কাউকে তো বলেননি, তোমার হবে না। হবে, হচ্ছে, এইত বেশ হয়েছে— ছাত্রদের একথা বলতে তিনি শিখিয়ে গেছেন। সকলের মধ্যে সম্ভাবনা আছে এই আশ্বাস-বাণী তাঁর কণ্ঠ থেকে বার বার ধ্বনিত হয়েছে।

বর্ধমানের গোতান গ্রামের হরেন্দ্রনাথ সেনের পুত্র শ্রীসুকুমার সেন ৪.২.১৯১২ তারিখে পঞ্চম শ্রেণীতে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯১৭তে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। তিনি বর্ধমান রাজকলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত (অনার্স)-এ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-তত্ত্ব বিভাগে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন এবং এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলার হন ও পরে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেন। যাঁদের অবদানে কলকাতা ভাষাতত্ত্ব বিভাগের বিশেষ বিস্তার সাধনের ফলে আন্তর্জাতিক মান, মর্যাদা ও

গৌরব লাভ করেছে ডঃ শ্রীসুকুমার সেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর অধ্যাপনা কাল পাণ্ডিত্য ও যশে, সহজ শিক্ষাদান পদ্ধতির অনবদ্য প্রকাশে উজ্জ্বলতর; তাঁর অবসর জীবন নানা ক্ষেত্রে গভীর গবেষণার দিশারী আলোকে উজ্জ্বলতম। তাঁর কাজের স্বীকৃতি তাঁর প্রাণের আরামে, তাঁর মনের তৃপ্তিতে। বাইরের কোন উৎসাহের কোনো প্রেরণার প্রয়োজন তিনি জীবনে অনুভব করেন নি। রবীন্দ্র পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রভৃতি সমাজের স্বীকৃতি তিনি সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি ভারতীয় তত্ত্বে তাঁর অবদানের জন্য স্বর্ণপদক দিয়েছেন গ্রেট ব্রিটেনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি। এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পদক লাভ করলেন। শ্রীসুকুনার সেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের রূপকার এবং সবচেয়ে বড় কথা তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশিষ্ট বোদ্ধা। রবীন্দ্র সঙ্গীতের বাণী ও সুর তাঁর অন্তরে অনুরণিত হয় এবং নানা অর্থে নানা রঙে তার ছটা তাঁর অনুভবে ঠিক্‌রে পড়ে। শ্রীসেনের আপন বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ মমত্ব-বোধ ও দুর্বলতা; কিন্তু বাইরে তিনি তা প্রকাশিত হতে দিতে চান না। তাঁর আত্মকথার প্রথম পর্বের নায়কই হলেন সেকেণ্ড মাস্টার হেমেন্দ্রমোহন বসু। তিনিই বনস্পতির ঈগল; আপন মাতৃনীড়ের প্রতি তাঁর খর দৃষ্টি কঠোরে কোমলে মিশ্রিত। আপন স্বভাবসিদ্ধভাবেই কঠোরতা বেশি, কোমলতা কম। শ্রীসুকুমার সেনের যশোগৌরবের সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের যশোগৌরব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ সবাই জানেন তিনি মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শ্রীসুকুমার সেন।

১৯০৬-এর ২রা ফেব্রুয়ারি জাস্টিস বিপিন বিহারী ঘোষ নিজে এসে তাঁর দুটি ছেলেকে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ভর্তি করেন; ভর্তির খাতায় নিজে সই করেছিলেন লম্বা লম্বা বড় বড় অক্ষরে। বড় ছেলে মণীন্দ্রনাথ ১০ বঃ ৬ মাঃ ১৬ দিন বয়সে চতুর্থ শ্রেণীতে আর ছোট ছেলে সুধীন্দ্রনাথ ৬ বঃ ৬ মাঃ ২ দিন বয়সে অষ্টম-খ শ্রেণীতে। মণীন্দ্রনাথ ঘোষ বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী এবং পরে হাইকোর্টের উচ্চপদ লাভ করে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও গৌরব অর্জন করেন। আর ছোটছেলে সুধীন্দ্রনাথ সার্থক মিউনিসিপ্যালের ছেলে, চারদিকে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার ব্যাকুলতা যার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সুধীন্দ্রনাথ ১৯২১-এ লণ্ডন, প্যারিস ঘুরে Strasbourg বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট লাভ করেন। তিনি ছিলেন মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ The Hindu পত্রিকার বৈদেশিক সংবাদদাতা। তাছাড়া জেনিভার লীগ অব্ নেশনস্ সেক্রেটারিয়েটের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। কোন কাজেই তাঁর মন বেশিদিন আবদ্ধ থাকেনি। পরে তিনি লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের এডাল্ট এডুকেশনের লেকচারার হন। তিনি উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীর ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন কিন্তু থাকতে পারেননি। বুদ্ধদেব বসুর 'শোণ-পাংশু' উপন্যাসের নায়ক। সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে তাঁর অধিকার ছিল। নাট্যকলা ও চিত্র-শিল্প নিয়ে তাঁর বহু লেখা বড় বড় পত্রিকায় প্রকাশিত। নিজের জীবনকে ভিত্তি করে তিনি পরপর চারটি উপন্যাস রচনা করেন। সবচেয়ে বিশিষ্ট উপন্যাসের নাম On the Vermilion Boat। ভারতের লোককথা আর রূপগাথা নিয়ে তিনি দু'খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর আলোচনার বিশিষ্ট গ্রন্থ — Rosetti and contemporary criticism। ডাঃ ঘোষ সম্বন্ধে The London Times ঘোষণা করেন—"Perhaps the foremost Indian novelist in English. His books treated his experience as a boy and youngman with droll innocence. He grew in Bengal country side and later lived in Calcutta, but in the scene he was describing, the chief character was sometimes himself witty, simple humourous and romantic."

১৯১৮-তে ১ম বিভাগে পাশ করেন ভোলানাথ রায়। বর্ধমানের রায়ানের ছেলে নাটক রচনা করে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁর হাতেই যাত্রার নাটকের রূপ পরিবর্তিত হয়। তাঁর নাটক অভিনয় করেই গণেশ অপেরা যাত্রাদলগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। তখন যাত্রার দুটি দল প্রধান —ভাণ্ডারী আর গণেশ। ভাণ্ডারী অপেরার প্রধান অভিনেতা ও নাট্যকার ছিলেন ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ; গণেশ অপেরার নাট্যকার ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী। তার পৌরাণিক নাটক কৈকেয়ী, কালচক্র, নরকাসুর প্রভৃতি গণেশ অপেরার জন্যে লেখা। শক্তির অভিশাপের পর রাজা সৌদাসের আর্তি নির্গত হতো আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মতো —

ওহো, পড়িল অশনি শিরে
জ্বলিল রে কাল দাবানল
বৈজয়ন্ত বিধূমিত, মর্ত্য ধূলিসাৎ
নিভাও নিভাও বিপ্র জ্বলন্ত পাবকে
মোদ অগ্নিশর্মা, তব অগ্নিময় আঁখি।

পঞ্চনদ, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকও তাঁর রচিত। পুলিশের কোপদৃষ্টি পড়ায় শেষের দিকে গণেশ অপেরার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে স্টার থিয়েটারের জন্যে

নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। স্টারে তাঁর অভিনীত নাটক অজাতশত্রু, বৃত্রাসুর।

১৯১৭-তে মিউনিসিপ্যাল থেকে পাস করেন শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শম্ভুনাথ ও শিবনাথ নাট্যোমোদী ছিলেন। তাঁদের নিজেদের নাট্যসংস্থা ছিল, যেখানে দেবকী বসুর মত দিকপালের অভিনয়ে অনুশীলন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও পাঞ্চজন্য নাটক দুটি মিনার্ভায় মহাসমারোহে অভিনীত। নাসিগ্রামের উপেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র মনোহর ১৯১২-তে মাত্র ৪ বঃ ৫ মাস বয়সে শিশু শ্রেণীতে ভর্তি হন মিউনিসিপ্যাল স্কুলে। তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ১৯২৪-এর প্রথম বিভাগে পাস করেন। ১৯২৮-এ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে গণিতে (অনার্স) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক ও জুবলীবৃত্তি পান। ১৯৩০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.সি. পরীক্ষায় ফলিত বিজ্ঞানে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্যে বিশেষ 'গোসেন' পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৩১-৩৫ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসবিহারী ঘোষ রিসার্চ স্কলার, গবেষণার বিষয় Hydrodynamics; ১৯৩৬-৪৩ প্রায় আট বছর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের অধ্যাপক। ১৯৩৮-এ মনোহরবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট হন। ১৯৪৩-৫৯ এই ১৭ বছর ছিলেন আগ্রা কলেজে। ৭ বছর গণিতের প্রধান অধ্যাপক, বাকী দশ বছর ছিলেন অধ্যক্ষ। ছেলেদের শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে তিনি ছিলেন বিশেষ যত্নবান। তাঁর আমলে আগ্রা কলেজ খেলাধূলায় নানা বিভাগেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। ড. মনোহর রায় ছিলেন সেই অধিবেশনের গণিত শাখার সভাপতি। তাঁর ভাষণ দেশে বিদেশে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ফ্যাকালটির ডীন হয়েছিলেন। M.W. Mc Lachan এর Theory and Application of Mathien Function বইটি প্রকাশ করেছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। ড. রায় এই গ্রন্থে বিশিষ্ট গবেষক হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছেন। তাঁর ৩৭টি লেখা আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মনোহরবাবু শুধু বড়দের কথা না ভেবে ছোটদের কথাও ভেবেছেন। তাঁর প্রণীত ৪৮টি গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের প্রয়োজনীয় গভীর গবেষণামূলক গ্রন্থও স্থান পেয়েছে। এই বিজ্ঞানসাধক ১৯৭৭, ৮ই জানুয়ারি পরলোক গমন করেন।

১৬.৩.১৯১৫ তারিখে 'পলাশী বর্ধমান' গ্রামের গোপীকৃষ্ণ হালদার একজোড়া ছেলে, নিয়ে এসে ভর্তি করেছিলেন মিউনিসিপ্যাল স্কুলে। একটি চতুর্থ শ্রেণী, আরেকটি ৭ম-ক শ্রেণীতে। বৈষ্ণব বাড়ির ছেলে বলে নামেই মালুম। বড়টির নাম শ্যামচাঁদ, ছোটটির নাম নবদ্বীপ। ছোট নবদ্বীপ যদি স্বাধীন দেশে বা বড় ঘরে জন্মাতেন তাহলে হ্যারল্ড লয়েড বা বাষ্টার কীটন হতেন। তাঁর গলার কাজ হ্যারল্ড লয়েডের চেয়েও বৈচিত্রময়, ভাবভঙ্গি বাষ্টার কীটনকে ছাড়িয়ে যেত।

ফোর্থ ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষা। প্রশ্ন পড়ার পরেই থমথমে ভাব। হঠাৎ নবদ্বীপ নৈঃশব্দ ভেঙ্গে বলে উঠলো, ওরে বাবা। কি হলো। সবাই তার দিকে তাকিয়ে। বললে, Quote from Memory–কোট থেকে মেমরি পর্যন্ত লিখে যেতে হবে একটানা। তাই লিখেই সে পাশ করে গেল।

থার্ড ক্লাসে অঙ্কের ক্লাস। নন্দবাবু অঙ্ক কষাচ্ছেন। হঠাৎ মোরগ ডেকে উঠল। সামনেই ছাই গাদা, মোরগ ডাকা বিচিত্র কিছু নয়। আবার মোরগের ডাক। ভ্রু কুঁচকে নন্দবাবু বুঝলেন মোরগ আছে ঘরের ভেতরেই। তক্কে তক্কে ছিলেন, ফের ডাকেই ধরে ফেললেন ক্যাঁক করে। টেনে বার করলেন, তোর লেখাপড়া হবে! তোকে ভিক্ষে করে খেতে হবে।

নন্দবাবুর শরীর ভেঙেছে। সন্ধ্যেয় মাদুর বিছিয়ে ক্লান্ত শরীর জুড়িয়ে নেবেন। দুয়ারে কড়া নাড়ার শব্দ। সামনে নবদ্বীপ। 'এই দেখুন, সেনোলায় আমার রেকর্ড বেরিয়েছে। ভিক্ষে করে খেতে হবে বলেছিলেন যে!'

নন্দবাবু তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, রাগ করে বলেছি রে, বাবা।

নবদ্বীপ নিজের গান সুর দিয়ে নিজে গান। সে গানের ভাষা একেবারে বুক থেকে মুখে এসেছে। সুর পলাশীর ডাঙ্গার।

শাল গ্রাম, ... হেঁটোয় তুলসী, মাথায়
তুলসী,
জল খাও বাবা, কলসী কলসী।
কোন মুখেতে ধরে বাঁশী গোপাঙ্গনার
মন মজাও।

বা,

শাকে বেগুন চর্চরী
ফ্যাংতা ফ্যাচাং তরকারী।

নানা গলায় যেন নানা জনে গাইছে। তাদের মধ্যে একজনের জিভে ঘা। তার আর একটি বিখ্যাত গান — বোয়ারে ইংরেজে।

ওরে বাবা, যুদ্ধ লেগে গেছে।

''নবদ্বীপ হালদারকে এখনকার দর্শক চেনেন না। ওর

অনেকগুলি রেকর্ডের মধ্যে এখন আর বাজারে একটাও পাওয়া যায় না। ওর তৈরি রি-অ্যাকশান, ওর অদ্ভুত গলা, যে কোন অবস্থায় হাসিয়ে পেটের নাড়ি-ভুড়ি ছিঁড়ে দিতো। ওর কণ্ঠস্বর নকল করবার এমন হিড়িক ছিল যে শেষ পর্যন্ত ওই গলার আওয়াজ শেখাবার জন্যে নবদ্বীপকে একটা স্কুল করতে হয়েছিল। যেখানেই যেতো, অগণিত মানুষ পিছু নিতো, নানা রকম কথাবার্তা বলতো, নবদ্বীপ তাদের সঙ্গে সমান তালে কথা চালিয়ে তাদেরই একজন হয়ে যেতো। সৎলোক সৎশিল্পী নবদ্বীপ হালদারের স্থান পূরণ আর হল না।"[২]

নবদ্বীপের খ্যাতি যখন তুঙ্গে, বড় বড় আসরে যখন তাঁর ডাক তখন একটি লোক তাঁর নিত্যসঙ্গী — including, excluding বুঝিয়ে দেবার জন্যে। কখন খরচা ওর থেকে করতে হবে, কখন বাড়তি দেবে তা বুঝতে নবদ্বীপের ধাঁধা লাগত। ওঁর ধারণা ছিল ওঁকে জব্দ করার জন্যেই ইংরেজরা ও দুটো শব্দ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাঁর বিশেষ বন্ধু শ্রীসন্তোষকুমার চৌধুরী (পটল-দা) কে একথা নিজে বলেছেন। মিউনিসিপ্যালের ডাক মায়ের আহ্বানের মতই উপেক্ষা করার কথা নবদ্বীপ ভাবতেই পারতেন না। মিউনিসিপ্যালের অনুষ্ঠান মানে নবদ্বীপ আর কে. মল্লিকের গান। কাসেম আলি মল্লিক (মানু মিঞা)-কে. মল্লিক নামে বেরোত শ্যামা সঙ্গীতের রেকর্ড আর পণ্ডিত মিশ্র নামে হিন্দি ভজনের। সারা বাংলায় সুরের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সর্বপ্রথম যে রেকর্ড-গুচ্ছ বেরিয়েছিল তাদের একটি ছিল বর্ধমানের মিউনিসিপ্যালের ছেলে দ্বিজেন বাগচীর। গানটি হলো — পাখি, কি গান গাহিলি গাছে...।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর ছাত্রজীবন আগাগোড়া বিশেষ কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস. সি. পদার্থবিদ্যায় (অনার্স) প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় এবং এম. এস. সি. তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি কার্লিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অর্জন করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনি কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের ডি. পি. আই হোন। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যার 'খয়রা' অধ্যাপক। তাঁর পরমাণু-তত্ত্ব বিষয়ে রচিত বাংলা ভাষায় একটি গ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশ করেছেন।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন শ্রীজ্যোৎস্নাকুমার চৌধুরী। তিনি ফলিত পদার্থবিদ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.সি., ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.সি. টেক্ (ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং); কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল ফলিত-পদার্থবিদ্যার। ১৯৫৮ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক; ১৯৭৫-৭৮ যাদবপুর গবেষণা বিভাগের ডীন; ১৯৭৬-৭৯ যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি ফ্যাকাল্টির ডীন।

ইন্‌স্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ারস্ (ইণ্ডিয়া) থেকে তিনি পাঁচটি স্বর্ণপদক লাভ করেছেন—

১. ভারতের রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক (১৯৮০), ২. জহরলাল নেহরু স্মৃতি স্বর্ণপদক (১৯৭৭), ৩. পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য স্মৃতি স্বর্ণপদক (১৯৬৮), ৪. পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য স্মৃতি স্বর্ণপদক (১৯৭৩), ৫. স্যার টমাস স্মৃতি স্বর্ণপদক (১৯৬৬)।

তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯৭০-র অধিবেশনে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেটালারজি শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯৮১ থেকে জেনিভার আন্তর্জাতিক ইলেকট্রো-টেকনিক্যাল কমিশনের চেয়ারম্যান। I.S.I.-এর Electrical Instruments for Industrial Process এর চেয়ারম্যান। ১৯৬৯-এ ম্যাঞ্চেস্টারের Institute of Science and Technology-র visiting professor। তাঁর ৭০টি গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশংসিত।

মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে অনেক ছেলে বেরিয়েছেন এবং তাঁরা জীবনে নানা ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে এখন অনেকেই আছেন যাঁদের বিশেষ পরিচয় না দিলে 'মিউনিসিপ্যালের ছেলে'র পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, নানাভাবে চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নি। অনেকে এখন বর্তমান নেই, তাঁদের পুত্র-কন্যা প্রভৃতি আপন যাঁরা আছেন বা তাঁদের বন্ধু-বান্ধব যাঁরা তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত আছেন, অনেককে বিশেষ অনুরোধ উপরোধ করা সত্ত্বেও তাঁদের কাছ থেকে তেমন প্রশংসনীয় কোন উদ্যম দেখা যায় নি। প্রকৃতপক্ষে কেউই এই বিষয়টি সম্বন্ধে তেমন গুরুত্ব দেননি। আমরাও এই বিষয়টিকে বারবার আঘাত করতে অপারগ হয়েছি। এই স্বল্প পরিসরে সকলের বিশেষ পরিচয় না দিতে পেরে, বাছাই করে বিশেষ কয়েক জনের সামান্য পরিচয় এমনভাবে দিলুম যাতে করে কত রকমের প্রবণতায় কিরূপ প্রতিভার মানুষ এক সময় মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন তা পাঠকরা জানতে পারবেন। এই জানা তাঁদের এই বনস্পতির বিস্তার ও বৈচিত্র

সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত করবে।

রাজনীতি ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আজকের দিনে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত অনেকেই ছিলেন মিউনিসিপ্যালের ছাত্র এবং সে পরিচয় দিতে তাঁরা গৌরব বোধ করেন; যেমন — শ্রীশ্রীকুমার মিত্র, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, শ্রীসরোজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ শাহদুল্লা, মৌলভী আবদুল হাসেম, শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক, শ্রীমনোরঞ্জন প্রামাণিক, শ্রীদেবররঞ্জন সেন প্রভৃতি।

চিকিৎসাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ডাঃ নলিনীরঞ্জন কোনার, শ্রীসত্যরঞ্জন কোনার, শ্রীরমেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপ্রদীপ কানুনগো, শ্রীঅমিত পান, শ্রীউজ্জ্বল সিদ্ধান্ত,জামাল হোসেন প্রভৃতি।

শিক্ষাক্ষেত্রে বহু দিক্‌পাল আছেন যাঁদের সুযোগ ও সময় অভাবে স্পর্শমাত্র করা গেল। তাঁরা হলেন ড. রবীন্দ্রনাথ রায় (সাহা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. শঙ্করদেব মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিহারী বসু, অধ্যাপক প্রমথনাথ বক্সী, কামাল হোসেন প্রভৃতি।

বিচার বিভাগ ও আইন ব্যবসায়ে অসাধারণ কৃতিত্বের দ্বারা যাঁরা আপন মাতৃমন্দিরের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন তাঁরা হলেন শ্রীবিজয়েশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবলাই রায়, শ্রীজ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন শ্রীশ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্রাজিৎ চৌধুরী, এবং আরো অনেকে।

শ্রীকালীদাস চৌধুরী, শ্রীঅজিত সামন্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার।

পরিশেষে আবারও বলি, নিজেদের অক্ষমতা এবং তথ্য সংগ্রহে অসুবিধার জন্যই মিউনিসিপ্যালের অগণিত কৃতী ছাত্রদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে এখানেই আমরা ছেদ টানলুম।

(সংযোজন ঃ ১৯৮৩ সালের পর সংযোজিত হয়েছে আরও বহু নাম। সকলের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। অবশ্যই সেই দায়দায়িত্ব আমাদের, সেইজন্য আমরা দুঃখিত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে যাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা হলেন দেবীদাস ব্যানার্জী, কৌশিক লাহিড়ী, অমিতাভ ঘোষ, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, মানস গোস্বামী, সি. এন. গুপ্ত, উজ্জ্বল সিদ্ধান্ত, অভিজিৎ তরফদার, নিতাই প্রামাণিক, সমুদ্র মুখোপাধ্যায়, শান্তনু ঘোষ, সুবেদ ঘোষ, মামুদ হোসেন, করুণ চৌধুরী, তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত কুণ্ডু, সত্যপ্রিয় পাল, সুরঞ্জন ঘোষ, সূর্য্যব্রত চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ মুখার্জী, তন্ময় দত্তরায়, হীরালাল কোনার, সমীর হাজরা, মৈনাক মুখার্জী, গৌতম সাহা প্রমুখ। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রিয়াংকা রায়, প্রলয় চট্টোপাধ্যায়, বিনায়ক সামাদ্দার চৌধুরী, মন্টু সাহা, ভাস্কর দেব মুখোপাধ্যায়, অরুণকিরণ পাল, ইমানুল হক, আইনব্যবসায় স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, তিতাস চৌধুরী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সাত্ত্বিক ভট্টাচার্য, রাজর্ষী হালদার, শোভন কুমার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম। শ্রী অমলেন্দু চন্দ ২০০৭ সালে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার লাভ করেছে। নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে ললিত কোনার, অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে শ্যামলবরণ সাহা, উৎপল সাহা, সাগর মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ তরফদার, আবৃত্তিচর্চায় অনুপম চট্টোপাধ্যায়, কল্লোল কোনার, অনির্বাণ বিশ্বাস, অহিনপূর্ণ মিত্র, শুভদীপ রায়, সুজয় রায় প্রতিহার, সুব্রত চক্রবর্তী, সৌরভ মুখোপাধ্যায়, ক্যুইজের ক্ষেত্রে সিদ্ধার্থ মুখার্জী, সুমন্ত দাঁ, সজল রাজা, সংগীতে দীপ্র ঘোষাল, মানব বন্দ্যোপাধ্যায়, অঙ্কনে পরাশর চক্রবর্তী ও শ্যামলবরণ সাহা আজ পরিচিত নাম। এই তালিকা অসম্পূর্ণ, ক্রমবর্ধমান ও অন্তহীন। — **প্রকাশক**)

বিদ্যালয়-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ

পাঠ্যপুস্তক আর বিদ্যালয়ের চার দেওয়াল যে শিক্ষার চরম লক্ষ্য নয়, তা শিক্ষাবিদেরা অনেক দিন আগেই বুঝেছিলেন। শিক্ষার্থীর সৃজনী প্রতিভার বিকাশের জন্য তাঁরা যে-সব আয়োজনের কথা বলেছিলেন, বিদ্যালয়-পত্রিকা সেগুলির অন্যতম। মফস্বলের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের রচনাসম্ভার নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস অনেক বিলম্বে ঘটলেও বর্ধমান জেলায় মিউনিসিপ্যাল স্কুলের একটি অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ১৮৮৩ সালে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত পত্রিকা প্রকাশের জন্য কোনো উদ্যমই দেখা যায়নি। মনে হয়, সাহিত্য সাধনার প্রেরণা নিয়েই সে-যুগের ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক আদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে একটি স্বল্পকায় পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন সম্পাদক, প্রকাশক ও ছাত্রদের রচনাকার্যে পরম উৎসাহদাতা। প্রথম সারির পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—

The Municipal High School Boy's Magazine starts on its career to-day. On this occasion we invoke the blessings of the Almighty to make our enterprise fruitful. May He make it a source of fresh joy and inspiration and an instrument of lasting good to all concerned...

We are therefore confident that this modest venture of the boys – this pleasure trip into the fairy land of fancy – will find favour all round. Boys naturally look up to the older folk for guidance and encouragement in this, – their excursion into these unexplored realms of romance.

তাঁর আশা অচিরকালের মধ্যে সার্থক হয়ে উঠেছিল। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে স্কুল, শহর, দেশ-বিদেশের নানা সংবাদ থাকত। পত্রিকা থেকে জানতে পারি, আমাদের বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজোর সময় প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন হতো, সেই সম্মেলনে বারংবার এই প্রশ্নই উঠতো — কেমন করে চাঁদা তুলে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করা যায়।

প্রথম সংখ্যায় বেরিয়েছিল ভবানী চক্রবর্তীর কবিতা 'শীতের হাওয়া', আবদুল গণি খানের কবিতা 'স্বরাজ মোদের এইখানে'। দুটি কবিতাই ছাত্র মহলে প্রশংসা অর্জন করেন। পরের সংখ্যায় সম্পাদক আদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন The Right Outlook and Attitude for Students প্রবন্ধ। শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ কোঙার লিখেছিলেন গুরুগম্ভীর রচনা 'মৃত্যু'। রামতারণ দাস পরেশনাথ ভ্রমণ করে এসে পত্রিকায় তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছিলেন 'আমাদের পরেশনাথ ভ্রমণ' রচনায়। দিবাকর রাউতের কবিতায় সুন্দর হাত ছিল। তিনি এই সংখ্যায় লিখেছিলেন 'ছাত্রদের বিদায়' কবিতা। আশুতোষ ঘোষের 'প্রকৃত সুখী কে' কবিতাটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে কিছুটা অভিনব। সে যুগের সেরা দুজন ছাত্র লিখেছিলেন ইংরেজীতে প্রবন্ধ — ভবতোষ চক্রবর্তীর 'A Strange Military' ও চিত্তরঞ্জন কোঙারের '.Compulsory Adventure' দুঃসাহসিক রচনা।

পরের বছর থেকে বিদ্যালয়-পত্রিকার উৎকর্ষ সাধিত হয়। লেখার বৈচিত্র্য বাড়ে — গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, কবিতা, প্রবন্ধ ছাত্র ও শিক্ষকদের মানসচর্চার পরিচয় বহন করে। বিজ্ঞানের শিক্ষক রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'A Peep into the Mystery of life' পরের বছর প্রকাশিত তাঁর 'বিজ্ঞানের গতি' প্রবন্ধটিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নানান তথ্য স্থান পেয়েছিল, ফলে সেটি ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে। শিক্ষক সুধীরকুমার ঘোষের 'My Little Library' প্রবন্ধটি একটি জ্ঞানের খনি — তথ্য সম্ভারে ঠাসা অথচ ভাষার কারুকলায় সুন্দর। সুধীরকুমার মণ্ডল লিখেছিলেন 'Sir Romesh Chandra Mitra' প্রবন্ধ আর আশুতোষ ঘোষ লিখেছিলেন 'Two Sides of the World' প্রবন্ধ — একটি জীবনী, অপরটি বিশ্ববীক্ষার সাধারণ দিকের আলোচনা। অনিলকান্তি চৌধুরী ও নবঘন মৈত্র এই সংখ্যায় কবিতা লিখেছিলেন, নাম 'ভোলা' ও 'মাতৃহারা'। দুজন লিখেছিলেন ভ্রমণ কাহিনী — সুভাষচন্দ্র বক্সী ও প্রকৃতিভূষণ মিত্র।

এইভাবে পত্রিকা-প্রকাশ নিরবচ্ছিন্ন ... চলে এসেছে।

প্রথম বৎসরের চারবার, তারপর তিনবার, আরও পরবর্তী কালে দু'বার, বর্তমানে কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় একবার প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম দিকে সম্পাদক ছিলেন আদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, জয়দেব রায়, সুধীরকুমার ঘোষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কয়েক বছর প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪৮ সালে স্কুল পরিচালক সমিতির সদস্য প্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস ম্যাগাজিনের নাম দিয়েছিলেন 'কাকলি'। সেই নামই চলে আসছে।

আগেই বলেছি বিভিন্ন সাহিত্য-রূপ নিয়ে ছাত্রেরা নিজেদের সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিতে শুরু করেন। শিক্ষকদের সহযোগিতা সব সময় ছিল। কবিতা-রচনার কথা বলতে গেলে বলতে হয় দিবাকর রাউত, আবদুল গণি খান, আশুতোষ ঘোষ, তারক ঘোষ, চিত্ত ভট্টচার্য স্কুলে কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হননি, পরবর্তীকালে কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। শিক্ষকদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ .... বেশ ভালো কবিতা লিখছেন। শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী 'ভূগোলের ছড়া' লিখে নাম করেছিলেন। কবিতা হিসাবে তার মূল্য তেমন ছিল না, কিন্তু ভূগোল ছড়ার মধ্যে বন্দী করে ছাত্রদের বড় উপকার করেছিলেন। দিবাকর রাউতের 'কোথা গো কানন রাণী' ও 'বিদায় বেলা', আবদুল গণি খানের 'বিদায় গীতি', বিশ্বনাথ রক্ষিতের 'কোকিল' ও 'জন্মভূমি', মহম্মদ ইউনাসের 'কবির গান' ও 'বন্ধু বিয়োগে'; সুভাষচন্দ্র বক্সীর 'আগমনী', 'কৃষ্ণ বালিকা' ও 'হীরেন তারাপদর চিরবিদায়'; সমরেন্দ্রনাথ ঘোষালের 'বটের ছায়ে'; আশুতোষ ঘোষের 'স্মৃতি', 'একটি অশ্রুভেজা দিন' ও 'ফেলে আসা দিন', কালীপদ সিংহের 'আটত্রিশ ভাই', 'কারবালা' ও 'নিঃস্ব'; প্রবোধেন্দুনাথ ঘোষালের 'অর্ঘ্য'; তারক ঘোষের 'জাগরণ', 'অভিযাত্রী', 'আমি রিক্ত', 'গঙ্গাধর কোলের স্মরণে' ও 'তরুণের স্বপ্ন'; বিভূতিভূষণ দাসের 'পারের ডাক' ও 'নিবেদন'; অলোকানন্দ ভট্টাচার্যের 'স্বপ্ন খেলা', 'রামের মত হতাম যদি' ও 'সুকান্ত-স্মরণে'; কার্তিক বটব্যালের 'তোমারে পাইব বলে', 'রবীন্দ্র মহাপ্রয়াণে' ও 'পাওয়া'; গদাধর রক্ষিতের 'বুদ্ধদ্বয়ের বিয়োগ'; জ্যোৎস্না চৌধুরীর 'আদ্যস্মৃতি'; সনৎ গাঙ্গুলীর 'পল্লীর ইতিহাস'; বেণুবিলাস মিত্রের 'ছাত্রের জীবন'; ষোড়শীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'আশা'; ভূবনেশ্বর সিংহ-রায়ের 'আজব দেশ' ও ভোলানাথ মোহান্তের 'স্মরণে'; অজিত গাঙ্গুলীর 'সাঁঝের কথা' চিত্ত ভট্টাচার্যের 'মিলেছি ফের অঙ্গনে'; অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের 'ভারত সাধক বিবেকানন্দ', উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'শারদ দিনে'; কমলকৃষ্ণ ঘোষের 'আর্বিভাব', অচিন্ত্যশুভ্র মিত্রের 'শত্রুর নেই শক্তি'; অরিন্দম গাঙ্গুলীর 'শ্রেষ্ঠ অকর্মা' প্রভৃতি কবিতা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষকদের মধ্যে অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল রায়, রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাধবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিতা লিখেছিলেন।

শিক্ষক কালীকুমার মিশ্র সংস্কৃত কবিতা রচনা করে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'শান্তিনির্ণীত' ও 'বেদান্ত' কবিতা পড়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রশংসা করেন।

ছোট গল্প লেখা কঠিন, কিন্তু সেই দুর্গম পথেও অনেক ছাত্র পথিক হয়েছিলেন। বিশেষত মানজীবনের দুঃখের দিকটাই কিশোর মনকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। কিন্তু সেই করুণ রসকে সংযতভাবে প্রকাশ করবার মতো তাঁদের শিল্পপ্রতিভা ছিল না, তাই উচ্ছ্বাস সহজেই এসে পড়েছে। অবশ্য অন্যান্য স্বাদের গল্পও তাঁরা লিখেছেন। শিক্ষকদের মধ্যে অশ্বিনী কুমার ভট্টাচার্যের গল্প লেখার ভালো হাত ছিল। তাঁর 'বামুন ও সাপ' ও 'পুরুষকার' গল্প দুটি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেছে। ছাত্রদের মধ্যে ... লিখেছিলেন অনিলকান্তি চৌধুরী, রঞ্জন চৌধুরী, জহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণালেন্দু ঘোষাল, শিবমোহন বসু, প্রবোধেন্দু ঘোষাল, ধীরেন্দ্রনাথ রায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, মুক্তিপদ সিংহ, বিভূতিভূষণ দাস, নীহারকান্তি চৌধুরী, সুরেশ ঘোষ, মহম্মদ ইসমাইল, আফজল কাদের, সুধাংশুমোহন দত্ত, ভক্তিপদ সিংহ, অজিত কুমার সামন্ত, কান্তিপদ ঘোষ, তপনকুমার রক্ষিত, কান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, সোমেশ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভ্রমণকাহিনী রচনায় ছাত্রদের উদ্যম ও উৎসাহ কম ছিল না। বরং ছোট গল্পের তুলনায় ভ্রমণ কাহিনীতে ছত্রেরা ক্ষমতার বেশি পরিচয় দিয়েছেন। অনিলকান্তি চৌধুরীর 'অনন্তের পথে' ও 'তাজমহল'; সুভাষচন্দ্র বক্সীর 'হুডরু জলপ্রপাত'; নবঘন মৈত্রের 'দার্জিলিং ভ্রমণ' ও 'মাদ্রাজে চারদিন'; সুধাংশুমোহন দত্তের 'আমার বিলাত ভ্রমণ, সোমেশ মুখোপাধ্যায়ের 'বক্রেশ্বর দর্শন'; জগজ্জ্যোতি মিত্রের 'পুণ্যতীর্ত প্রভাস দ্বারকা' উত্তম রচনা।

প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে স্মৃতি চারণা খুব কম জনই করেছিলেন। পঞ্চানন মণ্ডলের 'হাই স্কুলে চার বছর' রচনায় সেকালের বিদ্যালয় জীবনের চার বছরের সুখদুঃখ হাসি-কান্না মাখা স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ দিতেন শিক্ষকেরা। তাই প্রবন্ধের দিক থেকে ছাত্রদের চিন্তাভাবনার উৎকর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আমাদের দেশের স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চা বেশি ছি না, সেইজন্য বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ অপ্রতুল। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে ছাত্রেরা উৎসাহী হয়ে ওঠেন। প্রথম দিকে ধর্ম, মহাপুরুষদের জীবনী ও কর্ম ও অন্যান্য চিন্তাঘটিত প্রবন্ধের সংখ্যাধিক্য। যেমন মৃত্যুঞ্জয় বক্সী 'দীক্ষা' প্রবন্ধে কর্ম-যোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের আলোচনা করে উপসংহার টেনেছেন সংসার ধর্মের শ্রেষ্ঠতায়। সুধীরকুমার মণ্ডল

'অশ্রু-কণা' প্রবন্ধে মানুষের হৃদয় বৃত্তির স্বরূপ তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া কমলকৃষ্ণ ঘোষ 'দারিদ্র্য', 'শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'বঙ্কিম প্রসঙ্গে', 'শ্রীচৈতন্য' ও 'নিবেদিতা স্মরণে', দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় 'অনন্তের পথে', কালীপদ সিংহ 'তিনি ও তখন' ও 'বর্ধমানে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী', তারাপদ রায় 'বিদ্যুতের বাহাদুরি', প্রমথনাথ অধিকারী 'পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম', শিবমোহন বসু 'মানবের চরম লক্ষ্য', সৈয়দ আবদুল আলিম 'একে একে নিবিছে দেউটী', নির্মলকান্তি সেনগুপ্ত 'প্রাচীন ... পদ্য পরিচয়', পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় 'অস্পৃশ্যতা বর্জন' সৈয়দ মোজাম্মেল হোসেন 'তাজমহল', প্রশান্তকুমার গাঙ্গুলী 'কাগজ ও তার ইতিহাস', কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য 'বিশ্বপ্রেম', বিভূতিভূষণ দাস 'রবীন্দ্র সাহিত্যে শিশু', অবনী চট্টোপাধ্যায় 'সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ', সূর্যকান্ত দত্ত 'ভক্ত রবিদাস', শক্তিপদ সিংহ 'সাবান প্রস্তুত-বিধি', সৈয়দ এনায়েত করিম 'ধূমকেতু', সুচিন্ত্য সেনগুপ্ত 'পাথুরিয়া কয়লা', তারাপদ চৌধুরী 'সামুদ্রিক উদ্ভিদ', অপূর্ব কুণ্ডু 'ভারতের স্বাধীনতা', অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় 'যোগব্যায়াম', মৃণালকান্তি সামন্ত 'মানুষের জন্ম ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি', দীপঙ্কর সেনগুপ্ত 'শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা নিকেতন', 'গৌড়'; প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধারীর আবেদন', পঞ্চানন মাজি 'আজকে বাঙ্গালী', মোল্লা আব্দুল হক 'শান্তিকামী মরু দুলাল', দীনবন্ধু অধিকারী 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ', সুনির্মল ঘোষ 'রবীন্দ্র প্রতিভার নানা দিক', অপূর্ব কোনার 'ব্যায়াম জগতের পথে', অনিলকুমার গুপ্ত 'সৌর তেজের উৎস ও পরমাণু', শিক্ষক কালীকৃষ্ণ মিত্র 'স্মৃতির বেদনায়' (প্রয়াত শিক্ষক শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি), সুগত হাজরা 'মল্লরাজার কীর্তি কথা', 'দেশবন্ধু', 'রূপকথার নায়ক রাসবিহারী', ললিত কোনার 'শিল্পী জীবন', 'অভিনয়ের শ্রেণী বিভাগ—রস ও ভাব', শ্রীকুমার সরকার 'সাধক বামদেব', অভিজিৎ তরফদার 'বিদ্রোহী কবি নজরুল', মৈনাক মুখোপাধ্যায় 'জীবাণু তত্ত্ব' ও 'সকল দেশের রাণী', রঞ্জন চৌধুরী 'জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কার', 'সংখ্যা ও সংখ্যা লিখন' ও 'অনু ও পরমাণু', দীনবন্ধু ভট্টাচার্য 'বহির্জগতে ভারতীয় সংস্কৃতি', বিশ্বরঞ্জন মজুমদার 'আচার্য সত্যেন বসুর অবদান', সুদীপ্ত চক্রবর্তী 'সৌরজগতের আমাদের কয়েকটি প্রতিযোগী, গৌতমেশ্বর মজুমদার 'রক্তের গ্রুপ ও তার প্রয়োজনীয়তা', সাবর্ণকুমার দে 'শক্তির উৎস', সুজান হাজরা 'জ্ঞানতাপস আইনষ্টাইন', কৌস্তুভ চট্টোপাধ্যায় 'কণাদ থেকে', দেবনাথ মল্লিক 'একটি অবিস্মরণীয় জীবন' প্রবন্ধ লিখেছেন। (১৯২৮ সালের মার্চ মাসে প্রথম বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ও প্রকাশক — শ্রী আদ্যানাথ চট্টোপাধ্যায়

১৯৪৮ সালে বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সদস্য — শ্রী প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, বিদ্যালয় পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন 'কাকলি'।)

বিদ্যালয় পত্রিকার পরিচালনায় যাঁরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঃ-

১৯২৮-৩২
সম্পাদক — আদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক — জয়দেব রায়

১৯৩২-৩৩
সম্পাদক — সুধীর কুমার ঘোষ
ছাত্র সম্পাদক — তারাপদ রায়
ছাত্র সম্পাদক — সুভাষ বক্সী

১৯৩৩-৩৭
সম্পাদক — আদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
ছাত্র সম্পাদক — অজিত কুমার রায়
ছাত্র সম্পাদক — কালীপদ সিংহ

১৯৩৮—
সম্পাদক — রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক — অশ্বিনী কুমার ভট্টাচার্য
ছাত্র সম্পাদক — জ্যোৎস্নাকুমার চৌধুরী
সৈয়দ আবদুল আলিম
প্রবোধেন্দু ঘোষাল

১৯৩৯
সম্পাদক — রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
সহসম্পাদক — অশ্বিনী কুমার ভট্টাচার্য
ছাত্র সম্পাদক — প্রবোধেন্দু ঘোষাল
কমলকৃষ্ণ ঘোষ
বিভূতিভূষণ দাস
সৈয়দ মোজাম্মেল হোসেন

১৯৪০
সম্পাদক — রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক — অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য
ছাত্র সম্পাদক — বিভূতিভূষণ দাস
সৈয়দ মোজাম্মেল হোসেন
মধুমোহন শীল
কার্তিকচন্দ্র বটব্যাল

১৯৪১-৪২
সম্পাদক— জগদিন্দ্র ঘোষ
সহ-সম্পাদক — হরিপদ মণ্ডল
ছাত্র সম্পাদক — কার্তিকচন্দ্র বটব্যাল
মহম্মদ ইসমাইল

১৯৪২-৪৩
সম্পাদক— সন্তোষ কুমার দে
সহ-সম্পাদক — মথুরানাথ ঘোষ ও
রাধিকামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
ছাত্র সম্পাদক — মহম্মদ ইসমাইল
অজিত কুমার মজুমদার
রামনারায়ণ মিত্র

১৯৪৯-৫০
সম্পাদক — রাধিকামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক — হরিপদ মণ্ডল
কমলকৃষ্ণ ঘোষ
ছাত্র সম্পাদক — ভক্তিপদ সিংহ
যুগল মিত্র

১৯৫১-৫৪
সম্পাদক— সন্তোষকুমার গোস্বামী
যুগ্ম সম্পাদক — কমলকৃষ্ণ ঘোষ
সহ-সম্পাদক — বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
পাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
ভোলানাথ ভট্টাচার্য
জগজ্যোতি মিত্র
ছাত্র সম্পাদক — গুরুপদ মিত্র

১৯৫৫-৫৯
সম্পাদক — সন্তোষকুমার গোস্বামী
সহসম্পাদক — কমলকৃষ্ণ ঘোষ
কালীকৃষ্ণ মিত্র
রামহরি চট্টোপাধ্যায়

১৯৭১-৭২, ৭৩, ৭৪-৭৫
সম্পাদক — পাঁচুগোপাল রায়
যুগ্ম সম্পাদক — গদাধর রক্ষিত
কমলকৃষ্ণ ঘোষ
রামহরি চট্টোপাধ্যায়
গৌরীশঙ্কর সেন
শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শক্তিপদ মহাপাত্র
মৃত্যুঞ্জয় খান
কাশীনাথ আদক
দুর্গাপ্রসাদ সিংহ

ছাত্র সম্পাদক — সুগত হাজরা
গৌতম সরকার
দীনবন্ধু ভট্টাচার্য
সঞ্জীব চক্রবর্তী
অভিজিৎ তরফদার
সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

১৯৭৬-৮০
সম্পাদক — গৌরীশঙ্কর সেন হাজরা
সহ-সম্পাদক — কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
রামহরি চট্টোপাধ্যায়
ছাত্র সম্পাদক — অরুণ কিরণ পাল
ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য
কাজল রায় চৌধুরী

১৯৮২
সম্পাদক — গৌরীশঙ্কর সেন হাজরা
সহ-সম্পাদক — কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
রামহরি চট্টোপাধ্যায়
ছাত্র-সম্পাদক — সজল রাজা
সুরেন্দ্র ভাটিয়া

১৯৮৫-৮৬
মুদ্রক ও প্রকাশক — শ্রীশ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য
সম্পাদকমণ্ডলী — রামহরি চট্টোপাধ্যায়
গৌরীশঙ্কর সেন হাজরা
কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
নিত্যানন্দ মিত্র
রাধাপ্রসন্ন মণ্ডল

১৯৮৭-৯২
মুদ্রক ও প্রকাশক — শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য
সম্পাদকমণ্ডলী—গৌরীশঙ্কর সেনহাজরা
রাধাপ্রসন্ন মণ্ডল
অরুণাভ চক্রবর্তী
শান্তনু মিত্র

১৯৯৯-৯৭
প্রকাশক — গৌরীশঙ্কর সেনহাজরা
সম্পাদকমণ্ডলী — রাধাপ্রসন্ন মণ্ডল
শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য
শান্তনু সেনহাজরা
কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
সঞ্জীব চক্রবর্তী
দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
অরুণাভ চক্রবর্তী
শান্তনু মিত্র
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯৮-২০০২
প্রকাশক — শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য
সম্পাদকমণ্ডলী — রাধাপ্রসন্ন মণ্ডল
শান্তনু সেনহাজরা
অরুণাভ চক্রবর্তী
শান্তনু মিত্র
দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
জয়দেব কুণ্ডু
সঞ্জীব চক্রবর্তী
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
কৌশিক রায়
রামকৃষ্ণ কর্মকার
চঞ্চল রায়
জয়তী ভট্টাচার্য
চিন্ময় কুমার বিশ্বাস

২০০৩-০৬
প্রকাশক — অরুণাভ চক্রবর্তী
সম্পাদকমণ্ডলী — শম্ভু হরিপান
সঞ্জীব চক্রবর্তী
শান্তনু মিত্র
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
জয়দেব কুণ্ডু
সন্তোষ কুমার ঘোষ
কৌশিক রায়
রামকৃষ্ণ কর্মকার
ফাল্গুনী মিস্ত্রী
চঞ্চল কুমার রায়
রীতা মুখোপাধ্যায়
চিন্ময় কুমার বিশ্বাস
ছাত্র সম্পাদক— অনিরুদ্ধ ইসলাম
সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়
অনীক চট্টোপাধ্যায়
অম্বর কোনার
দেবদীপ সরকার
অভিষেক মুখোপাধ্যায়
জয় মুখোপাধ্যায়

মিউনিসিপ্যালের খেলা-ধূলা

শ্রীপাঁচুগোপাল রায়

মিউনিসিপ্যালিটির বিশেষ মিটিং-এ একটি স্কুল গড়ার যখন জল্পনা-কল্পনা চলছে ১৯১২-১৮৮২ তারিখে তখনই ঠিক হয়েছে ছেলেদের শরীর চর্চার জন্যে সাজ-সরঞ্জাম সমেত একটি উপযুক্ত জিমন্যাসিয়ামও স্কুলে থাকবে। আর যদি টাকায় কুলোয় তবেই নেওয়া হবে একটি দক্ষ ক্রীড়া শিক্ষক। কিন্তু এই টাকার অভাব আর কিছুতেই যায় না। প্রত্যেক বছরই একবার করে প্রশ্ন ওঠে আর স্থগিত থাকে। এদিকে সত্যিকার শিক্ষা দিতে হলে শিশুদের মনের সঙ্গে শরীরের বিকাশ সাধনের ব্যবস্থাও যে দরকার এ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন সরকার। একটি শারীরশিক্ষা বিভাগ বসেছে, আর সেই বিভাগের ডি. পি. আই হয়েছেন Mr Segard এই সেগার্ড সাহেব থেকে ফতোয়া দিচ্ছেন, ক্রীড়া-শিক্ষক রাখতে হবে, স্কুলের রুটিনে ড্রিলের ব্যবস্থা করতে হবে। কলকাতায় Dr Grant-এর জিমনাসিয়াম খোলা হলো। ক্রীড়া-শিক্ষকদের শিক্ষণ দেবার সেখানে ব্যবস্থা। ১৯.১.১৯১৪ তারিখে মিউনিসিপ্যাল স্কুলকে সেগার্ড সাহেব নির্দেশ দিলেন সেখানে একজন শিক্ষককে পাঠাবার জন্যে। কিন্তু টাকার অভাবে কাউকে সেখানে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। সামান্য কিছুদিনের ট্রেনিং নিয়ে মিউনিসিপ্যালের ছেলেদের প্রথম লাইন দিয়ে ড্রিল করাবার জন্যে দাঁড় করালেন ভৈরববাবু।

তবে যেসব ছেলের ঝোঁক বেশি তারা কিছু কিছু খেলার সুযোগ পেতে আরম্ভ করেছে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষ্য করে একটি ক্লাব গড়ে উঠেছিল যার নাম ডায়মণ্ড জুবিলী ক্লাব ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। রাজা বনবিহারী কাপুর ফুটবল অনুরাগী ছিলেন। তাঁর অর্থানুকূল্যে একটি ক্রীড়া সংস্থা গড়ে উঠলো। লীগ কাপ ও চ্যালেঞ্জ কাপ খেলার ব্যবস্থা হলো। লালা বংশগোপাল নন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় টাউন ক্লাব নামে একটি ক্লাব নিয়মিত খেলাধূলার ব্যবস্থা করেছিল। এই ক্লাবে গোলে খেলতেন শরৎ ঘোষ, ব্যাকে ননী বসু আর অতুল ঘোষ, সেন্টার-হাফ নীরোদ সেন; আর আক্রমণ ভাগে প্রামাণিক দুই ভাই এবং অতুল সিংহ। এছাড়া বর্ধমান স্পোর্টিং ক্লাব নামে একটি ক্লাবেরও বেশ নাম ছিল। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার সম্পাদক ছিলেন। স্কুলের বড় বড় ক্রীড়া দক্ষ ছেলে ভিড়ে যেত এই সব দলে। ওঙ্কারনাথ রায়ের পুত্র বিনোদগোপাল রায় যখন মিউনিসিপ্যালে পড়তেন তখনই একজন ধুরন্ধর খেলোয়াড় বলে খ্যাত ছিলেন। দুলোবাবু নামে সমধিক পরিচিত এই বিনোদগোপাল রাজ কলেজের ক্রীড়া শিক্ষকরূপে বর্ধমানের ক্রীড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

মিউনিসিপ্যালের প্রথম স্বীকৃত স্পোর্টসম্যান সনৎ চৌধুরী। ১৯১৮ তে তিনি এই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। তিনি দূরপাল্লার দৌড়বীর ছিলেন। ১৯১৭ এবং ১৯১৮ পরপর দুবছর নিখিলবঙ্গ আন্তর্বিদ্যালয় শীতকালীন প্রতিযোগিতায় ১ মাইল দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। বলতে গেলে তিনিই প্রথম কলকাতার মাঠে বর্ধমানকে নিয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে সর্ব-সাধারণের দশ মাইল দৌড়েও তিনি প্রথম হন। সর্ব-সাধারণের পাঁচ মাইল দৌড়ে মিউনিসিপ্যালের ছেলে শ্রীরবি চট্টোপাধ্যায় এবং পরের বছর শ্রীসন্তোষ চৌধুরী প্রথম হয়েছিলেন।

মিউনিসিপ্যালের প্রথম পুরোপুরি ক্রীড়া শিক্ষক হলেন সুচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তিনি এই স্কুলের দীর্ঘদিনের ছাত্রও ছিলেন। অত্যন্ত দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়, দুর্দান্ত গতি আর স্থির লক্ষ্য। দুলোবাবু যে দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড তিনি তার রাইট-আউট। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সেনাদল ডি. সি. এল. আই.-এর বিরুদ্ধে চকিতে গোল করে বিরাট হৈ হৈ তুলেছিলেন। ২৮.৩.১৯-এ তিনি নিয়োগপত্র পেলেন

ড্রিল এবং ক্রীড়াশিক্ষকরূপে — ৩০ টাকা বেতন। ডি. এস. পি. মিঃ আর. এস. ডুফল সাহেবের ড্রিলে দক্ষতার প্রশংসাপত্র পেশ করে ২.২.২০ তারিখে তিনি পাকা হন। মিউনিসিপ্যালের ছেলেদের তিনি মাঠে নামালেন। মাঠ কোথায়? ২৯.৫.১৮৯৪ তারিখে বর্ধমান টাউন হলের উদ্বোধন। লালা বংশগোপাল নন্দে নির্মাণ কার্য শেষ করেছিলেন। কিন্তু উদ্বোধন দেখে যেতে পারেননি। এই টাউন হলের কাছাকাছি মিউনিসিপ্যাল স্কুলের নিজের বাড়ী হবে, বড় সাধ ছিল। তারই পাশের মাঠে, এখন যেখানে জজ-কোর্ট, মিউনিসিপ্যালের ছেলেরা খেলার লিখিত অধিকার লাভ করল। সেইখানে সুচাঁদবাবু (ফুজো মাস্টার) ছেলেদের নিয়ে নিজে খেলতেন, তাদের খেলাতেন। পরে ১৯২৬-এ ঢলদীঘি-কুঠি সংলগ্ন মাঠ তৈরি হলো।

তখন বর্ধমানে ফুটবল প্রতিযোগিতা দুটি — বনবিহারী লীগ কাপ আর বনবিহারী চ্যালেঞ্জ কাপ। বনবিহারী লীগ কাপে বড় বড় ক্লাব, কলেজ, মেডিক্যাল স্কুল সকলেই খেলতে পেত। এই প্রতিযোগিতায় স্কুল দুটির যোগদান শুধু অনুশীলন ও সাহস সঞ্চয়ের জন্যে। তাদের ওপর সকলের ছিল অনুকম্পার দৃষ্টি, সবার নীচে থেকে দুই কি এক পয়েন্টেই তাদের সন্তুষ্টি। কিন্তু মিউনিসিপ্যালের মধ্যে সর্বদাই কাজ করছে ওপরে ওঠার প্রবৃত্তি। সুচাঁদবাবুর শিক্ষাধীনে মিউনিসিপ্যাল প্রবল শক্তিশালী দল গঠন করে ফেলল। একে একে সকলকে হারিয়ে সে ওপরে উঠে এল। শেষ নিষ্পত্তির খেলা হলো বয়েজ এথেলেটিক্সের সঙ্গে; প্রথম দিন ড্র, খেলা সমান সমান; তারপরের খেলায় ১-০ গোলে হারিয়ে দিল। গোল করেছিলেন সুবোধ মিত্র — যাঁর নামে সুবোধ মেমোরিয়াল কাপ। তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাকে বিপক্ষের সকল আক্রমণ ভোঁতা করে দিয়েছিলেন। ১৯২৫-এ এই অপ্রত্যাশিত লীগ বিজয় সিংহ শিশুর প্রথম শিকার। পুর্ণচন্দ্র বসু ছিলেন এই দলের অধিনায়ক। মিউনিসিপ্যালের এই গৌরব শহরের মানুষকে উল্লাসে আন্দোলিত করেছিল। বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট Mr C. V. R. Sells সাহেব পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির ভাষণে বিদ্যালয়ের ছেলেদের এই কৃতিত্বের এবং সুচাঁদবাবু কর্ম-কুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরই সুপারিশে সেই মাস থেকে সুচাঁদ বাবুর পাঁচ টাকা বেতন বেড়ে যায়।

স্কুলটি ব্যায়াম চর্চারও একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। প্রথম থেকেই একটি ভাল জিমনাসিয়াম গড়বার ইচ্ছে ছিল কর্তৃপক্ষের; বছর বছর কিছু কিছু টাকা তাতে খরচ করা হতো। ১৯২৪-এ এর জন্যে বরাদ্দ করা হয় ২৮০ টাকা। ১৭.২.১৯২৪-এ সুচাঁদ বাবু কলকাতায় ৬ সপ্তাহের ট্রেনিং নিয়ে এসেছিলেন। ১৯২৬-এ তিনি স্কাউট মাস্টার যোগ্যতা অর্জন করেন। স্কুলের স্কাউট দল বয়েজ স্কাউট এসোসিয়েশন তালিকাভুক্ত হয় ৫.২.২৭-এ। টাউন স্কুল হবার পর তার ওপর পড়লো সরকারী নেক নজর। সেখানে কোনো ক্রীড়া শিক্ষক ছিলেন না। বিভাগীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রস্তাব দিলেন সুচাঁদবাবুকে। উভয় স্কুলের ক্রীড়া-শিক্ষক করা হোক। তাঁর কাজের রুটিন এমনভাবে করা হোক যাতে তিনি দুটি স্কুলেই ড্রিল করাতে পারেন। এর ঠিক আগেই মিউনিসিপ্যালের হেড মৌলভীকে টাউন স্কুল ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গেছে। এ প্রস্তাবে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ প্রবল আপত্তি জানালেন।

১৯২৮ এর জুলাই মাসে সুচাঁদবাবু বিদ্যালয় ছাড়লেন। তাঁর ৩০ টাকা মাইনে বছর বছর বেড়ে তখন ৪৫ টাকা হয়েছিল; আরো দশ টাকা বাড়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। মিউনিসিপ্যালে আপন কাজের এমন স্বীকৃতি তাঁর মত আর কেউ পাননি।

মিউনিসিপ্যালের মাধ্যমে সুচাঁদবাবু বর্ধমানকে অনেক কৃতী ক্রীড়াবিদ উপহার দিয়ে গেছেন যাঁরা বর্ধমানের খেলার মাঠ মাতিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রণবেশ্বর সরকার, মুকুন্দ মাধব সামন্ত, বিরজাপতি ভট্টাচার্য্য, সুশীল মুখোপাধ্যায়, মধুরানাথ ঘোষ, হরিহর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরবি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষ চৌধুরী, অশ্বিনীকুমার হাজরা, সরোজ বক্সী, শ্রীশ সিংহ ও যাদবোত্তম সামন্তের নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। যাদবোত্তম এক যুগ ধরে বর্ধমানমাঠে প্রভুত্ব করেছেন, কলকাতার মাঠেও প্রশংসার সঙ্গে খেলেছেন।

সুচাঁদবাবু চলে গেলেন কিন্তু মিউনিসিপ্যালের ছেলেরা মাঠের রস আস্বাদনের আনন্দ তখন লাভ করেছে। তার থেকে তাদের হঠানো সম্ভব হয়নি। ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালেরা সেরা স্পোর্টস্ম্যান হলেন পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়। তিনি দৈর্ঘ্য-লম্ফন ও নিকট পাল্লার দৌড়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পঙ্কজবাবু ১৯২৬-এ মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯২৮-এ তিনি ছিলেন সারা বাংলার শ্রেষ্ঠ স্পোর্টসম্যান। ১৯২৫-এ পাশ করে ছিলেন বিনয়কুমার চৌধুরী। নিখিলবঙ্গ আন্তর্বিদ্যালয় শীতকালীন প্রতিযোগিতায় পরপর দু বছর তিনি উচ্চ লম্ফনে প্রথম হয়েছিলেন। দুর্গাকুমার চৌধুরী

দীর্ঘকাল মিউনিসিপ্যালের ছাত্র ছিলেন। তিনি পোলভল্টে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন। ক্রীড়া জগতে ডি. কে. নামে তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধা ভাজন। সুচাঁদবাবুর টানে তিনি মিউনিসিপ্যাল ছেড়ে টাউন স্কুল যান এবং সেখান থেকে পাস করেন। শ্রীআনন্দ বিহারী বসু ১৯২৮-এ মিউনিসিপ্যাল থেকে পাস করেন। স্পোর্টসের সকল বিভাগেই তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। ১৯৩০-এ সারা বাংলার সিকি মাইলের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর বলে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। ছোট লাটের সেই প্রশংসাপত্রটি আজও নষ্ট হয়নি। সুচাঁদবাবু চলে যাবার পর পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়কে ক্রীড়া-শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অন্যত্র ভালো সুযোগ পেয়ে চার মাস কাজ করার পর তিনি চলে গেলেন। এর পর ক্রীড়া শিক্ষক হলেন অরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯২৮-এর ডিসেম্বর মাসে। অরুণবাবু স্থায়ী হয়েছিলেন ১.৭.১৯২৯ তারিখে। তিনি দুবছর ছিলেন। অরুণবাবু চলে যাবার পর ক্রীড়া শিক্ষক হয়ে এলেন সুধাংশু ভট্টাচার্য ১.৯.৩১-এ। সামরিক বিভাগে চাকরী করার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ যত্নবান এই শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের ভয়-ভক্তি দুই-ই ছিল সমান মাত্রায়। তিনি ছিলেন সকলের পি. আই। খেলার মাঠে মিউনিসিপ্যালের গৌরব তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। তাঁরই আমলে ১৯২৫-এ লীগ বিজয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছিল। সেই বছর লীগে দুর্ধর্ষ খেলা খেলেছিল মিউনিসিপ্যাল। বর্ধমানে বরাবরই রোণাল্ডসে মেডিক্যাল স্কুল টিম ছিল বিশেষ শক্তিশালী। গোষ্ঠপালের জুড়িদার রাসবিহারী দাস এক সময় এই মেডিক্যালে খেলতেন। মেডিক্যালের বিরুদ্ধে খেলায় মিউনিসিপ্যালের ছেলেরা শুরু থেকেই খেলেছিল আক্রমণাত্মক খেলা। মেডিক্যাল গুছিয়ে বসবার আগেই তীব্র সটে গোল করেছিল সুযোগ সন্ধানী সেন্টার-ফরোয়ার্ড বেটো (সুধাংশু সিংহ)। সেই গোল শত চেষ্টাতেও শোধ করা সম্ভব হয়নি। সমস্ত আক্রমণকে উপযুক্ত জবাব দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন গোল-রক্ষক মৃগাঙ্ক বিশ্বাস, ব্যাক মহম্মদ আলম আর সেন্টার হাফ শ্রীবিনোদীমাধব সামন্ত। প্রাণোচ্ছলতা ও গতির কাছে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সেদিন হার হয়েছিল। খেলার শেষের সেদিনের মাঠের চেহারা স্মৃতিতে এলে আনন্দের শিহরণ জাগে। তার পরেই মিউনিসিপ্যালের খেলা খুলে গেল। শহরে অপর নামী ক্লাব রাসবিহারী মেমোরিয়াল কোনক্রমে ড্র করে মান বাঁচাল। বয়েজ এথেলেটিক্সের কাছে দু-পয়েন্ট হারিয়ে মিউনিসিপ্যালকে লীগের দৌড়ে পিছিয়ে যেতে হলো।

স্কুলের ছেলেদের জন্য আলাদা প্রতিযোগিতার অনুভব করেছিলেন মিশনারী Mr. C. B. Clarke. তাঁর দেওয়া Clarke's Cup বয়েজ কাপ নামে খ্যাত। পরে এই কাপটি পাঁচ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ছেলেদের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়। শহরের বিশিষ্ট মেডিক্যাল অফিসার সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী তাঁর মায়ের নামে সাড়ে ৪ ফুটের মধ্যে ছেলেদের জন্যে সুখদাসুন্দরী কাপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। মিউনিসিপ্যালের শ্রীবিরজাপতি ভট্টাচার্য্য ও শ্রীবিনোদীমাধব সামন্ত বহুদিন এই দুই কাপের হীরো ছিলেন। শহরে ও আশেপাশের স্কুলের বড়দের জন্যে নক-আউট প্রতিযোগিতা ছিল রাজা শিল্ড। একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় ছিলেন প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায়। তাঁর ভাই গুরুদাস অকালে মারা যান। তাঁর স্মৃতিতে গুরুদাস মেমোরিয়াল কাপ খেলানোর ব্যবস্থা হয়। ছোটদের বিভাগে মিউনিসিপ্যালের ছেলে শুকদেবের বিশেষ দক্ষতা ছিল। দুর্ঘটনায় পড়ে তিনি মারা যান। এসোসিয়েশনের তৎকালীন সম্পাদক শ্রীসুবোধকুমার পাঁজার উদ্যোগে তাঁর স্মৃতিতে শুকদেব লীগ কাপ খেলার প্রবর্তন। ধীরে ধীরে স্কুলের ছেলেদের খেলার ক্ষেত্র এইভাবে বিস্তারিত হয়েছে।

মিউনিসিপ্যালের মাঠে তখন ছেলের ভীড়। আর একজন ক্রীড়া-শিক্ষকের প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হলো। তারই তাগিদে ১৯৩৫এর গোড়ার দিকে এই স্কুলের ছাত্র, বুকাননে শিক্ষণ-প্রাপ্ত শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। তিনি উচ্চ লম্ফনে দক্ষ ও বিশিষ্ট সাঁতারু ছিলেন। তিন মাস কাজ করার পর তিনি সরকারী চাকরি নিয়ে চলে গেলেন।

তিনি পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া-পর্ষদের সম্পাদক হয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় সদ্য শারীর শিক্ষা-শিক্ষণপ্রাপ্ত মধুরানাথ ঘোষ সহকারী ও ক্রীড়া-শিক্ষক হয়ে আসেন ১৫, ৭, ৩৫ তারিখে ৫০ টাকা বেতনে। তিনি বহুভাবে এই বিদ্যালয়টির সেবা করে গেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সুধাংশুবাবু তাঁর সামরিক বিভাগে কাজের অভিজ্ঞতার সুবাদে বড় চাকরী পেয়ে স্কুল ছেড়ে গেলেন। তাঁর হাতে মিউনিসিপ্যাল থেকে অনেক ভাল ভাল খেলোয়াড় ও এথেলীট বেরিয়ে ছিলেন, শ্রী আনন্দ কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের পুরোভাগে। তিনি পোলভল্টে সর্বভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ শ্রীবিনোদীমাধব সামন্ত এই সুধাংশুবাবু (পি. আই.)-র ছাত্র। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট এই তিনটি বড় খেলাতেই বিনোদীবাবু

বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বনবিহারী একাদশের হয়ে আই. এফ. এ. শীল্ডে খেলেছেন। কলকাতার কালীঘাট ক্লাবের হয়ে খেলেছেন; কলকাতার মাঠে নিয়মিত ক্রিকেট খেলেছেন, এস. কে. গিরিধারীর মত নামী কোচের তারিফ কুড়িয়েছেন। শ্রীব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীফেলু মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগুরুপদ সাহা, শ্রীশিশির চক্রবর্তী, বিনয় চৌধুরী, বারীন চৌধুরী, দিনেশচন্দ্র সাহা প্রভৃতি সুধাংশুবাবুর ছাত্র ক্রীড়াজগতে যশস্বী হয়েছেন। সাইকেল চালনায় এই স্কুলের ছেলেরা বরাবরই দক্ষতা দেখিয়েছে। আদিতে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, পরে দুলো রায় এবং শ্রীশম্ভুনাথ নাথ এই ঐতিহ্যের ধারক। এঁরা সকলেই কলকাতার মাঠে সাইকেল চালিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। শ্রীরণজিৎ সিংহও দক্ষ চালক ছিলেন। দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় এবং মঙ্গলদাস চট্টোপাধ্যায় দৌড়বীর। কালীয়দমন ঘোষ ক্রীড়া-শিক্ষক হয়ে আসেন ২৫.৪.৪৩-এ এবং স্থায়ী হন ১৩, ১২, ৪৩ তারিখে। তিনি মিউনিসিপ্যাল স্কুলে বেশি দিন থাকেন নি। তারপর শ্রীতারাকুমার মিশ্র সহকারী ও ক্রীড়া শিক্ষক হলেন ১৯৪৬-এর প্রথমেই। ক্রীড়া-শিক্ষক মধুরানাথ ঘোষ ২৪.১০.৪৬ তারিখে পদত্যাগ করেন। তাঁর আমলে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছেলেরা খেলাধূলার নানা বিভাগে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ছেলেরা শুধু মাঝে নয়, জিমনাসিয়ামে, ব্যায়াম প্রদর্শনী ও দেহ-শ্রী প্রতিযোগিতায় নিজেদের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। সারা বাংলার বিশিষ্ট ব্যায়ামবীর শ্রীকৃষ্ণকালী বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পথিকৃৎ। তিনি বিষ্ণু ঘোষের সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, বর্তমানে কলকাতার হিন্দী হাই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আছেন। শ্রীজগদীশ মিত্র (কবি) সুদেহী ব্যায়ামবীর হিসাবে বিদ্যালয় শ্রী প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্রীমিত্র বিশিষ্ট এথেলীট, বর্শা, নিক্ষেপে বহুবার রাজ্য প্রতিযোগিতায় গেছেন, ফুটবল, ক্রিকেট, হকিও ভাল খেলতেন। হরেরাম পাঁজা, দ্বিজপ্রসাদ দে, সুনীল মুখোপাধ্যায়, প্রণয় মিত্র, আকবর আলি, শিবশঙ্কর হাজরা, নির্মল মুখোপাধ্যায় (পাঁচু), কমলেশ রায় (টেগো), অবন্তী দে, গোপাল গুপ্ত, উমাশঙ্কর দাঁ (মান্না), দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (মুক্তো), রাখহরি চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি কৃতী খেলোয়াড়। শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য ফুটবল, হকি, ক্রিকেট তিনটি বড় খেলাতেই স্কুল টিমে নিয়মিত খেলতেন।

শ্রীবিনোদীমাধব সামন্ত মিউনিসিপ্যালে স্থায়ী ক্রীড়া শিক্ষক নিযুক্ত হন ১৫.৪.৪৮ তারিখে। তিনি স্কুলের হয়ে কত খেলেছেন, এবার খেলাবার ভার নিলেন। সুচাঁদবাবু, মথুরাবাবুর উত্তরাধিকার বিনোদীবাবুর ওপর বর্তালো। এঁরা সকলেই দিকপাল খেলোয়াড়, মাঠে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতেন না, নিজেরাও ছেলেদের সঙ্গে খেলতেন। ৩৩ বছর পর তিনি ১৯৮১ তে অবসর গ্রহণ করেন। বিনোদীবাবুর আমল নানা কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। এই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথেলীট হলেন শ্রী কুমার দে। দূর বা নিকট যে কোন পাল্লার দৌড়ে সূর্য নামলেই প্রথম হবেন। দৈর্ঘ্য লম্ফন, হপ্‌স্টেপ্‌ লম্ফনেও তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। কলকাতার রাজ্য আন্তর্বিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় ৪০০ মিঃ দৌড়ে প্রথম হয়েছিলেন। মধ্যমদের বিভাগে কৃতিত্ব দেখিছেন শ্রীগৌরহরি চন্দ্র; তখন রিলের টিম ছিল দুর্ধর্ষ—সূর্য সেন, নাজমল আর হীরক রায়। সূর্য দে ফুটবলও ভাল খেলতেন রাইট আউটে। সাঁতারে যাঁরা দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সূর্য দে, অলিউল, কার্তিক ঘোষ, অসিত মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, যদুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীপঙ্কজ ঘোষ হপস্টেপ লম্ফনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্রীসূর্য দের পর সত্যিকার স্পোর্টস্‌ম্যান হলেন শ্রীসত্যনারায়ণ রায়; বিদ্যালয়ের সেরা ছেলেদের একজন বলে তাকে চিহ্নিত করতে পারা যায়। উচ্চ লম্ফনে এবং নিকট পাল্লার দৌড়ে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব, ফুটবল খেলাতেও দক্ষ। দূরপাল্লার দৌড়ে বীর হলেন শ্রীজর্নাদন সরকার ও শ্রীশান্তি বাগ। শ্রীবরুণ পাল একজন চৌকস্‌ খেলোয়াড় ও অ্যাথেলীট। বর্ধমান জেলা বিদ্যালয় দল সেবার উত্তর কলকাতাকে হারিয়ে দিয়ে জুবিলী কাপ বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে, সেই দলে মিউনিসিপ্যালের ছ'টি ছেলে স্থান পেয়েছিলেন। ফাইনালে খেলেছিলেন চারজন—তুষার ঘোষ, সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্ত বিশ্বাস ও সুধীর বিশ্বাস। বড় বড় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে সে খেলার বিস্তারিত বিবরণ বেরিয়েছিল এমন কী স্টেটস্‌মানেও। খেলার প্রথমেই চকিতে কড়া সটে গোল করেন তুষার ঘোষ। In a trice he put the ball into the net (The Statesman) সুধীর বিশ্বাসের খেলা বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। He can well claim the standard of a good second division side. (The Statesman) একটি বিদ্যালয় পর্যায়ের খেলার এমন বিববণ প্রকাশ নিশ্চয়ই গৌরবের।

১৯৬১-তে মিউনিসিপ্যাল জেলা আন্তবিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় সে দলের অধিনায়ক শ্রীবরুণ

পাল। দলে ছিলেন — অশোক বটব্যাল, অপরেশ মিত্র, অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য রায়, তরুণ পাল, দিলীপ সিংহ। ১৯৬২ B. D. A. A. পরিচালিত লীগ বিজয়ী মিউনিসিপ্যাল স্কুল দল ঃ ১. বরুণ পাল (অধিনায়ক), ২. জয়ন্ত সিংহ ৩. দীপঙ্কর কোনার, ৪. কাজল রায়, ৫. দিলীপ সিংহ, ৬. স্বপন সামন্ত, ৭. তপন ঘোষ প্রভৃতি; ১৯৬২-তে কলকাতায় রাজ্য প্রতিযোগিতায় তিনটি ছেলেকে পাঠানো হয়েছিল, কেউ-ই খালি হাতে ফেরেন নাই। বরুণ পাল বর্শা নিক্ষেপে তৃতীয়, শান্তি বাগ ১৫০০ মিঃ দৌড় তৃতীয় এবং সত্য রায় উচ্চ লম্ফনে দ্বিতীয়। ফুটবল দলে যাঁরা খেলেছেন—পঙ্কজ ঘোষ, রঞ্জন শীল, আব্দুর রশীদ, দোদুল রায়, জামালুদ্দীন আকবর, রাসবিহারী মিত্র, প্রণয় মিত্র, সূর্য দে, সুজিত মুখোপাধ্যায়, বরুণ চৌধুরী (১), সলিল সেন, অমিয় মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জীব চৌধুরী, প্রশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, মতিয়ার রহমান, আমীর আলি, মনোরঞ্জন ঘোষ, অমলেন্দু রায়, বরুণ চৌধুরী (২), নিহারেন্দু রায়, বরুণ পাল, অমিত মিত্র, তপন ঘোষ, সৌরেন রায়, কমল মুখোপাধ্যায়, তপন বীর, অলক ভট্টাচার্য, জনার্দন সরকার, সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস সিংহ, জাহাঙ্গীর আকবর, দীপক ঘোষ, মৃণাল সামন্ত, হসিবুল হোসেন, সুজিত চৌধুরী, অমলেশ ঘোষ, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক সামন্ত, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব মিত্র, শুকদেব মিশ্র, শেখর মজুমদার, রুদ্রাণী মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র বিশ্বাস।

অভিজিৎ কুণ্ডু, দেবাশিস দাস, মিলন দাস, গৌতম দে, কৌশিক মজুমদার, সুব্রত ঘোষ, অর্ঘ্য তরফদার, তুষার দে, সুশোভন তা, জয়ন্ত মৈত্র— ১৯৭৩তে সুখদাসুন্দরী কাপ বিজয়ী দলে ছিলেন। ১৯৫৪তে বড়দের বিজয়ী দলে ছিলেন—নিমাই ঘোষ (গোল), শেখরেন্দু মজুমদার, বারীন চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আকবর, গৌর পাল, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ কানুনগো, সুধীর বিশ্বাস, তারক চট্টোপাধ্যায়, নিহারেন্দু চৌধুরী, মনোরঞ্জন সিংহ, বিমলেন্দু নাগরায়।

ছোটদের বিজয়ী দলে — হরিপদ বসু, হিমাংশু দাঁ, জ্যোৎস্না দে, বলাই চৌধুরী, বিকাশ সামন্ত, অনিল সামন্ত, অপরেশ মিত্র, অর্পন মৈত্র, মনোজ রায়চৌধুরী, সৌরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অনন্ত ভট্টাচার্য, মহাদেব বর্মন, সত্য মণ্ডল, শুকদেব মুখোপাধ্যায়।

শ্যামল সরকার, শ্যামসুন্দর পাল, অরূপ গণ, আশিস গণ, সুবীর চক্রবর্তী, আশিস দাশগুপ্ত, শেখর সরকার, উদয় রায়, শ্যামল রায়, ভাস্কর সামন্ত, শরৎ মেহতা, কুশল চট্টোপাধ্যায়, সাগর দাস, জিয়ামুল ইসলাম নিয়মিত ফুটবল দলে ৭৩-৭৪ তে খেলেছেন। তন্ময় দত্তরায় বিদ্যালয়ের একজন কৃতী ফুটবল খেলোয়াড়। পরবর্তীকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দলকে নেতৃত্ব দান করেছেন। শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (বোকন) এর ফুটবল খেলায় প্রতিভার ছাপ ছিল। অনুপ দত্তরায় কৃতি ফুটবল খেলোয়াড় ও স্পোর্টসম্যান, ভাল খেলার সুবাদে ভাল চাকরী পেয়েছেন। সব্যসাচী চৌধুরী একজন বিখ্যাত দৌড়বীর। মৃণাল ঘোষ আন্তর্বিদ্যালয় ভলিবলে খেলেছেন। আন্তঃ রাজ্য বিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় কটকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেছেন অমলেশ ঘোষ ও দেবাশিস কোনার। নাগপুরে আন্তঃ রাজ্য বাস্কেট বল খেলায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সব্যসাচী মজুমদার। সুকুমার দাস ও গঙ্গাপদ বাগ জেলা দলে খেলেছেন। বর্ধমান জেলা ব্যায়াম ও দেহ-সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় জয়ন্ত মণ্ডল উভয় বিভাগে ১৯৮০-তে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। দেবাশিস কোনার মস্কো অলিম্পিক দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া পরিষদ এই ব্যবস্থা করেছিলেন। বিনোদীবাবুর ছাত্ররা নানাভাবে খেলাধূলায় মিউনিসিপ্যালের যশ বিস্তার করেছেন। আই. এ. শীল্ড বিজয়ী বি. এন. আর দলের ও সন্তোষ ট্রফীতে পশ্চিমবঙ্গ দলের অধিনায়ক বিমান মিত্র (মঙ্গলা) একটি খেলার কাগজের প্রতিবেদনে বলেছিলেন, আমার মধ্যে ফুটবল প্রতিভার প্রথম সন্ধান পান আমার শিক্ষক বিনোদীমাধব সামন্ত। সৌরেন রায় ও কমল মুখোপাধ্যায় কলকাতার এরিয়ান্স ও রাজস্থান দলে খেলেছেন। বরুণ পাল, অশোক বটব্যাল, অপরেশ মিত্র, শান্তি বাগ ভবানীপুর ক্লাবে হকি খেলতেন।

বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীসজল বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রীড়া শিক্ষক। বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য বজায় রাখতে তাঁরা বিশেষ যত্নবান।

(হে অতীত কও ৫৬ পাতা থেকে আসবে)

শ্রী অরিন্দম বটব্যাল .....অন্তরায়—একথা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। — প্রকাশক।

বয়স্ক বিদ্যালয়ের কথা

শ্রীগদাধর রক্ষিত

বয়স্ক নৈশ উচ্চবিদ্যালয় এই বিদ্যালয়ের এক গৌরবময় সংযোজন। সাধারণ ছাত্র-সমাজে যারা অপাঙ্‌ক্তেয় দরিদ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাদের অর্থাজনে নিযুক্ত হতে হয় তাদের শিক্ষার পথ ছিল রুদ্ধ; সেই সমস্ত পাঠানুরাগী ছাত্রদের পড়বার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ১৯৬৬ সালের ২১শে জানুয়ারি এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নিয়মানুযায়ী মূল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য হতে একজন প্রধান শিক্ষক সমেত পাঁচজন শিক্ষক এই ইউনিটটি পরিচালনা করেন। বিদ্যালয়টি অবৈতনিক। সরকার এর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। প্রধান শিক্ষকের পারিশ্রমিক ১০০ (একশত) টাকা, অন্যান্য সাম্মানিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উপাধি-ধারী শিক্ষকগণ মাসিক ৭৫ টাকা ও সাধারণ স্নাতক ৫০ টাকা এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় ৫০ টাকা। এই হিসাবে বিদ্যালয়টির মাসিক ব্যয় ৪৪৫টাকা। রাধিকামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। অন্যান্য শিক্ষকগণ হলেন গদাধর রক্ষিত, সজনীকান্ত দে, রামহরি চট্টোপাধ্যায় ও জগজ্জ্যোতি মিত্র; শিবনাথ ঝা শিক্ষাকর্মী নিযুক্ত হন এবং মোহিনীমোহন রায় করণিকের কাজ দেখাশোনা করেন। করণিকের সংস্থান না থাকায় আনুষঙ্গিক ব্যয় থেকে তাঁকে মাসিক ২০ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হত। অতঃপর তিনটি যোজনা পার হতে চলল, পারিশ্রমিকের হার কিন্তু অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

রাধিকামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণের ফলে সহকারী প্রধান শিক্ষক বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর অবসর গ্রহণের পর গদাধর রক্ষিত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সজনীবাবুর অবসর গ্রহণের পর পাঁচুগোপাল রায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়বাবুর অবসর গ্রহণের পর দীনেশ চর্তুবেদী এবং কিছুদনি পর পাঁচুবাবু পদত্যাগ করলে তাঁর স্থলে আসেন সত্যনারায়ণ দে। পরে রামহরিবাবু পদত্যাগ করলে তাঁর স্থলে আসেন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দুর্ভাগ্যবশতঃ রবিবাবু অকালে অকস্মাৎ পরলোক গমন করায় ঐ পদটি শূন্য হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত ঐ পদটি শূন্যই রয়েছে। এর কারণ স্বরূপ কর্তৃপক্ষের নিয়োগ নীতিকে দায়ী করা যায়। মূল বিদ্যালয়ের কোন অভিজ্ঞ শিক্ষক এই স্বল্প পারিশ্রমিকের কাজ করতে অনিচ্ছুক অথচ বাইরের লোক নেওয়াও যায় না।

এই বিদ্যালয়ে ৭ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। এদের কোনও পৃথক পাঠ্যসূচী নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত পুস্তকই এদের পাঠ্য। শিক্ষা শেষে এরা বিদ্যালয়ের কোনও স্বীকৃতিপত্রে পায় না কিংবা পেলেও তা তাদের কর্মক্ষেত্রের কোথাও স্বীকৃতি পায় না। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে তারা বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসাবে বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় এবং অনেকেই কৃতকার্য হয়। আজ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাধিক ছাত্র এইভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছে। শিক্ষক নিয়োগ নীতির যদি পরিবর্তন না ঘটে বিদ্যালয়ের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা সমাপন সার্টিফিকেট যদি কার্যকরী না হয়, কর্মক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করে। যদি ছাত্রদের নির্বাচনী পরীক্ষায় অন্যত্র বসতে হয় তা হলে ছাত্রদের প্রত্যাশা পূরণ হবে না এবং এদের ভাগ্য যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকবে। আনন্দের কথা বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় প্রধান শিক্ষক প্রদত্ত কৃতিত্বের অভিজ্ঞান পত্রকে বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল গণ্য করবার কথা সরকার বিবেচনা করছেন।

বর্তমানে দেশে সার্থক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যে সকল নাগরিক বয়স বদলে শিক্ষার সুযোগ সুবিধে তেমন

পাননি তাঁদের বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। সেদিক দিয়ে এই বয়স্ক বিদ্যালয়গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার বিস্তার যত ঘটবে ততই দেশে শুভ রাষ্ট্র স্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বিশেষ করে শিক্ষার আগ্রহ যার মনের মধ্যে আছে তাকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। নিজেদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি যে যাঁরা সারাদিন রুজি রোজগারের জন্য খেটে-খুটে সন্ধ্যায় এই বিদ্যায়তনে এসে উপস্থিত হন তাঁদের মধ্যে শিক্ষা লাভের একটি অদম্য উৎসাহ প্রকাশ পায়। দেশের সরকারের তাঁদের ওপর সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে নিয়মিতভাবে তাঁদের পঠনপাঠন চলতে পারে লোডশেডিং যখন নিত্য ঘটনা তখন বিকল্প আলোর ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিক্ষক সংখ্যা এবং শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিও নিতান্ত প্রয়োজন।

(সংযোজন ঃ বিদ্যালয়ের এই শাখাটি পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যায়। এক সময়ে এই বিদ্যালয়ে B. Ed. এবং Para Medical Courseও পড়ানো হতো। বিদ্যালয়ের এই শাখাগুলিতে অধ্যয়ন করে পরবর্তীকালে ছাত্ররা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বর্ধমানের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে এই বিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের ছাত্রদের জানা প্রয়োজন। যে শিক্ষাব্রতীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও ত্যাগের ফলে আজকে এই বিদ্যালয় গৌরবের শিখরে আরোহণ করেছে সেই শিক্ষাব্রতীদের কথা স্মরণ করেই এই রচনাটির পুনর্মুদ্রন করা হলো।—প্রকাশক)

জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী (এন. সি. সি.)

শ্রীজগজ্জোতি মিত্র

বিদ্যালয়ের শতবর্ষ জীবনে বহু ঘটনা ঘটেছে, তার হিসাব শতবর্ষ পরে কতটুকুই বা সংগ্রহ করা যায়। কত শিক্ষক এসেছেন কত শিক্ষক কর্মান্তে অবসর গ্রহণ করেছেন আর কত শিক্ষকই বা কর্ম-কালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তার সমগ্র ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। কত কত ছাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষান্তে সমাজ জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর কত ছাত্রই বা জীবনে অসফল হয়েছে তার সমগ্র সংবাদ সংগ্রহ করা অসম্ভব। বিদ্যালয়ের চলার জীবনে যে সকল ঘটনা স্থায়ী হয়েছে তাদের সংবাদ আমরা অনেকেই কিছু কিছু জানি— এমনই একটি ঘটনা বিদ্যালয়ে সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর সূচনা।

দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চলাকালে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর কমিটি গঠিত হয়। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু চেয়ারম্যান এবং ব্রিগেডিয়ার এল. পি. সেন সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে কমিটি তার প্রতিবেদন দাখিল করেন। ১৯৪৮ সালে এন. সি. সি. অ্যাক্ট পাস হয়। এই আইন রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — To Develop leadership, Character, Comradeship and the ideal of service and to stimulate interest in the defence of the country to the widest possible extent.

জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর জুনিয়র ডিভিসন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। আমাদের বিদ্যালয় ১৯৪৮ সালের প্রথম দলে অফিসার ট্রেনিং নেবার সুযোগ পায়। বর্ধমান জেলা হতে মোট চারজন নির্বাচিত হন। তন্মধ্যে আমাদের বিদ্যালয় হতে বিনোদীমাধব সামন্ত ও আমি এবং রাজ স্কুল হতে অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫/৮ গুর্খা রাইফেলস্ আলিপুরে আমাদের প্রি. কমিশন ট্রেনিং হয় — জুন ও জুলাই দুই মাস। ট্রেনিং শেষে বিদ্যালয়ে দুটি Troop খোলা হয়। ঐ Troop এর নাম হয় 31st & 32nd West Bengal Junior Troop N. C. C. শিক্ষার্থী, সংখ্যা হয় ৩০ প্রতি Troop-এ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে Capt Kartar Singh, Liaision Officer Junior Division N. C. C. West Bengal পরিচালনা করেন।

এই সময় ট্রুপ কম্যাণ্ডারদের মাসিক ভাতা ছিল সাড়ে সাত টাকা। বৎসরে মাত্র নয় মাস পাওয়া যেত। ক্যাডেটরা বৎসরে নয় মাসে টিফিন ও ওয়াশিং-এর জন্য পঁয়তাল্লিশ টাকা পেত। সরকারের তরফ থেকে পোষাক দেওয়া হয়,

সুতরাং সদ্য স্বাধীন জাতির ছাত্র-সমাজে এন. সি. সি. বিশেষ প্রিয় হয়। বৎসরে একবার বার্ষিক শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হত এবং এক বৎসরে ট্রেনিং প্রাপ্ত ক্যাডেটরা যোগদান করতে পারত। বার্ষিক শিবিরে প্রথম যুগে সকল প্রকার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হত। আমাদের কার্যকালের প্রথম দিকে প্রতি বৎসর বার্ষিক শিবিরে আমাদের ক্যাডেটদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৯/৫০ সালে দুবার বোলপুরে বার্ষিক শিবির হয় তৎপরে কলকাতায় তৃতীয় বার্ষিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সাল থেকে এন. সি. সি. সংগঠনে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। Liasion Officer-এর পদ লোপ হয় এবং Junior Division N. C. C. কয়টি Battalion-এ ভাগ হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশের মালদহ জেলা থেকে বাঁকুড়া জেলা পর্যন্ত সব কয়টি জেলার Jr. Div. N. C. C. 4th Bengal BN. N. C. C. অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৩ হতে বার্ষিক শিবিরগুলি সম্পূর্ণ সামরিক রীতিতে শহর থেকে দূরে Tent দ্বারা গঠিত উপনগরীতে অনুষ্ঠিত হত। এই সময় ক্যাডেটদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় অনেক সময় স্পেশাল ট্রেনে ক্যাম্প যাতায়াত করা হত।

১৯৫২ সালে অনিলবাবু রাজ স্কুল থেকে আমাদের স্কুলে চলে আসায় আমাদের স্কুলে তিনটি Troop হয়। Troop গুলির পুনরায় নতুন নামকরণ হয় যথা 89th, 90th, 91st, West Bengal Jr. Troop N. C. C. এই সময় থেকে অফিসারদের মাসিক ভাতা সাঁইত্রিশ টাকা হয়। অফিসারদের ট্রেনিং-এর পরে Rank হয় Third Officer, তিন বৎসর পর Second Officer ছয় বৎসর পর First Officer হয়, তবে তাদের সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট থাকতে হবে। বিনোদীবাবু ১৯৬০ সালে District N. V. F. -এর Part Commandant পদ গ্রহণ করায় N. C. C. হতে পদত্যাগ করেন এবং ১৯৬৩ সালে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রেনিং নিয়ে ঐ ট্রুপের ভার গ্রহণ করেন। অনিলবাবু ও আমি Chief Officer-এর পদে প্রায় বার বৎসর কাজ করে ১৯৭৫ সালে অবসর গ্রহণ করি, ফলে বিদ্যালয়ে দুটি ট্রুপ উঠে যায়। ১৯৬২ সালে চীন আক্রমণের আগে প্রতি বৎসর বার্ষিক শিবির হত যেমন ঃ '৫২, '৫৩ রামগড়ে '৫৪ বার্ণপুরে, '৫৫ ঝাড়গ্রামে, '৫৬ ব্যারাকপুরে, '৫৭ আদরায়, '৫৮ চিত্তরঞ্জনে, '৫৯ খড়গপুরের নিকট সালুয়ায়, '৬০ কোন ক্যাম্প হয়নি। চীন আক্রমণের ফলে সরকারের তরফে ব্যয় সংক্ষেপ করা হয় এবং এরপর সব বৎসর বার্ষিক শিবির হয়নি। '৬৩ বর্ধমানে, '৬৬ ইটাচুনা, '৬৭ গলসী, '৭২ নলহাটী, '৭৪, '৭৫, '৭৬ পানাগড়, '৭৯ পুরুলিয়া, '৮০, '৮১ পানাগড়ে বার্ষিক শিবির হয়।

১৯৬২ সালের পর থেকে সকল ক্যাডেট বার্ষিক শিবিরে যোগদানের সুযোগ পেত নামমাত্র, শতকরা ৭/৮ জন যোগ দিতে পারত। এই সময় হতে প্রত্যেক ট্রুপের ক্যাডেট সংখ্যা একশ হয়ে যায়। প্রতিটি ট্রুপের পেপার ওয়ার্ক ও পরিশ্রম অনেক বেড়ে যাওয়ায় অফিসারদের ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব উঠে; কিন্তু '৬৫ সাল পাক ভারত যুদ্ধ হওয়ায় '৬৭ সালের আগে মাসিক ভাতা পঞ্চাশ টাকা হয় না। '৭২ সাল হতে অফিসারদের ভাতা ন'মাসের স্থলে বার মাস দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

আমাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন ক্যাডেট বিভিন্ন শিবিরে সাফল্য লাভ করে আমাদের বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

১৯৫১ সালে কলকাতা শিবিরে Troop sgt সুপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, '৫৩ সালে রামগড় শিবিরে Troop sgt প্রবীর কুমার সেনগুপ্ত Best Troop sgt নির্বাচিত হন; ৫৩ সালে যে Special Camp দার্জিলিং রাজভবনে হয়েছিল তাতে অলোককুমার চট্টোপাধ্যায় Best Cadet এবং অসিত কুমার মুখোপাধ্যায় Best quater guard নির্বাচিত হন। দার্জিলিং ক্যাম্প রাজভবনে হওয়ায় আমাদের স্কুলের আমার ৯০ নং Troop যোগদানের অনুমতি পায়। এই শিবিরে আমরা সকলে বাংলার মহান শিক্ষাব্রতী রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেছি। ১৯৬৬ সালে নিমাইলাল তরফদার এবং ১৯৬৭ সালে সুশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সমগ্র পশ্চিম এন. সি. সি. হতে নির্বাচিত হয়ে দিল্লী প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ যোগদান করে বিদ্যালয়ের সুনাম রাজধানীতে পৌঁছে দেয়। ১৯৭২ সালের আমাদের Troop sgt তুষাররেন্দু মুখোপাদ্যায় Advance leadership camp এ যোগদানের আহ্বান পায় এবং '৮০ সালে শিবশঙ্কর দাস, ৮২ সালে Troop sgt দেবতোষ মুখোপাধ্যায়, '৮৩ সালে বিকাশ নন্দী উক্ত Camp-এ যোগদান করে। '৮২ সালে শ্রীচন্দন ঘোষ এন. সি. সি. পরিচালিত দেরাদুন হতে যমুনোত্রী Trekking অংশ গ্রহণ করে বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছে। শ্রীসুকুমার দাস ক্যাম্প যোগদান করে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। অধুনা আমাদের এন. সি. সি. দেশের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করেছে; যেমন রেল দফ্তরের আহ্বানে Special checking যাচ্ছে ও শহরের বিভিন্ন সেবা কাজে অংশগ্রহণ

করছে।

এন. সি. সি. সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না তাহল এন. সি. সি. জাতীয় প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। দেশ স্বাধীন হবার পর সাধারণ্যে যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল তা আর দেখা যায় না। কারণ হয়ত অনেক আছে তবে আমি যা বিশেষভাবে অনুভব করেছি তা হল এন. সি. সি. অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত যাঁরা প্রয়োজনীয় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন না।

—বিদ্যালয় স্কাউট—

ভারতবর্ষে স্কাউট এর সূচনা ১৯১০ সালে। স্কাউট এর প্রথম যুগে প্রধানত রাজধানী শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্ধমান শহরে প্রথম আমাদের বিদ্যালয়ে স্কাউট শুরু হয় Scout Master সুচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে। প্রথম শিক্ষা শিবির হয়েছিল ১৯২৭ সালে মধুপুরে। '২৮ সালের ২৬ শে মে Scouts Day পালিত হয় টাউনহলে, সভাপতিত্ব করেন জেলা শাসক মিঃ ম্যাক্‌ফারশন (Macferson)। সুচাঁদবাবু (বর্ধমানবাসীর কাছে ফুজো মাস্টার নামে পরিচিত) '২৮ সালের শেষ দিকে তিনি টাউন স্কুলে চলে গেলে অরুণ চক্রবর্তী মহাশয় ভার গ্রহণ করেন। অরুণবাবু বেশি দিন বিদ্যালয়ে ছিলেন না। ১৯৩১ সালের মধ্যভাগে সুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য (যাঁকে সবাই P.I. বলত) মহাশয় Games Teacher and Scouts master হিসাবে যোগদান করেন। সুধাংশু বাবুর আমলে বিদ্যালয় স্কাউট বিভিন্ন শিবিরে যোগদান করায় মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে। কাঞ্চননগরের পথে ১৯৩৫ সালের বন্যায় সেবামূলক কাজের সুখ্যাতি লাভ ঘটে। ফকিরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় (ফকিরবাবু) কিছুদিন Scouts master-এর দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৪২ সালে যুদ্ধের সময় সুধাংশুবাবু বিদ্যালয়ের চাকুরী ত্যাগ করে যুদ্ধের সহায়ক কর্মে যোগদান করায় বিদ্যালয়ের Scout উঠে যায়।

দীর্ঘদিন Scouts বিদ্যালয়ে ছিল না পুনরায় ১৯৭৪ সালে দীনেশচন্দ্র চতুর্ব্বেদী ও নগেন্দ্রনাথ রায় Scouts master Training নিয়ে Scouts Training শুরু করেন। ১৯৭৫ N. C. C.-র দুটি Troop উঠে যাওয়ায় Scouts Training জোড়দার হয়। দিনেশবাবু জেলা Scounts master এর পদ লাভ করায় আমাদের Scouts জেলার মধ্যে সুনামের অধিকারী হয়। ১৯৭৯ সালে মাদ্রাজে 8th All India Jamboree-তে নগেনবাবু ও দিনেশবাবু Scoutsদের নিয়ে যান এবং সেখানে Common Wealth ভুক্ত দেশের Scounts-রা যোগদান করে।

এই Jamboree-তে পশ্চিমবঙ্গের Scounts masterদের মধ্যে মাত্র চার জন Sub-Camp-Chief পদ মর্যাদা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আমাদের দিনেশবাবু ছিলেন, এতে আমরা গর্বিত। বর্তমানে Cub master হিসেবে ছোটদের জন্য প্রাইমারী শ্রেণী হতে শান্তানু সেনহাজরা Training নিয়েছেন।

আমাদের Scouts শহরের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে প্রশংসা অর্জন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ Scouts masterদের মধ্যে আমাদের দিনেশবাবু হিমালয়ের রূপকুণ্ড ও কোয়ারী পাশ Trekking-এ যান এবং প্রায় ষোল হাজার ফিট উপরে ওঠার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

বর্তমানে Scounts দের বার্ষিক শিবির বিশেষ হচ্ছে না এতে কিছুটা উৎসাহের অভাব দেখা যাচ্ছে।

মানালিতে নিখিল ভারত পর্বতোরোহন ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন দুজন এন. সি. সি. — তাদের নাম শ্রীচন্দন ঘটক ও শ্রীদেবতোষ মুখোপাধ্যায়। (সংযোজন ঃ বর্তমানে বিদ্যালয়ের Scout শাখাটি বন্ধ হয়ে আছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর শ্রী চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয় N.C.C.-এর দায়িত্বে আসেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের এই শাখাটি বিভিন্ন ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রী চিত্তরঞ্জন মহাশয়ের পর এই শাখাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন শ্রী চিন্ময় কুমার বিশ্বাস মহাশয়। আমরা আশা করব অতীতের মত ভবিষ্যতেও বিদ্যালয়ের এই শাখাটি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে।— প্রকাশক)

(লেখাদুটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি ও দিল্লীগমন

শক্তিপদ কার্ফা

২০০১ সালের আগস্ট মাস, হঠাৎ বর্ধমানের বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস থেকে ডাক পেলাম। জানতে পারলাম আমার নাম জাতীয় পুরস্কারের জন্য তাঁরা সরকারের কাছে পাঠাতে চান। বললেন আমার চাকুরী জীবনের ইতিবৃত্ত তাঁদের জানাতে হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে কিছু নথিপত্র জমা দিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি জানতাম না এই পুরস্কার পাওয়ার শর্তগুলো, কিছুটা অবাক হলাম। যে সব নথিগুলো সারাজীবন কোনো প্রয়োজনেই লাগল না চাকুরীর শেষ লগ্নে তা অমূল্য সম্পদরূপে প্রকাশ পেল। বাড়ীর বিভিন্ন স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা নথিগুলির প্রয়োজন আজ বিশেষভাবে অনুভব করলাম। যাইহোক তাঁদের নির্দেশমত সবকিছু জ্ঞাত করে এবং নথিপত্র জমা দিয়ে সাময়িক নিশ্চিন্ত হলাম।

অবশেষে ২৫ শে জুন দিল্লী থেকে চিঠি এল। দিল্লীর নিমন্ত্রণপত্রে লেখা আগামী ৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিতে হবে। পেয়ে খুশী হলাম। স্মৃতি রোমন্থন করতে বসলাম। মনে পড়ে গেল চাকুরী জীবনের প্রথম বিদ্যালয় বৈঁচী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কথা, যাঁর হাত ধরে শুরু হয়েছিল কর্মজীবনের হাতে খড়ি। শিক্ষকদের প্রতি তাঁর ছিল বিভিন্ন নির্দেশ, যেমন Training নাও, শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়াও। বোর্ডের পরীক্ষার খাতা দেখ, পঠনপাঠন ছাড়া বিদ্যালয়ের বাড়তি কাজ করে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর দেওয়া নির্দেশকেই পাথেয় করে চাকুরী জীবনের ইতি টানলাম। তাঁরই নির্দেশ মানার ফলই আজ এই পুরস্কার প্রাপ্তি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ না করে পারছি না ঐ বিদ্যালয়েরই আর একজন বিজ্ঞান শিক্ষক ১৯৯৭ সালে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন। তারপরেই মনে পড়ে গেল বর্তমান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দেওয়া শংসাপত্রের কথা যাতে লেখা ছিল 'আমার বিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষক এই পুরস্কারে ভূষিত হলে আমার চেয়ে কেউ বেশি খুশী হবেন না।' তাই মাননীয় প্রধান শিক্ষককে খুশী করতে পেরে আমিও খুশী হলাম।

দিন এগিয়ে এল, ১লা সেপ্টেম্বর, বর্ধমান স্টেশনে বেলা ১০টা ৪৮ মিনিটে গাড়ী ছাড়ল, সরকারের আর্থিক আনুকূল্য লাভ করায় III A/c কামরায় উঠে বসলাম। সবাই চুপচাপ, নিঃশব্দ কামরা। ট্রেন যাত্রার স্বাভাবিক যে আনন্দ এতদিন ভোগ করে এসেছি তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত বলে মনে করলাম। পরের দিন সকাল ৮-১০ মিনিটে নয়াদিল্লী স্টেশনে নেমে চিত্তরঞ্জন পার্কের কালীবাড়ীতে একদিন বিশ্রাম নিয়ে ৩ সেপ্টেম্বর সরকার নির্ধারিত অশোক রোডের ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলে গেলাম। হোটেলের ১৪ তলার ১৩১২ নং কক্ষে ঠাঁই পেলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের দেওয়া পরের দুদিনের কাজের নির্ঘন্ট দেখতে লাগলাম। জানা গেল ৪ঠা সেপ্টেম্বর বেলা ১১ টায় Rehearsal এবং পরে দুপুরে মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীর সাথে ভোজন। সরকারের ভাড়া করা গাড়ীতে সকল পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক বিজ্ঞান ভবনে পৌঁছালাম। পুরস্কার নেওয়ার Photo শুরু হল। ঘোষিকা সরলা মহেশ্বরীর কণ্ঠ ভেসে উঠল। একে একে নাম ডাকা হল, নকল রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসলাম। ঘোষিকা নাম ডাকার সময় নামের উচ্চারণের ত্রুটিগুলি সংশোধন করে নিলেন। তারপর খাওয়ার পালা। বিরাট ভোজনকক্ষে সকলে ইতঃস্তত দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় দেখা গেল কিছুটা দূরে একটা জটলা। কিছুক্ষণ পরে জানতে পারলাম মন্ত্রী মহোদয় কিছু খাবার মুখে দিয়ে চলে গেছেন। বড় খারাপ লাগল, যেন নিমন্ত্রণকর্তা পরিবেশনকারীদের খাবার দেওয়ার ভার দিয়ে বাড়ীর বাইরে চলে গেছেন। বিকালে কুতুবমিনার দেখে হোটেলে ফিরলাম।

পরের দিন ৫ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা ৩০ মিঃ এ আবার গাড়ী চেপে বিজ্ঞান ভবনে চলে গেলাম। ১০টা ১৫ মিনিটে শিক্ষা সচিবের ভাষণ দিয়ে সভা শুরু হল। পরে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর ভাষণ শেষে রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর পুরস্কার বিতরণ শুরু হল। Rehearsal এর দিন নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছিল - দয়া করে রাষ্ট্রপতির সাথে করমর্দন করবেন না, প্রণাম করবেন না, আলিঙ্গন করবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু মাননীয় রাষ্ট্রপতি স্বাভাবিক আবেগবশতঃ সমস্ত নিয়ম ভেঙ্গে করমর্দন করলেন, কারও সাথে হাসি বিনিময় করলেন, কারও সাথে দু-চারটে কথাও বললেন। পুরস্কার বিতরণ সভায় যেন দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক একাকার হয়ে গেল। সভাকক্ষে

উপস্থিত সকলেই খুব আনন্দ উপভোগ করলেন। মাননীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর পূর্বদিনের সকলের সান্নিধ্যের অভাব পুরস্কার বিতরণ সভায় সকল শিক্ষককে একে একে অভিবাদন জানিয়ে অনেকটাই পূরণ করে দিলেন। সভার শেষে ভোজনকক্ষে চা পান করে বিজ্ঞানমঞ্চের বাইরে সকলে চলে এলাম। গেটের বাইরে এসে দেখলাম পুরস্কার বিতরণের সকলের Photo ছড়াছড়ি। সকলেই Photo কেনায় ব্যস্ত হলেন। Photo কেনার মাঝে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষকদের মধ্যে বেশকিছু কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা ইত্যাদি চলল। যেন কিছুক্ষণের জন্য সকল রাজ্যের শিক্ষকদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সূচিত হল। পরের দিন হোটেল থেকে বেরিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে একদিন বিশ্রাম নিয়ে ৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ৭.৩০ মিনিটে কালকা মেলের II Class Sleeper এ উঠে বসলাম। আমরা পাশাপাশি সিটে সব কজনই বাঙালি ভদ্রলোক পেয়ে খুশী হলাম। ট্রেনে চাপার আনন্দ ফিরে পেলাম। A/c কোচ নয়, খোলা জানলা, মুক্ত বাতাস, স্বাভাবিক বাংলায় সকলের সঙ্গে কথাবার্তা - যেন ঘরে ফিরে এলাম। ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৫টায় গাড়ী বর্ধমান স্টেশনে এসে পৌঁছাল।

বাড়ী ফিরলাম; শুরু হল সেই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের জীবন। পুরস্কার জুটল বটে, কিন্তু স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত জীবন থেকে কয়েকটটা দিন যেন আলাদা মনে হতে লাগল। চলা বলায় যেন কিছুটা কৃত্রিমতা বোধ হল। পুরস্কার প্রাপ্তির পর দায়িত্ববোধটা যেন কাগজে কলমে কিছুটা বাড়িয়ে দিল। পুরস্কার প্রাপ্তিতে কিছু সম্বর্ধনাও পেলাম। এখন আমার কাজ পুরস্কারের মর্যাদা রক্ষা করা। তাই মঙ্গলময়ের কাছে কবির ভাষায় আমার এখন একটাই প্রার্থনা — ''তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শক্তি''।

(বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'কাকলি' থেকে রচনাটির পুনর্মুদ্রন করা হয়েছে।)

কুড়ি বছর পর

সঞ্জীব চক্রবর্তী

কুড়ি বছর পর আবার হাঁটলাম
কডির দিয়ে, স্টেজে —
কই, আর তো তেমন বড়, উঁচু লাগছে না!
মাঠটাও তেমন দিগন্ত ছোঁয়া নয়
সত্যজিৎ রায়ও এমনটাই ভেবেছিলেন
যখন অনেক লম্বা হয়ে একবার
তাঁর স্কুলে গিয়েছিলেন।
আমি সত্যজিৎ রায় নই, তবু
তেমনটাই মনে হল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে শিহরণ হল

আরে— এই তো এইখানে
টিফিনের সিঙাড়া হাত নামার সময়
সমীরদার চোখে চোখ পড়তে
সে ফিক্ করে হেসেছিল।
৩৬ নং ঘরে দুরন্ত ছেলে বিশ্বরূপ
লাফিয়ে বেড়াতো বেঞ্চে বেঞ্চে—
সে কোথায় কেমন আছে, কে জানে।
ওইখানে বোকা শুভেন্দু বেদম মার খেয়েছিল
মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে, যে মার
ফুল হয়ে ফুটেছিল তার অঙ্কের খাতায়—
ওই ঘরে কালীবাবু ডাকছে, 'গয় গবাক্ষ
নল নীল...' ছেলেদের অবাধ্য সত্ত্বাকে সম্বোধন করে।

ওইখানে আপন মহিমায়
পান্ডিত্য উজাড় করে চলেছেন
নির্বিকার কালী মিশ্র —
ছেলেদের চোখে মায়া অঞ্জন মাখিয়ে যাচ্ছেন
গৌরীবাবু, ইতিহাসকে ছবি করে তুলছেন
ভোলানাথবাবু,
প্রশ্রয়ের হাসি হাসছেন পাঁচুগোপাল রায়।
ওই বাঁশি বাজল, খেলোয়াড় নিয়ে
মাঠে নামছেন বিনোদীবাবু...

ছবি আসছে, ভাঙছে মিলে মিশে
ক্যালাইডোস্কাপে নতুন নকশা গড়ছে—
আজকের ক্লাসরুমে তারা ধরবে না—

কুড়ি বছর বাদে মনবরে বিষণ্ণতা নিয়ে
ফিরে যেতে আসি নি—
ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজছে,
কোন নতুন বিপিদার হাতে —
ওই লালসাদা পোশাক পরে
ছেলেরা আসছে, কোলাহল করে
ছুটে ক্লাসে ঢুকছে, বসছে...
আমার চোখের সামনে ক্লাস রুম
আবার আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে,
মায়া কাননে মিশে যাচ্ছে
মাঠের সবুজ সীমানা।

(বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন 'চিরন্তনী'র স্মরণিকা থেকে লেখাটির পুনর্মুদ্রন করা হয়েছে।)

Annus Mirabilis : A Reminiscence

Swapan Bondyopadhyay

So might we *talk of the old familiar face*
How Some they have died, and some they *have left me*
And *tome are taken from me; all are departed*
All, all are gone, the old familiar faces...

I stayed up late two consecutive nights trying to dig up the past; but in vain. There is 'superfoetation of dust', as Charles Lamb might love to call it, on my memory. Either I am not too old to reminisce or the past evades.

Mind you, dear reader, this purports not to be a historical document, but a narcissistic longing, lingering look behind. I was a sickly boy in spite of what I am now. I was stricken with small pox. I was in class IX then. This is 1961. As I brushed my fingers through the thick, black hair, flakes of dandruff came streaming down like snowflakes in simla on the new, burnish-smelling little desk in the first floor of the school. The first floor was also but new then. We were the proud owners of separate desks and chairs instead of the plebeian worn-out benches in which six of us were herded together in the lower classes. My spirits were in doldrums since I was in the 'arts' stream. To Radhakanta Banerjee, our headmaster, the word 'arts' was an anathema; he always preferred the impeccable and scholarly equivalent 'humanities'. Reading 'science' was a craze. Becoming an engineer was the only dream that could sustain both the 'pupil and his family. But I scored very poor marks in mathematics, a subject and a discipline which has shown no compassion unto me in any period of my life whether in the school or out of it. My father, however, decided to discuss the whole issue with the headmaster before consigning me to the arts for the rest of my life. That was my first-and perhaps only—opportunity to look at the awe-provoking, whitish, baldish man from close quarters. We would watch him from safe distance approaching his chamber in slow and measured strides. In fact, so slow were they that he was rumoured to have kept a mental count of each and every step he was taking. Proverbially punctual, he emerged out of the western-side gate opening then on the very lane adjacent to the cinema at a fixed hour be there shine or rain And after the school hours with equally measured steps he returned, and almost evaporated, into the second floor of a dark, dilapidated house in Tentultala bazar, known popularly as 'Tentultala mess' then. A bachelor, he lived the life of a saintly recluse. Even to the inmates of the 'mess' he was a man of glacial silence. To our adolescent imagination the second, floor of that mess' was wrapped in Coleridgian other worldliness. Never was he seen elbowing his way through

the bazaar crowd nor did he mix and mingle in the artificial atmosphere of a social gathering. He sincerely believed like Blake that 'great things are not done by jostling in the street'. During school hours he did regular vigils making the slightest noise in his measured, crepe-soled steps. Yes, often he stood silently like a stone relief outside the classroom evaluating, let us be frank, the students as also the teacher. And one missed a heartbeat—even the most adventurous ones, whenever one saw that whitish, slightly anaemic face hovering round the corner.

And now I was face to face with him in his chamber—quite a once-in-a-life time experience, to be sure. Father was sitting and I stood in a corner. He patiently listened to whatever my father had to offer as reason for my taking up 'science' stream. When my father was out of breath, he merely quipped : "But, such a sickly student—how can he become an engineer!" That little remark settled the issue. Thank God, I could discover another world.

The school looked different in the sixties. Only the western part of the present building was completed. It was called the 'new building', because there was an 'old building' in the southern part of the compound which has since been bulldozed into nothingness. It had the look of an old, greyish haunted house. 'Nilkuthi' it was called by some. But I am not competent enough to trace back its origin to the imperial times. There are better equipped people. This 'old building' like an old, squatting figure dominated the entire campus and even eclipsed the proud outlines of the 'new building'. The rooms were olden, with the 'punkha pullers' drawing steadily at the rope from outside the room in summer. Along with the school fees 'punkha fees' were collected from the students. The Dhaldighi, now walled off, was then almost at the door step of the old building. During the rainy season often the waters overflowed the fields and threatened to enter into the class room. We enjoyed splashing in and out of the waters.

In the reminiscence about my former teachers I shall restrict myself to those few only who have left their mortal coils Aswinibabu, a short, small, bespectacled man was our Sanskrit teacher. As he had a very frail structure, he was considered to be 'soft' as a pedagogue, hardly relishing corporal punishment. But one day when a student tried to flout him in the class, he flamed up into an orgy of slaps and floggings. I never suspected the old man to have so much blood in him. Next comes the memory of Sajanibabu with whom we learnt Bengali. He used rimless, golden spectacles and taught amplifications. Most prominent, to me, however, is the memory of our respected teacher Sri Benoy Chatterjee. I saw him in full bloom—not the emaciated, crest-fallen diabetic, one met in him in the last few years of his life. He spoke chaste English in an impeccable manner both in and outside the class room. The Annual sports was a grand affair. Throughout the day Benoybabu's indefatigable voice continued to pour forth the results ot the 'events' in his ussual immaculate English. Though he was a pure Bengali at heart, his accent was typically British. Et tu, Brute" was the phrase I culled from him when one day he rebuked me for making a noise in the class. Lastly, allow me to pay my homage to Sri Santi Chatterjee, the then Assistant Headmaster of our school. Worlds away from the genial spirits of Benoybabu, he had a .ombre disposition with antique, circular, almost Gandhian, spectacles. Stuffing some black, scented snuff into his enlarging nostrils, he would go on teaching us English composition panting and coughing occasionally. He suffered from asthma. His crooked, dry and rough finger-tips were al-

ways smeared with red ink—the result of continuous correction of homework submitted by us. Only rarely could he be found stalking the corridor without a large heap of exercisebooks tucked under his arm. And he was coughing and gasping all the way.

But studies alone did not bind us. The school football team (especially the 'A' team') was one of the best in the district. There was always a keen competition with Town School which always followed closely on the heels and often surpassed us in skill and speed. Those were really the days when the serious students studied and the good players played but there was no serious breach between the two. After the school hours we all went to the playground as active participants in the going-on of the league table. In our XI Arts class we had a whole galaxy of Football stars like Satyanarayan Roy. Niharendu Roy, Rajib Ghose and Barun pal. In atheletics also there was an all round enthusiasm. Vivid in my memory as if in cinematic slow-motion is the frame of two sprinters—one, a tall, lanky, hairy senior, and the other a bespectacled, dark, squat, little figure- popularly and endea ringly called 'negro'—both of them running in a thrilling neek to neck finish. The fair-complexioned sprinter hailed from our school and his little, dark, arch-rival belonged to the Town School. Those were the days of very keen and healthy competition which has slowly withered away with the passage of time. But memory knows and memory can re-live.

From the playground let us be back again to the school building we had our library midway between the headmaster's chamber and the staff-room just in the back portion of what now is jutting out as the 'stage' in the middle of the ground floor. It was an ill-lit, almost dark patch fenced off by wooden-partition. It smelled of old books and insecticide. Inside this dark chamber sat Mohinibabu, our librarian with a bald patch in the middle of his head and his spectacles hanging out of a steep nose like the broken mast of an ill-fated ship. The spectacles hung so loose and awery that Atulbabu could look through them only after some considerable effort. They looked like strange and useless external appendages. Such was the presiding deity and his environs. The school library is and ought never to be a place of serious study. It is the place where students flock and depart with a book that is to engross and enkindle tham at home. Translations of some English classics were there and Bengali story books galore. Novels still bore the mark of the forbidden fruit and hence only winced from inside the stacks.

Finally, a few words about Bipin, the 'khas bearer' of our headmaster. A small, wrinkled, silver-haired man, he always played a second fiddle to his illustrious 'master'. Wherever he went he commanded an attitude of awe and wonder. He never exercised what in modern political terminology is known as 'extra-constitutional' authority. But he was like our headmaster's alter ego. His was a little figure with a flour-like complexion; But the sight of this little, stooping figure with the noticebook tucked tightly in his hands sent tremors through many a heart.

More than twenty yeary have elapsed already. Still memory knows before knowing remembers.

(Collected from Centenary Volume)

উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর ইতিহাসের আশায়

অরিন্দম কোঙার

পর্ব থেকে পর্বান্তর

ব্যক্তির বয়স বাড়ে, বৃদ্ধ হয় এবং বার্ধক্য তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বয়স বাড়ে, স্ফীত হয় এবং তার সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার সুযোগ বেড়ে যায়। আমি, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের অসংখ্য ছাত্রের একজন এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনীশক্তি ক্রমশ ক্ষয় পাচ্ছে, অপরদিকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের জীবনীশক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্ধিষ্ণু এক প্রতিষ্ঠানের প্রতি ক্ষয়িষ্ণু এক ব্যক্তির আশা এখানে ব্যক্ত করতে চাই। বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা আমি ইতিপূর্বেই প্রকাশ করেছি ২০০২ সালে প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবের স্মরণিকা, 'চিরন্তনী'-তে 'অতীত থেকে বর্তমান' শিরোনামে। সুতরাং ছাত্র হিসাবে আমার অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির কোন সুযোগ নেই, প্রয়োজন নেই। বরং অতীতে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল কী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এখন কী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে — তা নিয়ে আমরা কিছুটা মত বিনিময় করে নিতে পারি।

আমাদের আলোচনার জন্য আমরা বিদ্যালয়ের কালকে দুটি পর্বে ভাগ করে নিচ্ছি। প্রথম পর্ব অতীত—পরাধীন ভারতের কাল এবং দ্বিতীয় পর্ব বর্তমান—স্বাধীন ভারতের কাল।

প্রথম পর্ব

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল স্থাপিত হয়েছে ১৮৮৩ সালে। ভারত তখন ঔপনিবেশিক শাসনাধীন। আগেই ১৮৫৭-৫৯ সালের মহাবিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দমন করে এবং ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ করে নেয়। বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার বছরে মৃত্যু হয় মহারাষ্ট্রের বাসুদেও বলবন্ত ফাড়্কের যিনি রাজদ্রোহের মামলায় আসামী হয়ে প্রথম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি ধারা হিসাবে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৯২০ সাল থেকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আর একটি ধারা, অসহযোগ সত্যাগ্রহ অন্দোলনের ধারা সংযোজিত হয়। ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় (কারও কারও মতে ১৯২৫ সালে) এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তৃতীয় একটি ধারা, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারার সূত্রপাত ঘটে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই-সব ধারার ঢেউ বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের গায়ে এসে পড়ে, শিক্ষক-ছাত্রদের নাড়া দেয়। সেটাই ছিল স্বাভাবিক, সেটাই ছিল কাম্য এবং সেটা আমাদের গর্বের। এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস চর্চা করে বিদ্যালয়ের দীর্ঘকালের শিক্ষক (১৯৫১ - ৮৪) পাঁচুগোপাল রায় উল্লেখ করেছেন, ''মিউনিসিপ্যালের ছেলে মোটা চশমা চোখে দেওয়া কোল-কুঁজো করা ছেলে নয়, দুর্বার প্রাণশক্তি তার। সেই প্রাণ-প্রাচুর্য সে সব দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বড় হতে চায়। Homo sum, humanum nihil a me alienum puto (অর্থ—আমি একজন মানুষ, কোনো-কিছুই আমাকে মানবজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না)। আমি মানুষ, মানুষের কোন ব্যাপারে আমি উদাসীন নই —এই তার জীবনের মূল মন্ত্র। দেশের সব কটি আন্দোলনে মিউনিসিপ্যালের ছেলে অধিক সংখ্যায় যোগ এবং নেতৃত্ব দান করেছে। শিক্ষক মশায়দের প্রেরণা তাদের মধ্যে কাজ করেছে।'' (হে অতীত, কথা কও —)

বিশ শতকের তিনের দশক। বিদ্যালয়ে তখন পড়েন কালীপদ সিংহ। কৃতি ছাত্র ও পরবর্তীকালে যশস্বী অধ্যাপক। তাঁর স্মৃতিকথায় আছে, ''নতুন বিল্ডিং-এ (এখন যেখানে স্কুল বসে) মণ্ডপের নীচে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে এসেছিলেন সস্ত্রীক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইন কলেজের অধ্যক্ষ। সে কী উৎসাহ! তাঁর বক্তৃতায় স্বদেশানুরাগের অপূর্ব প্রকাশ ভুলতে পারবনা। তিনি বললেন — শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু চাকরি নয়, দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা। বক্তৃতা শেষে বললেন, আমার প্রিয় ছাত্রদল, আমি বন্দেমাতরম্ ধ্বনি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি। তোমরা আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বল — বন্দেমাতরম্। ছাত্র ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্মিলিত কণ্ঠে

উচ্চারিত হোলো বন্দেমাতরম্। আকাশ-বাতাস সেই অপূর্ব ধ্বনিতে মুখরিত হোতে লাগল।" (নানা রঙের দিনগুলি)

স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে বিশ শতকের তিনের দশকে বর্ধমান জেলার মানুষের কাছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা গড়ে তোলায় যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৩১ সালের ৫ মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি হয়। করাচিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৪৫-তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩১ সালের ২৯ - ৩১ মার্চ। এর মাস দুয়েক পর বর্ধমান শহরে বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সম্মেলন (জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন), বর্ধমান জেলা যুব সম্মেলন ও বর্ধমান বিভাগীয় সমাজবাদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সমাজ বিকাশের ধারা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। কংগ্রেস সম্মেলনে গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও আন্দোলন প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। যুব সম্মেলন ও সমাজবাদী সম্মেলন আয়োজনে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম বিনয় চৌধুরী, সরোজ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, আমোদবিহারী বসু, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের মধ্যে বিনয় চৌধুরী ও সরোজ মুখোপাধ্যায় ১৯২৮ সালে এবং তারও আগে আমোদবিহারী বসু বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মার্কসবাদী পণ্ডিত সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ কয়েক বছর বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরে মূলত তাঁর নানা (মাতামহ) মৌলবি আবুল কাশেমের উদ্যোগে বর্ধমান টাউন স্কুল স্থাপিত হলে, তিনি টাউন স্কুলের ছাত্র হন এবং সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত)-এর ছোট ভাই। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের কৃতি ছাত্র ভাষাচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন, ''ভূপেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে আমার মনে দুটি ক্ষোভ আছে। কেন আমি তাঁর সঙ্গে আগে সংযোগ স্থাপন করিনি। এই এক। আর-এক হল দেশ ভূপেন্দ্রবাবুকে তাঁর মনীষা ও পাণ্ডিত্যের উপযুক্ত কোন মর্যাদা দেয়নি।" (দিনের পর দিন যে গেল) প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে বর্ধমান জেলা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে স্মরণে রেখে ১৯৯৬ সালে হাটগোবিন্দপুরে স্থাপন করেছে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়। এই হাটগোবিন্দপুরেই ১৯৩৩ সালে বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

দ্বিতীয় পর্ব

দেশ স্বাধীন হল। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হল। দেশের সংবিধান গৃহীত হল। সরকার গঠনে নির্বাচনী প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হল। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরী হয়ে পড়ল। জাতীয় শিক্ষার জন্য আন্দোলন তো পরাধীন ভারতেই হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আহূত এক সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর উদ্‌বোধনী ভাষণে বলেন, ''যখনই ভারতে শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা রচনার জন্য কোন সম্মেলন আহূত হয়েছে; তখনই প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বজায় রেখে তার মধ্যে সামান্য কিছু সংস্কার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে এ ধরণের সনাতনী ব্যবস্থা আর চলতে দেওয়া হবে না। দেশে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকেও এই পরিবর্তনের সঙ্গে সমান তালে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার সামগ্রিক ভিত্তিতে অবশ্যই বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে হবে।"

স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটির পর একটি শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে কেন্দ্রে ও রাজ্যে। সেই রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯) থেকে নলেজ কমিশন (২০০৫-০৬) পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গে যেমন সর্বশেষ শিক্ষা কমিশন হয়েছে অশোক মিত্র কমিশন (১৯৯১-৯২) এবং বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি হয়েছে রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় কমিটি (২০০১ -০২)। এই-সব শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা কমিটির মধ্যে সর্ববৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কমিশন হচ্ছে কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬)।

সন্দেহ নেই যে এই-সব শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা কমিটির অভিমত ও সুপারিশ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরী করার মুখ্য দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের, কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই-সব কমিশন ও কমিটি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের মতো অগ্রসর মাধ্যমিক বিদ্যালয় তো নয়ই। লেখাপড়ায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিয়মিত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন এবং ছাত্রদের এই কৃতিত্বে বিদ্যালয় গর্বিত, আমরা আনন্দিত। কিন্তু আমরা তো বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের কাছ থেকে আরও বেশি আশা করি।

বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা-পূর্ব প্রথম পর্বে বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা সামগ্রিকভাবে দেশকে বিবেচনায়

রেখে পঠন-পাঠনের কাজ চালাতেন। আজ দেশ স্বাধীন। দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষিত হয়েছে, ''আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়িয়া তুলিতে ... এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করিতেছি, বিধিবদ্ধ করিতেছি এবং আমাদিগকে অর্পণ করিতেছি।'' শিক্ষা ক্ষেত্রে কোঠারী কমিশন তাই মনে করে, ''সুতরাং, আমাদের মতে জনগণের জীবনযাত্রা, চাহিদা ও আকাঙ্খার সঙ্গে যুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে শিক্ষার কোন সংস্কার অপেক্ষা শিক্ষার অন্য কোন সংস্কার বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী নয়। এইভাবে শিক্ষার সংস্কার করে তাকে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করতে হবে।''

কোঠারী কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে, তবে রিপোর্টকে অনেকটাই লঘু করে ১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলি এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকরী করার আন্তরিক প্রয়াস নেওয়া হয় নি। ফলে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, জাতীয় শিক্ষা নীতির পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সংবিধানের ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। তার উপর অর্থনীতির বিশ্বায়নের আড়ালে উৎকট ভোগবাদী মানসিকতা গড়ে তোলার অভিযান চলছে, আত্মকেন্দ্রিক করে তোলার পরিমণ্ডল তৈরি করা হচ্ছে। পরিণামে মানুষের জীবনে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির মানব উন্নয়ন রিপোর্ট (১৯৯৯) অনুযায়ী সেগুলি হচ্ছে —১) আর্থিক উদ্বায়িতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, ২) কর্মসংস্থান ও আয়ের নিরাপত্তাহীনতা, ৩) স্বাস্থ্যের নিরাপত্তাহীনতা, ৪) সাংস্কৃতিক নিরাপত্তাহীনতা, ৫) ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা, ৬) পরিবেশের নিরাপত্তাহীনতা, ৭) রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীগত নিরাপত্তাহীনতা। এর সঙ্গে সারা দুনিয়া জুড়ে চলছে অস্থিরতা। সাম্রাজ্যবাদ, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদের দাপাদাপি। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে কেউই রেহাই পাবেন না। আজ কেউ যথেষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে যদি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে বৈভবের মধ্যে থাকতে চান, কাল অথবা পরশু তাঁকে হয়তো ভোগ করতে হবে নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা অথবা সাম্রাজ্যবাদ, মৌলবাদ কিংবা সন্ত্রাসবাদী হামলায় অসহায় মৃত্যু অথবা বিশৃঙ্খল অমানবিক পরিবেশের নিষ্ঠুর আচরণ। এই পটভূমিকায় বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন উন্নত, পরীক্ষার ফল আকর্ষণীয়। ফলে অভ্যস্ত চোখে প্রচলিত মাপকাঠিতে বিদ্যালয়টি নজরে পড়ে।

কিন্তু একটি অগ্রসর বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর পরিমাপ বিদ্যালয়কে নিজেকেও করতে হয়। যে বিদ্যালয় প্রাক-স্বাধীনতা কালে পঠন-পাঠন, খেলাধূলায়, সংস্কৃতি চর্চায় এবং সেই সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে পেরেছে, স্বাধীনতা-উত্তর কালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই বহুমুখী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে কি না তা বিদ্যালয়কেই বিবেচনা করতে হবে। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর কালের এক ছাত্র সাহিত্যিক চিত্ত ভট্টাচার্য দেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়ার অনির্বচনীয় অনুভূতি তুলে ধরে এক তুলনামূলক মূল্যায়ণে মনে করেন, ''এখনকার বিদ্যালয়ের পরিচিতি মুখ্যত নির্ভর করে শেষ সাধারণ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে — সফলতম ছাত্রের স্থান, ন্যাশান্যাল স্কলারশিপ, স্টার, লেটার প্রভৃতি পাওয়ার উপর। আমাদের সময়েও গুণগত মান গণ্য হতো নিশ্চিত, তবে অন্যান্য বিষয় নগণ্য ছিল না। একটা পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তি ভূমির উপর ছিল বিদ্যালয়-জীবন প্রোথিত। বিদ্যালয় ছিল পরম নির্ভরযোগ্য ধাত্রী।'' (আলোকিত অধ্যায়) শিশুকে পরিচর্যা করায়, অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তোলায় ধাত্রীর ভূমিকা তো শাশ্বত। যত দিন যায়, সেই ভূমিকা তত উন্নত, পরিমার্জিত, পরিশীলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় ও কাম্য। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের কাছে সেই ধাত্রীর ভূমিকাই আমরা আশা করি।

২০০৮ সালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের ১২৫-তম বর্ষ যখন চলছে, তখন বর্ধমান জেলার এক সুসন্তান বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত (১৯০৮-৬৫)-এর জন্মশতবর্ষ। সহযোদ্ধা ভগৎ সিং-এর সঙ্গে বটুকেশ্বর দত্ত বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সব-রকম শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন-নিপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য বিপ্লব। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৯)-এর ১৫০-তম বর্ষে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের ১২৫-তম বর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ২০০৮ সাল ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮), প্রফুল্ল চাকি (১৮৮৮-১৯০৮), কানাইলাল দত্ত (১৮৮৮-১৯০৮), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২-১৯০৮)-র আত্মদানের শতবর্ষ। ভারতের এই চলমান ইতিহাসের সঙ্গে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের ইতিহাস নিজেকে সম্পৃক্ত করে তুলবে, বিদ্যালয়ের ১২৫-তম বর্ষে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে, সামাজিক মানুষ হিসাবে আমরা সে আশা তো করতেই পারি।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

অভিজিৎ তরফদার

ব্যক্তি কখনোই প্রতিষ্ঠানের থেকে বড় হতে পারে না। বিশেষত সে প্রতিষ্ঠান যদি হয় শতবর্ষ অতিক্রান্ত একটি বিদ্যালয়, এবং ব্যক্তি হন বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত এক কর্মী। বটবৃক্ষের মতোই বিদ্যালয়ও বার্দ্ধক্যে পরিণত হয়, ডালপালা বিস্তার করে, অগণিত মানুষকে ছায়া ও আশ্রয় প্রদান করে। সেখানে একজন কর্মী, তা তিনি প্রধানশিক্ষক হলেও, অল্প সময়ের উপস্থিতিতে কতটুকুই বা অবদান রেখে যেতে পারেন? বর্ধমান পৌর বিদ্যায়তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে স্বনামধন্য প্রধানশিক্ষক কিছু কম আসেন নি। অনেকেই অনেকদিন শিক্ষকতা করেছেন, তাঁদের ছাত্ররাও দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। আমরা ছোট থেকেই তাঁদের নাম শুনেছি এবং শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে তাঁদের স্মরণ করেছি।

শ্রী অমর সিংহ সেই হিসেবে নিশ্চিতই ব্যতিক্রম। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি, তখন তিনি এলেন। উচ্চমাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পরীক্ষা দিলাম, তার পরপরই চলে গেলেন। এমনকী ফলপ্রকাশ অবধিও ছিলেন না। অথচ ওইটুকু সময়েই এক দীর্ঘমেয়াদী, বলা উচিত চিরস্থায়ী ছাপ তিনি রেখে গিয়েছিলেন, যা এই বয়সেও স্মরণ করতে পেরে ধন্য মনে করছি।

যে সময়টায় তিনি বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন, সেটা রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ। একাত্তর-বাহাত্তরের সেই কালে আমরা দুইভাই তৈরি হয়ে স্কুলে যেতাম, প্রায়শই গেট বন্ধ থাকত, পরিচিত কিছু দাদাদের রাজই দেখতাম, তারা পাখি তাড়ানোর মতো আমাদের বাড়ি ফিরে যেতে বলত। স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন বোমাও ফাটল মাঠে, স্কুল বাড়িতে আগুন ধরানো হল, পোড়া প্রশ্নপত্র স্কুলের মাঠে ছাই হয়ে উড়তে লাগল। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা শুকনো মুখে ঘুরতে লাগলেন, তাঁদের অসহায়তা দেখে আমরা আরও শঙ্কিত হতে থাকলাম।

সামগ্রিক পরিস্থিতিটা যথা এইরকম, আমাদের দুজনের অবস্থাটা আরও করুণ। দু-ভাইকে খাইয়ে দাইয়ে মা কলেজে যেতেন, অথচ স্কুলে গিয়ে বন্ধ দরজায় ঘা খেয়ে ফিরে এলে বাড়িতে ঢুকব কেমন করে? দুটো চাবির গোছা একটা বাবারকাছে, অন্যটা মায়ের। বাবার তো ফিরতে সেই সন্ধ্যা; তাছাড়া বাবাকে পাওয়াও সম্ভব নয়, স্কুল অনেক দূর। অতএব মায়ের কলেজ, কিন্তু সে তো মেয়েদের কলেজ! তখন ক্লাশ এইট, হাফ-প্যাট, কিন্তু পা-দুখানা ঢাকা থাকলেই বোধহয় ভাল, মেয়েদের মুখের দিকে তাকানোও যে কী কঠিন! হনহন করে হেঁটে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে টিচার্সরুম থেকে জেনে মার সন্ধান করে চাবি নিয়ে কলেজের চৌহদ্দি পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতাম। তাও একদিন আধদিন হলে কথা ছিল, সপ্তাহে দুদিন, কখনো তিনদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

যখন স্কুল পাল্টানো ক্রমশ অভ্যেসে পরিণত হচ্ছে, এমনকী ভালও লাগতে শুরু করেছে, তখন হঠাৎই একদিন স্কুলে গিয়ে এক গল্প শুনলাম। নতুন এক হেডস্যার এসেছেন, তাঁর কোমরে গোঁজা থাকে আগ্নেয়াস্ত্র। চকখড়ি-ডাস্টার নয়, হাতে অস্ত্র নিয়েই নাকি তিনি সেই ক্লাশে প্রবেশ করেছিলেন যেখানে স্কুল পোড়ানো হাড়-হিমকরা নেতাদের ঘুঘুর বাসা। দ্বৈরথযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন তাদের। এবং যথারীতি তাদের নেতাগিরির বেলুন চুপসে গিয়েছিল।

পরে বুঝেছি, এগুলো সবই গল্প কথা, আসলে সেই বয়েসটা কোনও না কোনও অরণ্যদেব-সুপারম্যান-ম্যানত্রেককে সামনে দেখতে ভালবাসে, যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, দুহাতে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দড়ির দোলনা বেয়ে বিপদগ্রস্তজনকে কোলে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে। হেডস্যার আমাদের মনের সেই ফাঁকটা পূরণ করেছিলেন।

স্কুলে শৃঙ্খলা ফিরে এল। ঠিক সময়ে ছুটি হতে লাগল। যখন তখন তালা লাগানো বন্ধ হল। বিদ্যালয় ক্রমশ বিদ্যালয়ের চেহারা ফিরে পেতে লাগল।

কড়া ছিলেন স্যার। আমাদেরই বন্ধু সুস্নাত (নামটা পাল্টে দিলাম) প্রগ্রেস রিপোর্ট বাড়ি না নিয়ে খেলার মাঠে ছিঁড়ে ফেলেছিল, স্যার-এর গোচরে আসায় কী মার যে খেয়েছিল তা আমাদের চোখে দেখা। অভিভাবককে ডেকে পাঠানো, টিসি ধরিয়ে দেওয়া ওসবে বিশ্বাস ছিল না স্যার-এর। দোষ করলে শাস্তি পেতে হবে এবং তার দায়িত্ব যে তাঁরই তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

কিন্তু শুধু কড়া শাসনে একটা স্কুলের ভোল বদলানো যায় না। আগে যা কখনো হত না, তাই শুরু হল বিদ্যালয়ে।

দু-তিনমাস পরপরই বিতর্ক, বক্তৃতা, আলোচনা। ছাত্ররাই করত। শ্রীঅরবিন্দ থেকে চন্দ্রাভিযান। ভাল বললে পুরস্কার। শিক্ষকরাও অংশ নিতেন। শ্রদ্ধেয় শ্রী পাঁচুগোপাল রায় ছাত্র গৌরবে গর্বিত শিক্ষক প্রসঙ্গ রিফ্লেকটেড গ্লোরি (Reflected glory), প্রতিফলিত গৌরবের কথা বলেছিলেন। আজও পনেরো বছর অধ্যাপনা করার পর শিক্ষক দিবসে সেই কথাই স্মরণ করি।

হঠাৎ যেন পৃথিবীর জানলাটা আমাদের সামনে হাট করে খুলে গেল। বিড়লা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম সায়েন্স সেমিনার আয়োজন করত। বাহাত্তর থেকে টানা বেশ কয়েকবছর জেলায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন আমাদের স্কুলের ছিল বাঁধা। রাজ্যস্তরেও সেমিনার, ডিবেট, ক্যুইজ, ফেয়ার প্রতিটিতে আমরাই প্রথম-দ্বিতীয় হতাম। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে সারাবাংলা আন্তঃবিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্যারই আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন এবং পুরস্কার ঘোষণার আগেই মহারাজদের সামনে গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, আমার ছেলেরা প্রথম হবার জন্যই এসেছে।

এগুলো কত মূল্যবান ছিল পরে উপলব্ধি করেছি। ক্লাসের পরীক্ষায়, এমনকী বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় চমকপ্রদ ফল করেছে এমন বহু ছাত্রের সঙ্গে পরবর্তীকালে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের বেশিরভাগই জীবনের পরীক্ষায় জয়ী হতে পারে নি। একটি বড় প্ল্যাটফর্ম, সেখানে অনেকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এটা তো আছেই। তার চেয়েও বড়, অধীত বিদ্যার বাইরেও অনেক কিছু জানা। এবং জানা জিনিস সকলের সামনে গুছিয়ে বলতে পারা। এই সবগুলোই শ্রী অমর সিংহ আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যা একটি মফস্বল স্কুলে সেই সময়ে অচিন্তনীয় ছিল।

ক্লাশে পড়ানোতে তিনি প্রথানুগ ছিলেন না। ইংরিজি পড়াতেন। যেকোনও পাঠ্যবিষয় বুঝিয়ে, তার শক্ত শব্দগুলির অর্থ, ব্যাকরণ, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি গতানুগতিক ধারায় ইংরিজি পড়ানো হত। দু-একজন ব্যতিক্রম ছিলেন না তা নয়। কিন্তু শ্রী অমর সিংহ ক্লাশে ঢুকে যে গদ্যাংশটি পাঠ করে আমাদের ট্রানস্লেশন করতে দিতেন সেটি বুদ্ধদেব বসুর ''আমার ছেলেবেলা''। প্রথম দিন তিনি পড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলাম, এতো ''আমার ছেলেবেলা''। বাহবা পেয়েছিলাম। ক'দিন পরে সেই লোভে যখন বলে ফেললাম, এতো মনোজ বসুর ''নিশিকুটুম্ব'', বাবা-মার তলব পড়ল। মাকে স্যার বলেছিলেন, ছেলে তো নিশিকুটুম্ব পড়ছে। মা জবাব দিয়েছিলেন, ও সব পড়ে, আমি বারণ করি না। শাস্তি নয়, অভিযোগও নয়, একটি তথ্য শুধু অবিভাবকের গোচরে আনতে চেয়েছিলেন হেডস্যার, এবং আমার অজান্তে।

স্যার ভাল রাজনীতিবিদ ছিলেন না। সবাইকে সন্তুষ্ট করা তাঁর ধাতে ছিল না। ফলে তরুণতর কিছু শিক্ষককে যেমন তিনি সঙ্গে পেয়েছিলেন, অনেকেই তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। অভিযোগ অনেকদিন থেকেই জমা হচ্ছিল। অবশেষে তৎকালীন স্কুল কমিটির প্রধান, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে আর্দালি পাঠিয়ে ডেকে পাঠালেন। আমি তখন ক্লাশ ইলেভেনের ছাত্র। তাঁর অফিসের পাশের ঘরে একান্তে বসিয়ে রসগোল্লা খাইয়ে পড়াশুনা কেমন চলছে তার খবর নিতে নিতে হঠাৎই জানতে চাইলেন, হেডস্যার সম্বন্ধে আমার কী ধারণা! আমি আমার মতো করে বললাম। উনি আবার বললেন, শোনা যায় উনি নাকি শুদ্ধ ইংরিজি লিখলেও কেটে দেন, সেটা কি ঠিক? আমি জবাব দিয়েছিলাম, সেটা বোঝার ক্ষমতা তো আমার নেই। এটুকু বলতে পারি, কীটসের কোনও কবিতা পড়ে বুঝতে গেলে যে কবি হিসাবে কীটসকে জানতে হয়, তাঁর আরও অন্তত দশটা কবিতা পড়তে হয়, সেটা স্যারই আমাকে প্রথম শিখিয়েছেন। পিঠ চাপড়ে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, পরে যিনি নাকি শিক্ষাসচিবও হয়েছিলেন।

পরে জেনেছি, আমাকে যে ডেকে পাঠানো হবে, স্যার জানতেন। অথচ এ বিষয়ে আগে বা পরে কোনওরকম বাক্যালাপ তিনি করেন নি। এখন ভাবি, এ জাতীয় মূল্যবোধ ভগ্নাংশও যদি অবশিষ্ট থাকত, শিক্ষা ব্যবস্থার হাল হয়তো অন্যরকম হত। একইসঙ্গে এটাও সত্য, এই জাতীয় মানুষ কখনোই বেশিদিন কোথাও মানিয়ে নিতে পারেন না।

স্যারও পারেন নি। আমাদের যেখানে উচ্চমাধ্যমিকের সিট পড়েছিল সেখানে প্রথম দিনই গিয়েছিলেন স্যার। আমি এবং সুপ্রিয় দুজনকে দেখিয়ে সেখানকার প্রধান শিক্ষককে বলেছিলেন, এদের নজরে রাখবেন, এরা দুজনেই কিন্তু স্ট্যান্ড করবে। করি না করি পরের কথা। কিন্তু ওই বয়েসে, নিজের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ওই জাতীয় মন্তব্য, এক কিশোরের মনে কী জেদ, কী সংকল্পের জন্ম দেয় তা যদি সমস্ত শিক্ষক বুঝতেন!

আমাদের ফল প্রকাশের আগেই শ্রী অমর সিংহ বিদায় নিয়েছিলেন। এমনকী ভাল ফলের গৌরবে ভাগ নিতেও তিনি আসেন নি। পরেও স্কুল ভাল করেছে। কাগজে ছবি বেরিয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এক বা একাধিক ছাত্রের ভাল ফল লাভ যতটা বিদ্যালয়ের, তার চেয়ে বেশি হয়তো সেই ছাত্র ও তার অভিভাবকের কৃতিত্ব। শ্রী অমর সিংহের সময় বিদ্যালয় সামগ্রিক উন্নতির বিচারে যে উচ্চতায় উঠেছিল জানি না পরবর্তীকালে তা সম্ভব হয়েছে কিংবা হবে কী না।

কোনও ব্যক্তি বিশেষকে বড় করলে অনেকসময়ই তার অর্থ হয় অন্যদের খাটো করা। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য হিসেবে কেউ যেন তা না ভেবে বসেন। আমার জীবনে, আমার এই সামান্যটুকু হয়ে ওঠার পিছনে এক ব্যক্তি প্রধান শিক্ষকের যে অবদান তা স্মরণ করতেই এই অবতারণা। বিদ্যালয়ের একশ পঁচিশ বছরের স্মরণিকায় আমার এটুকুই শ্রদ্ধার্ঘ্য।

আমার বিদ্যালয়ের স্মৃতি

নিতাই প্রামাণিক

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে আমার বিদ্যালয় জীবনের স্মৃতি আজও উজ্জ্বল ও আনন্দময়। মহীয়সী এই বিদ্যায়তনে জীবন গঠনের যাবতীয় উপাদান স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের বিতরণ করা হোত। নানা বিষয়ে সম্যকরূপে বিদ্যালাভ ছাড়াও আমরা পাঠ নিয়েছি শৃঙ্খলা পরায়নতার; শিক্ষক, বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণীমানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার; সহপাঠীদের সঙ্গে ভালবাসা ও বিপদে-আপদে একসাথে চলার। আমরা আনন্দ কুড়িয়ে নিয়েছি খেলার মাঠে বিভিন্ন খেলায় — বার্ষিক খেলাধূলায় বা আন্তঃবিদ্যালয় খেলার প্রতিযোগিতায়। সহপাঠীরা বা বিদ্যালয়ের ছাত্রের পড়াশুনায় বা খেলাধূলায় পুরস্কার প্রাপ্তিতে গর্ববোধ করেছি। শিক্ষক মহাশয়দের শ্রদ্ধা ও ভয় বেশ করতাম। আমার বিদ্যালয় বলতে বিরাট খেলার মাঠসমেত এবং বেঞ্চ, টেবিল চেয়ার পূর্ণ ঐ দু'তলা বড় বিদ্যালয় গৃহটি নয়। ওটা তো ওঁর দেহমাত্র। আমার বিদ্যালয়ের প্রধান আকর্ষণ ওঁর গভীর প্রাণসত্ত্বা — আমার প্রিয় মাস্টার মহাশয়েরা, আমার প্রিয় সতীর্থরা, অন্যান্য শ্রেণীর ঐ মেরুণ রঙের প্যান্ট ও সাদা সার্ট পরা বিদ্যালয় ছাত্রেরা এবং আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় অশিক্ষক বিদ্যায়তন কর্মীরা। তাই আমি প্রতিদিনের বিদ্যালয় জীবন ভীষণভাবে উপভোগ করেছি। প্রতিদিন বিদ্যালয় যেতে এক দুর্নিবার আকর্ষণবোধ করেছি — প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনেও। এই বিদ্যালয় আমায় প্রতিদিন নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছিল।

১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসের এক সকালে বর্ধমান টাউনস্কুলে পঞ্চমশ্রেণীতে ভর্তির জন্য বাবার সাথে বের হয়েছিলাম। সেবারে তখনও মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ভর্ত্তি পরীক্ষা হয় নাই। টাউন ইস্কুলে ভর্ত্তি পরীক্ষায় নাম উঠে। তাই টাউন স্কুলেই ভর্ত্তি হতে চলেছি। তখন বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন সাইকেলে চেপে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয়। উনি তাড়াতাড়ি সাইকেল হতে নেমে বাবাকে বললেন, এবার মিউনিসিপ্যাল ইস্কুলে ভর্ত্তি পরীক্ষা হবে না। বৃত্তি পরীক্ষায় যারা ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে মিউনিসিপ্যাল ইস্কুল তাদের সরাসরি ভর্ত্তি নেবে। তাই আমার আর টাউন স্কুলে যাওয়া হল না। আমি ঐ দিনই মিউনিসিপ্যাল ইস্কুলে ভর্ত্তি হলাম। পঞ্চম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী এই সাতবছর আমি এই স্কুলে পড়েছি।

এই স্কুলে আমার দাদা তখন ক্লাস এইটে উঠেছে। দাদার কাছে শুনেছি এই স্কুলে দুতলার বারান্দা দিয়ে একদমে এক প্রান্ত ধরে আর এক প্রান্ত দৌড়ানো যায় না — এমনই লম্বা স্কুল বিল্ডিং। এই-স্কুল বাড়িটা এত বড় যে এর কাছে আমার খাজা আনোয়ার বেড় প্রাইমারী স্কুল, বড় হাতির কাছে ছোট ইঁদুরের মত। ক্লাস ফাইভে 'বি' সেকশান। প্রথম বেঞ্চিতে বসি। প্রয়াত সজনীকান্ত দে ক্লাসটিচার। বাংলা পড়াতেন। খুব ভাল পড়াতেন। 'মণি-মুক্তা' বলে একটি বাংলা দ্রুত পঠনের সুন্দর গল্পের বই পাঠ্য ছিল মনে আছে। কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'আমার বাড়ি' কবিতাটি পড়ানোর সময় কবির পরিচিতি সজনীবাবু খুব সুন্দর বলেছিলেন। সজনীবাবু সহজেই রেগে যেতেন। তাঁর হাতে সবসময় একটি ছড়ি থাকতো। তা অনেকসময় আমাদের কারোর পিঠে, গায়ে আলাপ করত। ওনার ছেলে লক্ষ্মী আমাদের সঙ্গেই পড়তো। ও এখন ব্যবসা করে। ক্লাসে আমার বাঁপাশে বসত সঞ্জীব — বর্তমান মিউনিসিপ্যাল ইস্কুলের ইংরাজি শিক্ষক সঞ্জীব চক্রবর্তী। আর ডান পাশে বসত নির্মল সাহা — একটু কালো নাদুস নুদুস আর আমারই মত ভীষণ তোত্‌লা। সঞ্জীবের দাদাও আমার দাদার সহপাঠী ছিল। সঞ্জীবের সঙ্গে পড়াশুনার আলোচনা ছাড়াও আর এক ব্যাপারে ওর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হল। ওদের বাড়িতে অনেক গল্পের বই ছিল। একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' বইটি আমায় দিল। ওতে নাকি নরহত্যাকারী এক কাপালিকের ভীষণ গল্প আছে। সঞ্জীব মাঝে মাঝে এইভাবে বাড়ি হতে গল্পের বই এর যোগান দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ এইভাবে সেই দশবছর বয়সেই সঞ্জীবের অকৃপণ দানেই হয়েছিল। আমি

ও নির্মল তোত্‌লা ছিলাম বলে আমাদের দু'জনই বেশ ভীরু ছিলাম। কথা বলতে লজ্জা ও ভয় পেতাম। ক্লাসের বন্ধুর বাইরে অচেনা মানুষ বা মাস্টার মশাইদের সঙ্গেও কথা বলতে পারতাম না। দীনেশবাবু — শ্রী দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের ভূগোল পড়াতেন। মনে আছে, আমাকে ও নির্মলকে নিয়ে উনি খুব মজা করতেন। ক্লাসের শুরুতে আমাকে প্রথমেই 'মঁব্লা'— উচ্চারণ করতে বলতেন। তখন পঞ্চম শ্রেণীতে ইউরোপের ভূগোল বোধহয় ছিল। আমার ম, ন, প, ট — ইত্যাদি উচ্চারণে বিশেষ বেগ পেতে হত। আর উনি ও ক্লাসের সবাই সেটা বেশ উপভোগ করতেন মনে আছে। নির্মলকেও ওর উচ্চারণের কোন দুর্বল অক্ষর যুক্ত শব্দ উচ্চারণ করতে বলতেন। দীনেশবাবুর এই মজা করাতে কিন্তু কখনও রাগ করিনি। বরং নিজের কাছে খুবই লজ্জিত থেকেছি এইজন্য যে ঠিকমত উচ্চারণ আজও হল না এই ভেবে। দীনেশবাবুর উচ্চতা অনুযায়ী প্রস্থে উনি অনেক বেশি ছিলেন। ফর্সা, খুব মোটা থলথলে চেহারা পরণে ধুতি, হাফসার্ট ও চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা, সুমুখশ্রীযুক্ত। সাইকেল চালিয়ে আসতেন বীরহাটা বাঁকা ব্রীজের ওপার হতে। প্যাডেলে খুব কষ্ট করে পা পৌঁছাত। এমনই বেশ রসিক মানুষ ছিলেন। দীনেশবাবু পরে সপ্তম শ্রেণীতে আমাদের অঙ্ক ক্লাস নিতেন। খুব ভাল অঙ্ক পড়াতেন। পঞ্চম শ্রেণীতে আমাদের পড়াতেন প্রদ্যুতবাবু, মিহিরবাবু, রাজকৃষ্ণবাবু। প্রদ্যুতবাবু — প্রদ্যুত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন সম্প্রতি আমাদের ইস্কুলে রসায়ন বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ হলেন। পঞ্চম শ্রেণীতে বোধহয় ইতিহাস পড়াতেন। কোনদিন ইস্কুলে ওনার অনুপস্থিতি ছিল না। তখন উনি সুন্দর, ছিপ্‌ছিপে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মাথায় কোঁকড়া চুলসহ প্যান্ট-শার্ট পরা বা কখন সাদা ধুতি-শার্টে নিপাট বাঙালি সপ্রতিভ তরুণ। এহেন প্রদ্যুতবাবু কয়েকদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির পর যোগদান করলেন। আমাদের মধ্যে একজন সাহসী ছাত্র স্যারকে বিদ্যালয়ে না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করতে উনি একটু হেসে জোরেই বললেন, ''আরে! আমি বিয়ে করছিলাম''। — একথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন উনি ক্লাসে বেশ হালকা মেজাজে পড়িয়েছিলেন। মিহিরবাবু — মিহির কিরণ সাঁই খুব রাশভারি মানুষ ছিলেন। ক্লাসে কেউ টুঁ শব্দ করতে পারতো না। কিছুদিন পর উনি বছরখানেকের জন্য বি. টি. পড়তে গেলেন। কারণ ১৯৬৮-তে বর্ধমান মোহনবাগানের কাছে বি. টি. কলেজের সোস্যাল ফাংশানে মিহিরবাবুকে দেখেছি। আমার বড়দিও ওইবছর বি. টি. পাশ করে। ইস্কুলের নীচু ক্লাসে পড়লেও উঁচু ক্লাসের মাস্টার মশাইদের নাম ক্রমে ক্রমে জেনে নিয়েছিলাম। তখন হেড মাস্টার মহাশয় অবনী গোস্বামী মহাশয়কে দেখেছি — বেশ খর্বকায় মাঝারী চেহারা দুধ সাদা পাঞ্জাবী ও সরু পাড় সাদা ধুতি পরা, পায়ে নিউকাট কালো জুতো, চোখে গোল ফ্রেমের চশমা, একমাথা চুল — ছোট কিন্তু ভীষণ কোঁকড়ানো। তখন আমাদের স্কুলের বাউন্ডারী পাঁচিল দেওয়া হচ্ছে; আর উনি মাঝে মাঝে ওখানে তদারকি করছেন। উনি বিজ্ঞান ক্লাসে ফিজিক্স পড়াতেন। ওনার ছেলেও আমাদের স্কুলে পড়তো। শীতকালে বিদ্যালয়ে বার্ষিক খেলাধূলা বেশ উন্মাদনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হত। বেশ কিছুদিন হত হিট্ অর্থাৎ প্রাথমিক বাছাই-পর্ব। আমরা ছোটরা প্রায় সবাই দৌড়নোতে নাম দিতাম। এটা বেশ উপভোগ্য ছিল। বেশ কয়েক ব্যাচেও এ. বি. সি. গ্রুপের বাছাই পর্ব চলত বিভিন্ন খেলায়। লেবু দৌড়, রিলে দৌড়, ১০০, ২০০, ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড় হত। সারা মাঠ জুড়ে চুন দিয়ে দাগ দেওয়া হত। লংজাম্প, হাইজাম্প, হপ্‌স্টেপ জাম্প, পোলভল্ট, বর্শাছোড়া, জ্যাভেলিন থ্রো, লৌহবল নিক্ষেপ, আরও কত কি সারাদিন ধরে খেলা হত। আমরা ট্র্যাক লাইনের ধারে বসে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতাম। খেলাধূলা পরিচালনা করতেন ঢোলা কোটপ্যান্টে সাহেবী পোশাক পরা ভীষণ ছাত্রবৎসল বিনোদী বাবু — বিনোদীমাধব সামন্ত; ধুতি, সাদা শার্ট ও শাল পরিহিত অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অথচ ঈষৎ রসিক কালীবাবু — কালীকিংকর মিত্র; নিপাট বাঙালি পোশাক পরা, শ্বেতশুভ্র শাল পরিহিত ও সুন্দর, নিখুঁত সাহেবী ইংরাজি উচ্চারণে সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিনয়বাবু — বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং সদা হাস্যময় ছাত্রবৎসল বাংলা শিক্ষক পাঁচুবাবু— কবি ও সাহিত্যিক পাঁচুগোপাল রায়। এদের সঙ্গে সহযোগিতায় খেলার শিক্ষক রাজকৃষ্ণবাবু — রাজকৃষ্ণ পাল, শ্যামাবাবু — শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য শিক্ষকরা থাকতেন। স্কুলের স্পোর্টসে সারা মাঠে সমস্ত ছাত্ররা খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকত এবং ছাত্রদের বিভিন্ন খেলা উপভোগ করত। ঐ কয়দিন স্কুলে পড়াশুনায় খুব ঢিলেঢালা ভাব থাকতো। ভীষণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মাস্টারমশাইদেরও রাশ বেশ আলগা থাকতো। ওনারাও খেলা বেশ উপভোগ করতেন। মাস্টার মশাইদের মধ্যেও খেলাধূলা প্রতিযোগিতা হত — যেমন হাঁটা। এই হাঁটা প্রতিযোগিতা আমরা ভীষণভাবে উপভোগ করতাম। দেখতাম, রাধিকাবাবু — অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মশাই

রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জী, পাঁচুবাবু, বিনোদীবাবু, কালীবাবু, শিশিরবাবু ইত্যাদি বয়স্ক স্বনামধন্য মাস্টারমশাইরা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের খেলায় উৎসাহ দিতে তাঁদের বৃদ্ধবয়স উপেক্ষা করে ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। তাঁরা মনেপ্রাণে চাইতেন ছাত্ররা খেলাটাও মনপ্রাণ দিয়ে পড়াশুনার মতই করুক। তাঁরা ছাত্রদের বোঝাতে চাইতেন যে খেলাধূলায় মনে নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, শরীর গঠন হয়, শৃঙ্খলা শেখা যায় আর পড়াশুনায় কোন একঘেয়েমী আসে না। তাঁরা এক সাথে মাঠের মাঝে হেঁটে এগিয়ে চলেছেন। হাসিমুখে পাঁচুবাবু বিনয়বাবুকে অতিক্রম করে হাত দিয়ে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন শেষ গন্তব্যস্থলের দিকে প্রথম স্থান অধিকার করে। আর সবার শেষে অনেক পিছনে কালীবাবু — কালী মিত্র মহাশয় নিজস্ব স্টাইলে ধীরে ধীরে সটান যোগা ভঙ্গিতে স্মিতহাসি মুখে হেঁটে চলেছেন। তিনি সবার শেষে এসে পৌঁছচ্ছেন। তাঁদের সকলের হাঁটা এখনও মানসচক্ষে দেখতে পাই। তাঁদের সকলের গভীর ছাত্র-প্রীতি, ছাত্রদের উৎসাহ দেবার আন্তরিক প্রয়াস — তাঁদের নীরববার্তা এই যে 'খেলাটাও অবহেলার নয়' — এই ছবিটা মনে উদয় হলে উদ্গত অশ্রুকে রোধ করতে ব্যর্থ হই। ঠিক এইরকমই ছাত্র এবং শিক্ষকদের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হত গ্রীষ্মাবকাশ বা পূজাবকাশের ঠিক আগের দিন 'ফুল খেলায়'। সেদিন বড় আনন্দের দিন। আমরা যে যার বাড়ি হতে সদ্যপ্রস্ফুটিত বাগানের ফুলগুলি নিয়ে যেতাম। ক্লাসে ফুল দিয়ে ক্লাস টিচারকে তা দিয়ে প্রণাম করতাম। সেদিন চাঁদা তুলে আমরা ছাত্রশিক্ষক মিলে মিষ্টমুখ করতাম। মাস্টারমশাইরা সেদিন খুব হালকা মেজাজে খুশিতে থাকতেন। সেদিন কোন পড়াশুনা নয়। শুধু অবকাশে বাড়ীতে পড়াশুনা ও কাজ করে আনার লিখিত নির্দেশ থাকতো। আমরা খাতায় সেগুলি লিখে নিতাম। এরপর সবাই মিলে মাঠে গিয়ে শিক্ষক বনাম ছাত্রদের ফুটবল খেলা উপভোগ করতাম। শিক্ষকদের কম করে তিন বা চার জন গোল কিপার থাকতেন বল আটকাবার জন্য। বল মারার সময় শিক্ষকদের পায়ের সঙ্গে ছাত্রদের পা যাতে না লেগে যায় তার জন্য সমস্ত ছাত্র খেলোয়াড় ভীষণ সংযত ও যত্ন নিয়ে আস্তে বল মারতো। ছাত্রদের লক্ষ্য থাকতো, খেলায় মাস্টার মশাইয়েরা জয়লাভ করুক। সেইজন্য ছাত্ররা মোটেই রক্ষণাত্মক খেলতো না। মাস্টার মশাইরা গোল অনায়াসেই দিতেন। খেলার শেষে আমরা ছাত্ররা সবাই মাঠে নেমে এবার বল খেলতে শুরু করতাম। অনেকক্ষম পর্যন্ত চলত। সে খেলা যেন আর শেষ হতে চাইত না। কারণ আর যে আগামী একমাস প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে না। দূরে বাড়ি যারা তারা থাকবে দূরে। স্কগুলের কাছের ছাত্ররা হয়ত মাঠে খেলতে আসবে। মনে পড়ে সেদিন স্কুল থেতে বাড়ী ফিরে আসাটা খুব কষ্টের ছিল।

এইরকম ভাবে আনন্দ কুড়োতে কুড়োতে স্কুলে আমি বেড়ে উঠেছি। খেলাধূলায় আমি যোগ দিই নাই বটে, তবে প্রতিটি খেলা নিজের স্কুলের মাঠে বা অন্য স্কুলের মাঠে যা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা দেখতে গেছি, বন্ধুদের সঙ্গে ভীষণভাবে উপভোগ করেছি। স্কুলে বড়দের বাস্কেটবল, ভলিবল, ফুটবল প্রতিযোগিতা সবই ছিল। এছাড়া ড্রিল ও খেলার ক্লাসে আমরা নানা খেলা শিখতাম রাজকৃষ্ণবাবু, বিনোদীবাবুর তত্ত্বাবধানে। আমাদের সময়ে আমাদের বিদ্যালয় জেলার খেলাধূলায় সর্ববিষয়ে প্রথম হত টানা কয়েক বছর। অলরাউণ্ডার হিসাবে সর্ব বিষয় খেলাধূলায় আমাদের সকলের নয়নের মণি ছিলেন 'সব্যসাচীদা সব্যসাচী ভট্টাচার্য, আর চিলেন অনুপদা অনুপ রায়, ওরা যে আমাদের স্কুলের জন্য কত কাপ, মেডেল ও সার্টিফিকেট এনে আমাদের বিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

বিদ্যালয়ে এন. সি. সি. তে যোগ দিই ক্লাস সেভেনে। সপ্তম শ্রেণী হতে একাদশ শ্রেণী এই পাঁচবছর আমি বিদ্যালয়ে এন. সি. সি. তে পাঠ নিয়েছি। প্রতি রবিবার সকালে স্কুলের মাঠে এই প্র্যাকটিশ হত। তখন অনেক ছাত্র এন. সি. সি. তে প্র্যাকটিশ করত। ১৫ আগস্ট, ২৬ জানুয়ারি ইত্যাদি দিনগুলি বিদ্যালয়ে খুব সমারোহ করে, এন. সি. সি. কুচকাওয়াজ হত। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রধান শিক্ষক সুন্দর বক্তৃতা দিতেন। আরও সুন্দর হৃদয়গ্রাহী, আবেদনময়, আবেগময় বজ্রগর্ভ বক্তৃতা দিতেন শ্যামাবাবু ঐ দিনগুলিতে। এখনও যেন কানে শুনতে পাই সেই বজ্রনির্ঘোষ — ''স্বাধীনতা মানে যা খুশি করা তা নয়। কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ না হলে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। রক্ষাও করা যায় না। শৃঙ্খলাহীন পশুর জীবন আমরা ঘৃণা করি। আমরা ভারতমাতার উপযুক্ত সুসন্তান হতে চাই। Discipline মেনে না চললে Disciple বা ছাত্র হওয়া যায় না। এন. সি. সি. তে বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয়ের বাইরে আমরা সর্বদা যেন শৃঙ্খলারক্ষা করে চলি।'' এন. সি. সি. পোশাকে জগজ্যোতি বাবু ও শ্যামাবাবুকে ভীষণ স্মার্ট ও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী দেখেছি। তিনটি ট্রুপ ছিল এন. সি. সি. তে। জগজ্যোতিবাবু, ছাত্র বৎসল অকৃতদার শালপ্রাংশু

চেহারার জগজ্যোতি ভট্টাচার্য, শ্যামাবাবু — নানান বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান তাপস শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এক অনিলবাবু— স্বনামধন্য প্রতিভাবান অঙ্ক বিষয়ে ব্যক্তিত্ব অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা তিনজন ছিলেন একটি ট্রুপের পরিচালনায়। লম্বা, সবল, সপ্রতিভ ছাত্ররা যেন 'A' গ্রুপ অর্থাৎ জগজ্যোতি বাবুর অধীনে, মাঝারী ছাত্ররা 'B' গ্রুপ অর্থাৎ শ্যামাবাবুর অধীনে আর কৃশ, খর্বকায়, অপেক্ষাকৃত প্রাণহীনদের স্থান হত অনিলবাবুর অধীনে। অনিলবাবু তাতে অন্য দুজন ট্রুপ লিডারদের কাছে কোনোদিন অভিযোগ করেন নি। তখনকার দিনে এন. সি. সি. নেবার জন্য সকল ছাত্রদের কাছে সপ্তম শ্রেণী হতেই আবেদন জমা দেবার ডাক পড়ত এবং আবেদন করলে কাউকে ফেরানো হত না। মনে হয় সেইজন্য অনিলবাবুর ট্রুপে সবচেয়ে বেশী ছাত্র এন. সি. সি. তে ছিল। আমি অত্যন্ত খর্বকায় এবং রুগ্ন ছিলাম। তাই আমার স্থান হল পরম স্নেহবৎসল অনিলবাবুর অধীনে। এন. সি. সি. তে বড় থেকে ছোট উচ্চতা অনুযায়ী সবাইকে একটিমাত্র লাইনে দাঁড়াতে হত প্রতিদিন, সামনে, মাঝের ও পিছনের লাইনে সমান উচ্চতার ছাত্র সাজাবার জন্য। দেখা যেত আমি কম উচ্চতার দ্বিতীয় স্থানে আছি — অর্থাৎ সবচেয়ে ক্ষুদ্র বালকটির আগে স্থান পেয়েছি। সবচেয়ে ক্ষুদ্র বালকটি, জন্মগত ভাবে মেরুদণ্ড ছোট থাকা আমারই ক্লাসের বন্ধু তপন ঘোষ। ও এখন বর্ধমান ট্রেজারী অফিসে চাকুরী করে। আমরা ক্ষুদ্র আকারের হলেও আমাদের ট্রুপ লিডার শিক্ষকদের বা ট্রুপ লিডার অফিসারদের কখনও অবজ্ঞা ও ঠাট্টার পাত্র হইনি। আমাদের এন. সি. সি. ট্রুপ অফিসারদের মধ্যে আশীষদার কথা — আশিস চ্যাটার্জীর স্মৃতি ভীষণ মনে আছে। আশীষদার সারা মাঠ কাঁপানো কমাণ্ড যেন এখনও শুনতে পাই—''প্যারেড সাবধান! ডাহিনে চলে গা, ডাহিনে মোড়! তে চল্! এবং সবার শেষে — ''অফিসার্স অন প্যারেড ফর বিসর্জন''। ঠিকভাবে দাঁড়াতে, হাঁটতে, ছুটতে, কথা বলতে, বড়দের শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করতে আর শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে শিখেছি এই এন. সি. সি. হতে। তখন ভাবতাম, যদি ভারতবর্ষকে বিদেশী শত্রু আক্রমণ করে এবং সৈনিকের প্রয়োজনে স্কুলের এন. সি. সি. ছাত্রদের ডেকে পাঠায়, আমি নিশ্চয়ই তাতে যাবো। এন. সি. সি. পোশাক পরে ঐ পাঁচ বছর বাড়ি হতে হেঁটেই স্কুলে যাওয়া আসা করতাম। দু' মাইল রাস্তা। পায়ে এন. সি. সি. ভারী বুট জুতোর সোলে লোহার পাতা মারা থাকায় গট্ গট্ শব্দ করে পিচ রাস্তা ধরে সোজা হয়েই হেঁটে এসেছি। ঐ পোশাক পড়লে কিছুতেই বাঁকা হয়ে দাঁড়ানো বা হাঁটা যায় না, সেটা শ্যামাবাবু বারবার বলে দিতেন। এন. সি. সি. পোশাক নিয়মিত মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করতাম এবং জুতো, বেল্ট, টুপি, ব্যাজ পরিষ্কার রাখতাম ব্রাসো দিয়ে পরিষ্কার করে। তারজন্য কিছু পয়সা স্কুল হতে পাওয়া হত। তা পেয়ে আমাদের খুব ভাল লাগতো, অন্ততঃ কিছুদিন বন্ধুদের সঙ্গে টিফিন খাওয়া যেত। এন.সি.সি. পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু দুটি পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করেছিলাম তা মনে আছে। টাউন স্কুলে এই পরীক্ষা হয়েছিল। সেনাবাহিনী হতেও বাহিরের পরীক্ষক আসতেন আমাদের পরীক্ষা নিতে। দেখেছি সেনাবাহিনীর ঐ অফিসাররা শ্যামাবাবু ও জগজ্যোতি বাবু বা টাউন স্কুলের সুভাষবাবুকে কেমন খাতির করতেন। রাইফেল স্যুটিং হত। টার্গেট থাকতো তাতে, বুলেট ছুঁড়তে হত রাইফেল থেকে — কার টিপ্ নিখুঁত তাতে ভালো নম্বর থাকতো। তাও ভালভাবেই শিখেছি। মৌখিক প্রশ্ন ও প্যারেড স্কুলে পড়ার সুযোগে এইভাবে যত্নসহকারে সামরিক শিক্ষা পেয়ে নিজের প্রতি সম্মানবোধ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আমি তোত্লা, তায় বেঁটে খাটো, শ্যামবর্ণের। বিদ্যালয়ের অভিজাত বংশের ভালো ছেলেদের পাশে নেহাত বেমানান। সেইজন্য আমার হীনমন্যতা বোধ ছিল। কিন্তু এন. সি. সি. তে বিদ্যালয় আমাকে উদারভাবে গ্রহণ করলো, যত্ন করে শিখিয়ে পড়িয়ে আপন করে — আত্মসম্মান জাগিয়ে তুললো। আমি আত্মবিশ্বাসী হলাম। দিনে দিনে মাস্টার মশাইদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আমি সব বন্ধুদের সঙ্গে পড়াশুনার আলোচনায়, গল্পে আবৃত্তিতে দুষ্টুমিতে মিশে গেলাম। আমার আনন্দের সীমা রইলো না।

ক্রমশঃ উঁচু শ্রেণীতে উঠে চলেছি। ষষ্ঠ শ্রেণীর 'গ' বিভাগে আমাদের ক্লাস টিচার ক্ষেমাঙ্কর রাজা বীজগণিত পড়াতেন। জ্যামিতি পড়াতেন অল্পবয়সী, খর্বাকৃতি, একটু স্থূল মনিমোহন চৌধুরী মহাশয়। বোর্ডে সুন্দরভাবে এঁকে বুঝিয়ে দিতেন। আপাত রাশভারী হলেও ছাত্রদের খুব স্নেহ করতেন। উনি কয়েক বৎসর পর, WBCS পরীক্ষায় পাশ করে করে শিক্ষকতা ছেড়ে কোথাও বি. ডি. ও হয়ে চলে যান। সে সময় অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক যারা বর্ধমান সিটি কলেজে শিক্ষকতার ট্রেনিং এক বৎসরের জন্য নিতে যেতেন, তারা কেউ কেউ আমাদের বিদ্যালয়ে প্র্যাকটিশ টিচিং-এ আসতেন ৩-৪ মাসের জন্য। এরকম কিছু কিছু মাস্টার মশায়ের স্মৃতি আজও আমি মনে করতে

পারি। এই রকম প্র্যাকটিশ টিচিং-এ ষষ্ঠ শ্রেণীতে অঙ্ক করাতেন লম্বা সুদর্শন অত্যন্ত সপ্রতিভ প্রশান্ত মুখার্জী। খুব ভালো অঙ্ক বোঝাতেন। আমার সহপাঠী প্রদীপের দাদা ছিলেন প্রশান্তবাবু। তিনিও শুনেছি আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। আমাদের বিদ্যালয়ের বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক মনিমনোহন চক্রবর্তী নিতেন ইংরাজী গ্রামার, গদাধরবাবু নিতেন বাংলা। ক্লাস সিক্স ও সেভেনে দু'বছর হিন্দি পড়েছি হিন্দি শিক্ষক দুর্গাবাবু ও মৌলবী স্যারের কাছে। দুর্গাবাবু লম্বা ধুতি, পাঞ্জাবী পরা একটু ট্যারা বেশ খানদানী অভিজাত মুসলিম বংশের। ফর্সা স্থূলদেহ, সাদা পাজামা, পাঞ্জাবী পরিহিত চশমাপরা তাঁর স্নিগ্ধ হাস্যময় মুখে এক গাল সাদা লম্বা দাড়ি ছিল। হাতে একটি রূপা বাঁধালো ছড়ি নিয়ে ক্লাসে আসতেন। তার আফসোস ছিল এই যে আমরা কেউ হিন্দি না নিয়ে আরবী শিখলাম না তাঁর কাছে। বিগত কয়েক বৎসর তার কোন আরবী ছাত্র পাওয়া যায় নাই। তিনি খুব রসিক ছিলেন এবং মজার গল্প বলতেন, হিন্দি পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে। আমাদের ক্লাসে কোন মুসলমান বা খ্রীষ্টান ছাত্র ছিল না। কিন্তু তার মুখ ছাত্রদের সংস্পর্শে খুশীতে উজ্জ্বল দেখেছি। ক্লাস সিক্সে আমাদের ইংরাজী গ্রামার পড়াতেন মনিমোহন চক্রবর্তী মহাশয়। ফর্সা, সুগঠিত বলিষ্ঠ চেহারা শ্বেত শুভ্র পক্ককেশ ও ধুতি, সাদাসার্ট পরিহিত এবং মোটা কালো ফ্রেমের চশমায় আপাত গম্ভীর ছাত্র দরদী আমাদের মাস্টার মশায়। তখন বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়া প্রস্তুত করে যেতে হত। তা না হলে তাঁর বলিষ্ঠ হাতের তিনটি আঙুলের চপেটাঘাত অবধারিত ছিল।

সপ্তম শ্রেণীতে আমাদের অঙ্কের শিক্ষক দীনেশবাবু। উদাত্ত ভরাট গলা, খর্বকায় ও স্থূলকায় দেহে শ্বেতশুভ্র বাঙালি পোশাক ও চোখে কালো, মোটা, ফ্রেমের চশমা, মাথায় সুন্দর পাটকরা একমাথা কালো চুল, পায়ে নিউকাট কালো জুতো। ভালো অঙ্ক করাতেন। জ্যামিতি সুন্দর আঁকতেন বোর্ডে। আমি মুগ্ধ হতাম। অঙ্ক না পারলে রামচিমনি কাটতেন। সকলকে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হত। আপাত গম্ভীর হলেও ওনার মুখে একটা আলতো হাসি লেগে থাকতো। মাঝে মাঝে রসিকতায় ক্লাসের গম্ভীর পরিবেশ হালকা হত। তাঁর ঠিক মনে ছিল। উনি সপ্তম শ্রেণীতে আমাকে 'মঁরা' বলে ডাকতেন। আমি লজ্জিত হলেও পুলকিত হতাম। আর ক্লাসের সকলের মধ্যে এই পুলক হিল্লোলিত হত। মিউনিসিপ্যাল স্কুলের বর্ষীয়ান স্বনামখ্যাত ইংরেজির পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিবাবু — সৃষ্টিধর স্বর্ণকার আমাদের ইংরাজী গ্রামার খুব ভালো পড়াতেন। ঈষৎ খর্বকায়, কৃশকায়, শ্বেত কৃষ্ণ মিশ্রিত একমাথা কেশরাশি ও মোটা ফ্রেমের চশমা পরিহিত নিপাট বাঙালি পোশাকে ডায়াসের উপর চেয়ারে বসে ক্লাস নিচ্ছেন। বাঁ হাতের তর্জনীটি তার বসে যাওয়া বাম গালে দিয়ে কুনুইয়ে ভর দিয়ে পড়া বুঝাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ট্রানশ্লেষণ করাচ্ছেন। ডিকটেশন দিচ্ছেন। পড়া দিতে না পারলে উনি ঈষৎ বিরক্ত হতেন, অল্প বকতেন, কিন্তু কখনও কোন ছাত্রকে আঘাত করতে দেখিনি। শ্রীশক্তিপদ মহাপাত্র মহাশয়— আমাদের সপ্তম শ্রেণীর ক বিভাগ ক্লাসের শ্রেণী শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাদের ইংরাজী টেক্সবই পড়াতেন। খুব সুন্দর আকর্ষনীয় সম্ভ্রান্ত চেহারা ছিল। মাথার চুল ঈষৎ লম্বা ছিল। ধুতিটি খুব সুন্দর পরতেন। পায়ে একটু সৌখিন কালো নিউকাট জুতো। গলার স্বর সুন্দর। খুব ভালই পড়াতেন। যত দূর মনে পড়ে ছাত্রদের নিয়ে তাঁর ক্লাসে কোন গল্পের অবকাশ তাঁর হয়নি। খুব নিয়মানুবর্তিতায় তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাজীবন বাঁধা ছিল। সপ্তম শ্রেণীতে বাংলা পড়াতেন কমলবাবু শ্রদ্ধেয় কমলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। সুন্দর লালিত্যময় ভাষায় বাংলা পদ্য গদ্য পড়াতেন, ব্যাকরণ পড়াতেন। উনি আমার বাবার সহপাঠি ছিলেন রাজ কলেজের। কমলবাবু ছাড়া মিউনিসিপ্যাল স্কুলের আরও কয়েকজন শিক্ষক আমার বাবার স্কুল কলেজের সহপাঠী ছিলেন। তাঁরা হলেন পাঁচুগোপাল রায়, কালীকৃষ্ণ মিশ্র ও বিনোদীমাধব সামন্ত। সজনীবাবু বাবার চেয়ে দু বছরের সিনিয়র আর ইংরাজীর রাজেনবাবু বাবার চেয়ে দু বছরের জুনিয়ার ছিলেন, কমলবাবু সাহিত্যিক ও কবি মনা ছিলেন। স্কুলের বার্ষিক পত্রিকায় তাঁর লেখা থাকতো। আমরা ক্লাস ফাইভে বা সিক্সে পড়ার সময়েই অবনীবাবু অন্যত্র হেড মাস্টার হয়ে চলে যান। যত দূর মনে পড়ে তখন হেড মাস্টারের দায়িত্ব পড়ে যুগপৎভাবে অমিত শৃঙ্খলাপরায়ণ ছাত্র দরদী রাধিকাবাবু—রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জী এবং বিনয় কুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপর। তাঁদের দুই জনার সহায়তায় বিদ্যালয়তরণীটি সুন্দরভাবে আগুয়ান হয়েছিল। আমরা দুজন স্যারকেই প্রধান শিক্ষক হিসাবে জানতাম। আসলে তখন শিক্ষকদের মধ্যে পরস্পর বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা এত সুন্দর ছিল যে, বিদ্যালয়টি শৃঙ্খলাপরায়ণতার ও শিক্ষার উচ্চমানের নিরিখে বর্ধমান জেলার সেরা বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। রাধিকাবাবু অষ্টম শ্রেণীতে আমাদের ইংরাজি গ্রামার ও ট্রানশ্লেসনের ক্লাশ নিতেন। খর্বকায়, বিরলকেশ, মাথায়

টাক ও তার চারপাশে কোঁকড়ানো বেশি পাকা ও অল্প কাঁচা মাথার চুল, ছাঁটা গোঁফ, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা এবং হালকা গৈরিক রঙের পাঞ্জাবী ও খাটো করে পরা ধুতি ও পায়ে ভারী মোটা সোলের কালো নিউকাট জুতো পরে হাতে একটি মোটা ও ছোট বেত নিয়ে তীব্র পদচারণা করতেন বিদ্যালয়ের এক করিডর হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত — এক তলায়, দোতলায়। দেখতেন সব ক্লাসে শিক্ষক ঠিক সময়ে পৌঁচেছে কিনা। কোন শ্রেণীতে ছাত্ররা কেন অশান্ত হয়ে পড়লো। বেত হাতে দ্রুত পদে উপদ্রুত শ্রেণীর দিকে ক্রোধে হিমশীতল চোখে তাঁর ধেয়ে আসায় অনেক ছাত্রের মুখ শুকিয়ে উঠতো। উনি তখন দুষ্ট ছাত্রদের যথোপযুক্ত শিক্ষা দিতেন। ক্লাস শান্ত হত। দুষ্ট ছাত্রদের দ্বারা বিধ্বস্ত নিরুপায় শিক্ষককে তখন রাধিকাবাবুর সামনে ভারি অপ্রস্তুত ও নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তখন ১৯৬৯-৭০ সাল। স্কুলের বাহিরে তখন দেশের রাজনীাতির আঙিনা ক্রমশঃ উত্তাল হচ্ছে। তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সেই রাজনীতির উত্তপ্ত আবহাওয়ার বাহিরেই ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাইরে উত্তাল অশান্ত অবক্ষয়ের পরিবেশ বিদ্যালয়ে মাঝে ছোবল দিতে শুরু করেছিল। তখন কোন রাজনৈতিক দলের ডাকে বিদ্যালয় ধর্মঘট প্রায়ই হোত, এটা মনে আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের টানাপোড়েনে বিদ্যালয়ের পড়াশুনার আবহাওয়া ক্রমশঃ নষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তার মাঝেই দেখেছি পক্ক কেশ বৃদ্ধ রাধিকাবাবু তার বজ্রবেত নিয়ে দাপটের সঙ্গে ভীষণ সাহসে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষায় প্রাণপাত করছেন।

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে ইতিহাস পড়েছি সুপুরুষ ভারী ও উদাত্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারী ভোলানাথবাবু — ভোলানাথ ভট্টাচার্যের কাছে। দুই পায়ে জন্মগত পাতা মোড়া (club foot) ত্রুটি নিয়ে তিনি একটু খুঁড়িয়ে সোজা হেঁটে আসতেন। দুগ্ধশুভ্র ধুতি পাঞ্জাবী ও মাথায় কাঁচাপাকা লম্বা চুল উল্টিয়ে পিছনের দিকে আঁচড়াতেন। খুব সুন্দর গল্প করে ইতিহাস পড়াতেন। আমার কাকার রাজ স্কুলের সহপাঠী ছিলেন ভোলানাথবাবু। ওনার বাবা দিবাকরবাবুও রাজ স্কুলের বাংলা ও অঙ্কের এক দিকপাল শিক্ষক ছিলেন তা বাবা ও কাকার মুখে শুনেছি। ভোলানাথবাবুর গানের গলা ছিল ভরাট ও উদাত্ত। বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে প্রতি বছর করাতেন, তাতে নাটক, আবৃত্তি ও গানের মহড়ায় উনিই ছিলেন মধ্যমণি। অষ্টম শ্রেণীতে অঙ্ক শিখেছি অরুণবাবু — অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। উনি অঙ্কে ভীষণ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। ক্লাসে অঙ্ক করাবার সময় মাঝে মাঝে একটু বা উদাস হয়ে কি ভাবতেন, তা লক্ষ্য করেছি। ওনার গালে ব্রনর বেশ ক্ষত ছিল। কালো মেদহীন ছিপছিপে মাঝারী উচ্চতা, মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুলের শোভা আর চোখে অত্যন্ত বেশী পাওয়ার লেন্সের চশমার মধ্য দিয়ে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ভাবালু চোখের উদাস দৃষ্টি তাকে আমাদের থেকে অনেক দূরের মানুষ মনে হোত। অষ্টম শ্রেণীতে 'গ' বিভাগে আমাদের ক্লাস টিচার ছিলেন শ্যামাবাবু — শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি আমাদের ইংরাজি টেক্সট বই পড়তেন। উনি সকল ছাত্রের কাছেই ভীষণ প্রিয় ছিলেন। ইংরাজি বই-এর গ্রামার খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তবে ইংরাজি ক্লাস হলেও তাঁর মুখ থেকে ১৯৬৫ সালের পাকিস্তানে ভারতের যুদ্ধের লোমহর্ষক কাহিনী ম্যাপ সহযোগে বুঝে নেওয়ার প্রবল আগ্রহ ছিল আমাদের। এ যেন পাক ভারত সীমান্ত হতে সরাসরি যুদ্ধের ধারা ভাষ্য। শুনছি। আমরা স্যারের মুখে সেই ঘটনায় ভারতের জয়লাভে রোমাঞ্চিত হতাম। তাই বোধহয় স্যার আরও আমাদের কাছে বিশেষভাবে প্রিয় ছিলেন। এছাড়াও খেলার মাঠে শ্যামবাবু আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন। কালপেড়ে সাদা ধুতি ও হাত গোটানো সাদা সার্ট ও একটি সাধারণ চটি পরিহিত কৃষ্ণকায়, ছিপছিপে, ঈষৎ রাশভারি সপ্রতিভ তরুণ আমাদের প্রিয় মাস্টার মহাশয়। মাঝে মাঝে ক্লাশের বক্তৃতায় তাঁর কথাটি সম্পূর্ণ পূর্ণবাক্যে শেষ করতে পারতেন না। যেন একই সঙ্গে অনেক চিন্তা ও কথা উৎসারিত হয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মাঝে মাঝে অর্ধবাক্য ও অসম্পূর্ণ বাক্যে উনি স্থির থাকতেন। আমরা ছাত্ররাও তাঁর বক্তৃতায় এতই নিমগ্ন থাকতাম যে, অসম্পূর্ণ না বলা কথাটুকু নিজেদের মনে অনায়াসেই পূর্ণ করে নিতে পারতাম। ছাত্রদের মাঝেই ওনাকে বেশ সহজ থাকতে দেখেছি। তখন আমাদের বিদ্যালয়ে টিচার্সরুমে যে-সব সিনিয়র টিচার ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই শ্যামবাবুরও মাস্টামশাই ছিলেন। অষ্টম শ্রেণীতে বাংলা পড়েছি, ছাত্রদের সকলের প্রিয় গৌরীবাবু — গৌরীশঙ্কর সেন হাজরা মহাশয়ের কাছে। ঈষৎ খর্বকায়, বেশ ফরসা, অতিশয় লাবণ্যময় তনু, শ্বেতশুভ্র ধুতি ও সার্ট পরা নিপাট বাঙালি হাসিখুশি মধুর মানুষটি ছিলেন গৌরীবাবু। মাথায় ঢেউ খেলানো, পিছন দিয়ে আঁচড়ানো কুচকুচে কাল চুল তার গায়ের রঙের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। আমরা অষ্টম

শ্রেণীতে পড়ার সময় বছরের শুরু হতেই তিনি প্র্যাকটিশ টিচিং এ আমাদের বাংলা টেক্সট্ বই পড়াতেন। অপূর্ব বাংলা পড়াতেন। প্র্যাকটিশ টিচিং-এর নিয়ম পুরোপুরি মেনে। আমরা এখনও মনে আছে 'ভারতের দান' বলে একটি গদ্যাংশ এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'জীবনের উদ্দেশ্য' বলে দুটি প্রবন্ধ কি প্রাঞ্জল ও আন্তরিকভাবে গৌরীবাবু পড়িয়েছিলেন। তখন প্রাকটিশ টিচিং ক্লাসে শিক্ষক কেমন পড়াতে পারছেন তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ছাত্রদের অলক্ষ্যে ক্লাশের শেষ বেঞ্চিতে বি. টি. কলেজের পর্যবেক্ষক পরীক্ষক বসে পড়া শুনতেন এবং পিছনের বেঞ্চে গৌরীবাবুর রেখে দেওয়া ছোট নোটবইটিতে তাঁরা তাদের মতামত ও উপদেশ লিখে রাখতেন। মনে আছে এরকম প্রায়ই বাংলা ক্লাস হয়ে যাবার পর ক্লাসের শেষে আমরা কয়েকজন দৌড়ে পিছনে গিয়ে নোট বইটি নিয়ে আসতাম। এবং গৌরীবাবুর হাতে তুলে দিতাম। স্যারের সঙ্গে আমরাও মাথা ঝুঁকে আজ খাতায় কি মন্তব্য লেখা হল ঔৎসুক্য নিয়ে দেখতাম। স্যারের সাথে আমাদের মুখ আনন্দে ও হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। সে বছর ১৯৭০ সালে বি. টি. পরীক্ষায় গৌরীবাবু প্রথম হয়েছিলেন, আর আমরা সমগ্র বিদ্যায়তন আনন্দে ভেসেছিলাম। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে বাহিরের অন্যান্য স্কুলের শিক্ষক বি. টি কোর্সের প্র্যাকটিশ টিচিং-এ আমাদের পড়িয়েছেন। এরকম একজন শিক্ষক আমাদের বিজ্ঞান পড়াতেন। ক্লাসে স্টেজে টেবিলের উপর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মডেল সহকারে হাতে নাতে পরীক্ষা করে পরম মমতায় আমাদের কাছে বিজ্ঞান বিষয়টিকে আকর্ষণীয় করে পড়িয়েছেন। যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেখিয়েছেন— সমোচ্চশীলতা জলের ধর্ম, জলের ও বলের কোন কিছুতে চাপ, প্যাস্কালের ও আর্কিমিডিসের সূত্র। আমাদের স্থায়ী বিজ্ঞান শিক্ষকরাও বিজ্ঞান বিষয়টিকে চিত্তাকর্ষক করে পড়াতেন। এইভাবে পড়তে পড়তে আমার বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার এক সুপ্ত বাসনা জন্মেছিল, যদিও আমাদের বাড়িতে আবহাওয়া আর্টসের ছিল। ক্লাস এইটে ও নাইনে আমরা ইংরাজী পড়েছি কালীকিংকর চ্যাটার্জী মহাশয়ের কাছে। উনি গ্রামার বই পড়াতেন বেশি। রচনা লেখা শিখিয়েচেন। তিনিও ছাত্রদের বেশ প্রিয় ছিলেন, শান্ত, ফর্সা, ছিপছিপে, শুভ্র ধুতি, শার্ট ও চটিজুতো পরিহিত বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ ছাত্র বৎসল মাস্টার মহাশয়। অষ্টম শ্রেণীতে মাঝে মাঝে ইংরাজী ট্রানশ্লেশন ক্লাশ নিতেন। তখন প্রধান শিক্ষক রাধিকাবাবু। প্রায় অধিকাংশ ছাত্রকে কোন বিশেষ নামে বা বিশেষনে স্নেহভরে আদেশ করতেন ট্রানশ্লেষণ করে দেবার জন্য। না পারলে নিজস্ব ভঙ্গিতে অত্যন্ত সহজভাবে বুঝিতে দিতেন। ক্লাসের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ছেলেগুলির দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। ছাত্রদরদী অন্তরে ছাত্রদের প্রতি স্নেহ তাঁর বজ্রকোঠার ব্যক্তিত্বের আড়ালে ফল্গুধারায় বইত— তা স্মরণ করলে চোখে জল ভরে আসে। আমাকে উনি 'দাঁত পচা' বলে ডাকতেন। সাধনাদশন মাজন দিয়ে দাঁত মাজার ফলে এবং বাড়ির টিউব ওয়েলে বেশী আয়রন থাকায় আমাদের সকলেরই দাঁতে কাল ছোপ ছোপ দাগ ছিল। আমি কান পাতলে এখনও যেন তাঁর সস্নেহ আদেশ শুনতে পাই — ''এই দাঁত পচা, ট্রানশ্লেশন কর—'আজ সাত দিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে।' হাতে তাঁর ছোট ও মোটা বেত, পরনে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবীর উপর সাদা উত্তরীয় জড়ানো।

বিদ্যালয়ের বাহিরের রাজনীতির টালমাটাল অস্থিরতায় ১৯৭০ সাল পার হল। প্রচুর বন্ধ, পিকেটিং হয়েছে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে। পড়াশুনার পরিবেশ একেবারে ভেঙে পড়েছে। অষ্টমশ্রেণী পাশ করে বিজ্ঞান নিয়ে নবম শ্রেণীতে উঠলাম। রাধিকাবাবু, বিনয়বাবুরা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হিমসিম্ খাচ্ছেন। বাংলার আকাশে ভীষণ দুর্দিনের ঘনঘটা। এক প্রবল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিষ্পেষণে আমাদের মাতৃসম বিদ্যালয় হল লাঞ্ছিত ও কলুষিত। আমাদের গর্ব, আমাদের অত্যন্ত সম্মানীয় বিদ্যায়তনমাতার সর্বশরীর অগ্নিতে ভস্মীভূত করল ঘৃণ্য, নিকৃষ্ট, নরপশুর দল। মনে আছে সংবাদটা সকালেই পেয়েছিলাম বিদ্যালয় যাবার আগে। প্রাণহীন বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখি সকল মাস্টারমশাই এবং কর্মচারী ও ছাত্রদের মুখ থমথমে। সকলে শোকে মুহ্যমান। ক্রমে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ঘরের কাছে গিয়ে হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখি। কাঠের দরজা পুড়ে কালো কয়লা হয়েছে। আলমারি, চেয়ার, টেবিল, ফ্যান সমস্ত ভস্মীভূত এবং তছনছ করা। পোড়া কাগজ ও আগুনের আঁচে লাল হয়ে যাওয়া কত রেকর্ডপত্র সব ভুলুণ্ঠিত। ছাদ হতে ঝোলা সিলিং ফ্যানের ব্লেডগুলি আগুনের তাপে গলে গিয়েছে। ঘরের সাদা দেওয়াল কাল ধোঁয়ায় লিপ্ত হয়েছে। আমাদের প্রিয় বিদ্যালয়কে কারা এরকমভাবে অপমানিত করল। এই ধংসাত্মক উন্মাদনায় আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। আমাদের সবার মন গভীর শোকে হায় হায় করে উঠল। আমার ভীষণ কান্না পেল। হে ভগবান! আমাদের এই সর্বনাশ কারা, কি উদ্দেশ্যে করল। ভয়ার্তচিত্তে চারিদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে

ছিলাম।

বেশ কিছুকাল লেগেছিল মাতৃদেবীর অপমানের গভীর দুঃখ সামনে নিতে। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন বেশ কিছু বড় মানুষের বিদ্যালয়ের রেকর্ড সবই ভস্মীভূত হয়েছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোস, সুকুমার সেন সবাই যে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। গভীর দুঃখের আঁধার কাটিয়ে আবার ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রাণ শক্তির প্রকাশে বিদ্যালয়ের দিনগুলি অতিবাহিত হতে থাকলো। তবে এবার বিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসে বেশ কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের অসভ্যতায় স্কুলের সেই দুঃস্বপ্ন আজও মনে আছে। সমস্ত বিদ্যালয় সহ আমাদের বিদ্যালয়েও গণ টোকাটুকির প্লাবনে সমস্ত ছাত্র দল ভেসে গেল। আমরা বন্যায় জলের স্রোতের মত নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলাম। শিক্ষাক্ষেত্রে এ এক কলঙ্কময় অধ্যায়। রাজ কলেজেও দেখেছি '৭৪, '৭৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এই গণ টোকাটুকি। আমাদের বিদ্যালয়েও এই আঁচ আমার নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় অর্ধ বার্ষিকী পরীক্ষায় পেয়েছিলাম। বিদ্যালয়ে কিছু উঁচু ক্লাসে পরীক্ষায় গণ টোকাটুকিতে শৃঙ্খলা পরায়ণ রাশভারী শিক্ষকের বাধা দানের ফলস্বরূপ ১৯৭১ সালে বিদ্যালয়ে অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষা উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা ভণ্ডুল করল। পরীক্ষা চলাকালীন কপালে রক্ত তিলক পরে দল বেঁধে ক্লাসে ঢুকে আমাদের পরীক্ষার খাতা ছিঁড়ে ফেলে দিল। আমরা সাধারণ ছাত্ররা হতভম্ব হয়ে গেলাম। এক বুক কান্না দলা পাকিয়ে গলার কাছে আটকে গেল। বাষ্পাকুল চোখে ছিঁড়ে ফেলা আমার ইংরাজী খাতাখানা আমি বাড়ি এনে বাবাকে দেখিয়েছিলাম। হা ভগবান! আমরা এই অন্ধকার জীবন থেকে কবে মুক্তি পাব। আবার বিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হল। বিনয়বাবু, রাধিকাবাবুরা কেমন ত্রস্ত, মিইয়ে গেছেন। শিক্ষকরা শঙ্কিত। এক ভীষণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। নামী, রাশভারী শিক্ষকের ক্লাসেও বোর্ডে এবং দেওয়ালে বড় করে ভোজালি আঁকা। এ এক মধ্যযুগীয় অবস্থা। এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেরা এবং আমাদের বেশীর ভাগ ছাত্ররা বিদ্যালয় তরণীতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছিলাম। আমরা মনে প্রাণে শৃঙ্খলা প্রত্যাবর্তনের পিয়াসী ছিলাম। এইভাবে কয়েকমাস কাটার পর আমাদের হৃত মনোবল ফেরাতে ও দুর্যোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সহায়তা করতে অমিত সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী 'জোয়ান অফ আর্ক' এর মত উদয় হলেন আমাদের প্রিয় নতুন হেড মাস্টার আমাদের ত্রাণকর্তা অমর সিং মহাশয়। বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের ঠাণ্ডা করতে তাঁর খুব কম সময়ই লেগেছিল। আবার বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ফিরে এল। এবার প্রতি পিরিয়ডে আলাদা খাতায় রোল কল চালু হল। ক্লাসে সর্বাধিক নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত না থাকলে তার পরীক্ষায় বসার অনুমতি মিলত না। দুধ সাতা ধুতি পাঞ্জাবী পরা, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা ও পায়ে কালো নিউকাট জুতো, মাথায় একটু লম্বা চুল ঈষৎ পিছনের দিকে সুন্দর ভাবে পাট করে আঁচড়ানো, সুমুখশ্রী, সুদর্শন, স্পষ্ট, সুমিষ্ট, স্নেহশীল অথচ আদেশযুক্ত কণ্ঠস্বর তিনি সকলের কাছে বিদ্যায়তনের কাণ্ডারী হয়ে উঠলেন। তার কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে বিদ্যালয়ের দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলাম।

নবম ও দশম শ্রেণীতে আমরা কোর গণিত শিখেছিলাম অঙ্কের প্রগাঢ় পণ্ডিত প্রবীণ কালিবাবু — শ্রী কালীকিংকর চ্যাটার্জী মহাশয়ের কাছে। তাঁর কাছে বোধহয় এর আগে সপ্তম শ্রেণীতে পাটিগণিণত শিখেছিলাম। আমাদের স্কুলের অন্যান্য বিদগ্ধ অঙ্কের শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয়বাবু, অনিলবাবুরাও বোধহয় তাঁর ছাত্র ছিলেন। তখন সায়েন্স, আর্টস, কর্মাস সব শাখার নবম-দশম শ্রেণীতে কোর গণিত অবশ্য পাঠ্য ছিল। স্থূল, কৃষ্ণাঙ্গ, রাশভারি, কেশ ও সাদা, ছাঁটা পুষ্ট গোঁফ ও মোটা কালো ফ্রেমের চশমার ভিতর তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে যুগপৎ ভয় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হত। তাঁর কাছে অঙ্কে শতকরা ষাট পেলেও ক্লাসের সেরা ছেলেরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত। উনি খুব ধূমপান করতেন। ক্লাসের বাহিরে বারান্দায় তাঁকে মাঝে মাঝে ধূমপান করতে দেখেছি। তাঁর গোঁফ জোড়া সে কারণে হলুদাভ দেখতাম। নবম শ্রেণীতে আমাদের বাংলা পড়াতেন স্বনামধন্য বাংলা শিক্ষক রামহরিবাবু—শ্রী রামহরি চট্টোপাধ্যায়। আমার যে এবার উঁচু শ্রেণীর ছাত্র এবং সুললিত সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করেছি, রামহরিবাবু তাঁর নিজস্ব পড়ানোর ঢঙে বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের রস আস্বাদনের আনন্দ বাল্যরসকে পরিণতি লাভ করেছিল একাদশ শ্রেণীতে সন্তোষবাবুর কাছে বাংলা পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে। রামহরিবাবু কবিমনা ছিলেন। 'কাকলি'তে প্রতিবছর তার বিদগ্ধ চিত্তের প্রতিফলন দেখে পুলকিত হতাম। মাঝারি উচ্চতার ঈষৎ স্থূল, স্বল্প ..., সাদা নিখুঁত বাঙালি পোশাকে ভরাট দরাজ গলায় স্নেহময় সুললিত

কণ্ঠে উনি মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতেন। সেই শ্রেণীতে আমরা ইংরাজী শিখেছি ইংরাজীয় দিকপাল রাজেনবাবু — শ্রী রাজেন্দ্রনাথ নাগ মহাশয়ের কাছে। তিনি নবম ও দশম শ্রেণীতে বিভিন্ন সাহিত্যের বই থেকে সুন্দর অনুচ্ছেদ লিখে তা থেকে ইংরেজি তর্জমা শেখাতেন। ইংরাজী রচনা, চিঠিপত্র, সংক্ষিপ্ত সার সব লেখা তার কাছে সুন্দরভাবে শিখতাম। ধোপ দুরস্ত ধুতি, পাঞ্জাবী ও শৌখিন চপ্পল, মাথায় ঢেউ খেলানো লম্বা পাকা চুল ব্যাক ব্রাশ করে আঁচড়ানো চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, লম্বা সুঠাম মেদহীন চেহারা, বাঁহাতে সোনালী চেনবাঁধা ঘড়ি — কখনও বা কোনদিন ডানহাতে তা বাঁধা; এবং কাছে গেলে গা থেকে সুন্দর সেন্টের গন্ধ পাওয়া যেত। বেশ হাসি খুশি, ইংরাজী পড়ানোর সময় সমস্ত ক্লাসকে 'ইনভলভ্' করিয়ে পড়াতেন। প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ীর ট্রানশ্লেষণের কাজ ক্লাসে টেবিলে নিজের কাছে ছাত্রকে ডেকে এনে পরীক্ষা করতেন এবং সংশোধন করে তা বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর দামী কলমের সোনালী লাল কালিতে সংশোধন করা খাতাগুলি থেকে এক সুন্দর সুগন্ধ পাওয়া যেত। মাঝে ক্লাসের ছাত্ররা কিছু গোলমাল করলে বিরক্ত হতেন, রেগেও যেতেন। কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্য। ওনাকে আমরা ভয় ও শ্রদ্ধা ভীষণভাবেই করতাম। স্কুলের বাইরে অস্থিরতা যাই ঘটুক না কেন আমাদের বিদ্যালয় সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল। ইংরাজী টেক্সট্ বই থেকে রাজেনবাবু আমাদের Gift of the Majai পড়ান। ডেলার সোনালী চুলের সঙ্গে Golden Cascade এর তুলনা, জিমের পরিবারের ঐতিহ্যময় সোনার ঘড়ি তাদের পরস্পরের ভালবাসার সাহিত্যিক বিশ্লেষণ। কি অপূর্ব সুষমায় পুরোপুরি ইংরাজিতে সুললিত ব্যাখ্যা করেন তা এককথায় অনবদ্য। এই সময় কিছু তুলনামূলক সাহিত্যের আলোচনাও করতেন যাতে ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। মনে আছে, বাইবেলের কিছু ঘটনাও সহজ ইংরাজীতে আমাদের ক্লাসে বলেছিলেন এই গদ্যাংশটি প্রসঙ্গে। দশম শ্রেণীতে আমরা বাংলা পড়েছি স্বনামখ্যাত বাংলা শিক্ষক পাঁচুবাবুর কাছে। খর্বকায়, কৃশ, বিরল কেশ, গায়ের রং তাম্রাভ, সদাহাস্য সংকলন বই, পদ্য, গদ্য, পড়াবার সময় তার সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ পেত। তবে ছাত্ররা তার দুর্বল, স্নেহশীষ মনের সুযোগে পড়ার পরিবেশ মাঝে মাঝে নষ্ট করত। দুষ্ট ছাত্রের পিঠে তাঁর উদ্যত ছড়ি স্নেহময় পিতার কোমলতায় মৃদু আঘাত করত মাত্র, আর ছাত্রও সেই ছড়ি অনায়াসে নিজের হাতে ধরে ফেলত। শেষে হতাশ হয়ে পড়ানো বন্ধ রেখে নোট নিতে বলতেন। তাতে কাজ হোত। চতুর ছাত্ররা জানতো, দশম শ্রেণীর বাংলা প্রশ্নপত্র পাঁচুবাবুর হাতে। ভাল নম্বর পেতে হলে তাঁর নোটের ভাষায় বাংলা বিদ্যা জাহির করা একান্ত আবশ্যক। পাঁচুবাবু রাঢ় বাংলার সুসাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। অনেক পরে বর্ধমান সাংস্কৃতিক পরিষদ তাঁকে সম্মানে ভূষিত করেছিল তা আমি রবীন্দ্রভবনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে দেখেছি।

নবম শ্রেণী হতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে আমাদের ক্লাস চলেছে। তাতে পদার্থবিদ্যা পড়িয়েছেন মিহিরবাবু, রসায়নবিদ্যা মহাশয় প্রদ্যুৎবাবু, জীববিদ্যা সাহানাবাবু আর অঙ্ক মৃত্যুঞ্জয়বাবু ও অনিলবাবু পড়িয়েছেন। নিয়মিতভাবে তাঁর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আমাদের বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের চেষ্টা আন্তরিকভাবে করেছিলেন। ঋজু, লম্বা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ধুতি পাঞ্জাবী পোশাকে রাশভারি মিহিরবাবু — মিহিরকিরণ সাঁই আমাদের একাই পদার্থবিদ্যা শিখিয়েছিলেন। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ঠিকমত না করতে পারলে অসীম ধৈর্য্যে ছাত্রের কাছে তা পরীক্ষা করে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর কাছে আমাদের কোন ফাঁকি দেবার জো ছিল না। মনে আছে, হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় বাহিরের পরীক্ষকের সামনে। আমাদের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে উনি তাঁকে মৌখিক পরীক্ষা নিতে আহ্বান করেছিলেন। মিহিরবাবুর রাশভারি ব্যক্তিত্বের গভীরে গভীর ছাত্রপ্রীতি ফল্গুধারায় বইত। রসায়ন পড়েছি আমরা প্রধানতঃ প্রদ্যুতবাবু— শ্রী প্রদ্যুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এবং খানিকটা বিমলবাবু বিমলকুমার মহাশয়ের কাছে। তবে বিমলবাবু প্রায়ই অসুস্থ হওয়ায় সে সময় তাঁর সান্নিধ্য আমরা বেশিদিন পাইনি। তাঁর মত রসায়নে প্রগাঢ় পণ্ডিত সে সময় বিরল ছিল। প্রদ্যুতবাবু আমাদের শাসন ও ভালবাসার মধ্যে সুন্দরভাবে রসায়নের পাঠ দিয়েছেন। তখন প্রদ্যুতবাবু একটু বা স্থূল হয়েছেন। দীর্ঘদেহী, সার্টপ্যান্ট পরা, উচ্চকণ্ঠে আমাদের রসায়ন শিক্ষা দিতেন। ছাত্রদের উপর তার শাসন কখনও শিথিল হয়নি। অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। এক তলায় রসায়নগারের ল্যাবরেটরিতে তাঁর সান্নিধ্যে হাতে নাতে পাঠ নিতে বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতাম আমরা সবাই। আমাদের বায়োলজি পড়াতেন সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয়। খুব আমুদে, ক্ষীণকায়, মাঝারি ক্লাসে আসতেন। খুব গভীরে হয়ত পড়াতে পারতেন না। তবে তাঁর ক্লাসে বেশ আনন্দ সহকারে শিক্ষা পেতাম। দুতলার উপরে এককোণের ঘরে

তখন বায়োলজির ল্যাবরেটারি ছিল। সেখানে তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বায়োলজি বুঝাতেন। মোমের ট্রের উপর কেঁচো, ব্যাঙ ব্যবচ্ছেদ করাতেন। ঐ ল্যাবরেটারির লাগোয়া পার্টিশান দেওয়া ঘরে উনি বিদ্যালয়ে থাকতেন। চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী গোপালদা আমাদের ঐ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে অনেক সহায়তা করেছে।

দশম শ্রেণীতে ক্লাস টিচার ছিলেন কালীকিংকর মিত্র মহাশয়। তিনি আমাদের দশম ও একাদশ ক্লাসে ইংরাজী টেক্সট্ বই পড়াতেন। এছাড়াও দশম শ্রেণীতে সমাজবিদ্যাও পড়িয়েছেন। কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ ও আপাত রাশভারী এই শিক্ষকের ছাত্রপ্রীতি অবিশ্রান্ত ফল্গুধারায় বইত। ধবধবে সাদা পাটভাঙা ধুতি, শার্ট ও শাল গায়ে মাথায় ছোট করে ছাঁটা কাঁচা পাকা খোঁচা চুলে ও কালো মোটা ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে তাঁর গভীর অন্তর্ভেদী, গম্ভীর হিমশীতল দৃষ্টিতে অনেক তাবড় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের ঔদ্ধত্যকে নিমেষে শান্ত হতে দেখেছি। তাঁকে কখনও বেত হাতে দেখিনি। কিন্তু তাঁর ধীর পদক্ষেপে ঋজু দেহের উপস্থিতি এবং ক্রুদ্ধ চোখের চাহনি এবং 'এই শুয়ার' চিৎকার উন্মত্ত পরিবেশ শান্ত করতে যথেষ্ট ছিল। ক্লাসে পড়ানোর সময় সময়-মতো বেশ হাসিখুশি ও রসিকতার সঙ্গেও পড়াতেন। ছাত্রদের সঙ্গেও তার রসিকতা চলত। আমরা তা ভীষণ উপভোগ করতাম। নীচু ক্লাসে স্যার মাঝে মাঝে প্রক্সি ক্লাসে আসতেন। আর তাতে অবধারিত ছিল তাকে ভূতের গল্প বলার জন্য আমাদের বায়না করা। তিনি ছাত্রদের দাবী সম্পূর্ণরূপে মেটাতেন। তাঁর নানা ভূতের গল্প জানা ছিল। একটা ভূতের গল্প পুরো শেষ করতে একটা সম্পূর্ণ পিরিয়ড লাগতো। উনি ওনার নিজস্ব ভঙ্গীতে রহস্যময় ও আতঙ্কময় ভূতের গল্প তাঁর সুকুমতি ছাত্রদের তারিয়ে তারিয়ে শুনাতেন আর স্নেহময় চোখ দিয়ে অল্প বয়স্ক ছাত্রদের ভয়ভীতি মিশ্রিত মুখের ভাব ভাল ভাবে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তা দারুণ উপভোগ করতেন। দশম শ্রেণীতে উনি প্রথম পিরিয়ডে ইংরাজী পড়াতেন। খুব ভালো ইংরাজি টেক্সট্ বই গ্রামার সহ অবলীলায় সুন্দর বোঝাতেন। মনে আছে, R. L. Stevension এর The Old Sea Dog এবং The Country Cricket Match কি অপূর্ব পড়াতেন। ইংরাজী পড়াতে পড়াতে ইংরাজী সাহিত্যের ও সাহিত্যিকদের পরিচয় বা খবর সুন্দরভাবে দিতেন। ওনার উপদেশ মত তাই Treasure Island পড়ে ফেলেছিলাম। শেক্সপিয়রের নাটকগুলি Charls Lambএর অনুবাদে ইংরাজীতে পড়ার আদেশ ছিল। ওখান থেকে Analysis পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনার কথাও বলে দিয়েছিলেন। উনি অকৃতদার মানুষ ছিলেন। তাই বোধহয় ছাত্রদের পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমার কাকা অকালে অসুখে মারা যান। বাৎসরিক পরীক্ষায় নেওয়া মাথায় পরীক্ষা দিচ্ছি, কারণ জানতে চাইলে তা বলতে ওনার ব্যথিত দৃষ্টি আজও ভুলিনি। ''হ্যাঁরে, ক্যানসার হয়েছিল?''— আজও কানে বাজে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ভোলানাথবাবু। তিনিও আমাদের হল এ গার্ড দিচ্ছিলেন।

আমাদের বিদ্যালয়ে তখন বেশ কিছু দিক্‌পাল অঙ্কের শিক্ষক মহাশয়দের সমাবেশ। কালীবাবু, মৃত্যুঞ্জয়বাবু, অনিলবাবু, দীনেশবাবু, অরুণবাবু, আমরা সেইসময় ভাগ্যবান ছিলাম। আমাদের নবম দশম ও একাদশ শ্রেণীতে অঙ্ক শিখিয়েছেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী অঙ্কের জাহাজ মৃত্যুঞ্জয়বাবু — মৃত্যুঞ্জয় খাঁ মহাশয়। দু'জনের পড়ানোর পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। আমরা বেশ কিছু ছাত্র ছিলাম অঙ্কে মাঝারি হতে দুর্বল জাতির ছাত্র। তাই আমাদের পিছিয়ে পড়া দুর্বল ছাত্রদের কাছে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর অঙ্ক শেখাবার পদ্ধতি প্রিয়তর ছিল। নবম শ্রেণীর অঙ্ক ভীতি ও দুর্বলতা মৃত্যুঞ্জয়বাবুর অপূর্ব পাঠন পদ্ধতিতে দশম ও একাদশ শ্রেণীতে আমি কাটিয়ে উঠেছিলাম এবং অঙ্ক আমার কাছে প্রিয়তর বিষয় হয়েছিল। ক্লাসে অনুশীলনীর কয়েকটি বিশে, ধরণের অঙ্ক উনি বোর্ডে করিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। বাকী অঙ্ক সমস্তই আমাদের ক্লাসে করতে দিতেন এবং প্রত্যেকের আসনের কাছে গিয়ে তার খাতা পরীক্ষা করতেন, ভুল করলে সংশোধন করে দিতেন জলদ গম্ভীর স্বরে উদিষ্ট ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে। তাঁকে ক্লাসে কখনও বসতে দেখিনি। এখনও যেন কানে শুনতে পাই, 'স্টেপ জ্যাম্প করেছিস্ কেন? প্রত্যেক স্টেপ ধরে ধরে কর। না হলে যে কোন সময় ভুল হয়ে যাবে।" আমরা কে আগে তাড়াতাড়ি অঙ্ক করতে পারি তার একটা অলিখিত কম্পিটিশন হত ক্লাসে। মাঝারি উচ্চতার, মধ্যপ্রদেশ বেশ স্থূল, আঁটসাঁট করে কাপড় পরা ও ঢিলে সাদা পাঞ্জাবীতে আদ্যন্ত বাঙালি আদর্শ শিক্ষক। চোখ দুটো একটু বড় বড় ও গোল গোল, মাথায় লম্বা ও হালকা কালো চুল পরিপাটি করে দু'পাশে আঁচড়ানো, তেল চুকচুকে। পায়ে নিউকাট কালো চামড়ার জুতো। উনি আমাদের জ্যামিতি, বীজগণিত, স্থানাঙ্ক জ্যামিতি, পরিমিতি সমস্তই পড়িয়েছেন। জ্যামিতি ও প্রশ্নের এক্সট্রা

জ্যামিতিগুলি অপূর্ব আঁকতেন বোর্ডে বড় কম্পাস দিয়ে এবং সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন। একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে ধাপে ধাপে বোঝাতে বোঝাতে অঙ্ক বা জ্যামিতি শেষ করতেন যাতে শ্রেণীর সবচেয়ে দুর্বল ছাত্রটি অনায়াসে বুঝতে পারে। তিনি অঙ্কের সত্যিই যাদুকর ছিলেন।

অনিলবাবুর গণিতে মনীষা অতুলনীয়। তিনি বোর্ডে নিজেই অনুশীলনীর অধিকাংশ অঙ্কই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কষে ছাত্রদের বোঝাতেন। ছাত্রদের কাছে এসে তাদের খাতায় তারা কি বুঝতে পেরেছে বা অঙ্ক করতে পারছে কিনা খোঁজ নিতেন না। তাই বেশ কিছু ছাত্র অঙ্কে ফাঁকি দিত। অনেকে বুঝতেও পারতো না। ক্লাসের শেষের দিকে একটু আধটু তাই গোলমাল হত। অনিলবাবু তাই মাঝে বিরক্ত হয়ে তাদের শাসন করতেন। মাঝারি উচ্চতার গৌর শরীরে মাথায় হালকা কোঁকড়ানো চুল ও বলিষ্ঠ দেহী আত্মপ্রত্যয়ী, বড়ই স্নেহশীল আমাদের অনিলবাবু। মাঠে এন. সি. সি.-র কুচকাওয়াজে ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার তত্ত্বাবধানে তাকে নিয়মিত নিরলস ভাবে নিযুক্ত দেখেছি।

একাদশ শ্রেণীতে আমাদের ইংরাজি পড়িয়েছেন আমাদের বিদ্যালয়ের সার্থক কাণ্ডারী শ্রী অমর সিংহ মহাশয়। তাঁর সুমিষ্ট অথচ তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বরে 'King Arthur' কবিতাটি এখনও কানে বাজে। তার ইংরাজি সাহিত্যের জ্ঞানের ব্যাপ্তি ক্লাসে ইংরাজী পদ্য, গদ্য বা রচনা প্রকাশ বা ইংরাজি ট্রানশ্লেষণ শিক্ষা দানে বিশেষভাবে পেয়েছি। বাইরে বজ্রের মতো কঠোর হলেও যথার্থ সুপুরুষ ও ছাত্র দরদী কোমল মনের মানুষ ছিলেন। এই শ্রেণীতে আমরা বাংলা পড়েছি সন্তোষ গোস্বামী মহাশয়ের কাছে। বাংলায় তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ওকালতিও পাশ করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষকতাকেই তিনি জীবনের আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। খুব সাত্ত্বিক ও ছাত্র দরদী মানুষ ছিলেন। বৈষ্ণবদের মত তাঁর গৌর সুন্দর মুখমণ্ডলে তিলক কাটা থাকতো। সুন্দরভাবে প্রাঞ্জলভাষায় অলঙ্কারময় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা বিজ্ঞান পড়া ছাত্রদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম ছিলেন।

আমাদের বিদ্যালয়ের মূল্যবান লাইব্রেরী হতে আমরা নিয়মিত নানা বিষয়ে ও গল্প বই নিয়ে পড়তাম। মোহিনী মোহন চক্রবর্তী মহাশয় ছিলেন আমাদের বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান। তিনি ভীষণ আত্মভোলা প্রকৃতির ছিলেন। মনে আছে এই লাইব্রেরী থেকে আমি সাগরময় ঘোষের 'একটি পেরেকের কাহিনী' গল্প বইটি পড়েছিলাম। বইটি একটি সাধারণ ছেলে বদ্যিনাথের চোখে দেখা মহান মানুষ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনী। অসাধারণ বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম তা আজও মনে আছে। অনেক মাস্টার মশাইদের দেখতাম নিয়মিত লাইব্রেরীতে পড়াশুনা ও লেখালেখি করছেন।

নীচু ক্লাসে আমাদের কাঠের কাজ নামে বৃত্তি শিক্ষার একটি ক্লাস করতে হত নগেনবাবু — শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায়ের তত্ত্বাবধানে। শুকনো কাঠকে যন্ত্র সহযোগে মসৃণ করা আমাদের এক ভীষণ ভীতির কর্ম ছিল। প্রায়ই নগেনবাবুর সস্নেহ বকুনি খেয়েছি। তবে কাঠের কাজের প্রশিক্ষণ গৃহে আমাদের চতুর্থশ্রেণী কর্মচারী নীলমণিদার কর্মচারীরা আমাদের কাছে আত্মীয়ের অধিক ছিলেন। তাদের সকলকেই আমরা 'দাদা' হিসাবে সম্বোধন করতাম এবং তাঁদের কাছে আমরা নানারকম আবদার করে আমাদের কাজ হাসিল করতাম। তারাও হাসিমুখে তা সহ্য করতো। এই রকম বিপিনদা, বলরামদা, শিবুদা, গোপালদা, পণ্ডীতজী, কেষ্টদা, নীলমনিদার কথা আজও স্পষ্ট মনে করতে পারি। শিবুদার কাছে ক্লাসে সংখ্যায় কয়েকজন বেশি ছেলে এসেছে রোলকলের পরে, এই বলে বাড়তি টিফিন নিয়ে আসার জন্য আমাদের কেউ কেউ প্রবল অনুরোধ ও তোষামোদ করত। টিফিন বিলির শেষে বাড়তি টিফিন একটু পাবার জন্য আমাদের মধ্যে একটু হুড়োহুড়ি হত।

বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা ও তার সঙ্গে বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ে ছাত্রদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আনন্দযজ্ঞে উপস্থিত থাকায় এবং পরদিন দুপুরে একসাথে ঘরের বেঞ্চিতে বসে খিচুরি খাওয়ার এক দুর্বার আকর্ষণ প্রত্যেক ছাত্রের থাকতো। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আবৃত্তি পাঠ, গান ও নাটকের মহড়া প্রায় এক মাস পূর্ব হতে শুরু হত ভোলানাথবাবুর নির্দেশনায়। আমরা আমাদের এই বাৎসরিক আনন্দ অনুষ্ঠান সদলবলে প্রাণ ভরে উপভোগ করেছি। আমাদের শিক্ষকরাও এই অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন। আন্তঃবিদ্যালয় বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা মাঝে আমাদের বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় প্রতিবার আমাদের ছাত্ররা প্রথম হয়ে পুরস্কার পেয়েছে। মনে আছে একবার জ্যোতির্বিদ্যায় উপর এইরূপ বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় আমাদের এক বৎসরের অনুজ অত্যন্ত মেধাবী অভিজিৎ তরফদার বাংলায় সেরা প্রথম পুরস্কারটি গ্রহণ করে।

আবৃত্তি, বিতর্ক, বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যাতে ছাত্ররা অনুপ্রেরণা পেয়ে এই সব বিষয়ে আগ্রহী হয় তার জন্যই আমাদের শিক্ষকরা এইরূপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন।

বিদ্যালয়ের সেই সময়ের উজ্জ্বল ছাত্রদের আমি দেখেছি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তারা কি পড়াশুনায়, কি খেলাধূলায় বা অন্য কিছুতে সবেই সেরা থাকতো। আমরা নীচু ক্লাসে পড়তে উজ্জ্বলদাকে — উজ্জ্বল সিদ্ধান্তকে দেখতাম। সর্ব বিষয়ে চৌকস ছাত্র ছিলেন। হায়ার সেকেণ্ডারীতে সে বছর উনি ভীষণ ভালো ফল করেছিলেন। উনার বাবা ড. সিদ্ধান্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে এক পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। বর্তমানে উজ্জ্বলদা বর্ধমানের স্বনামধন্য ডাক্তার। আমাদের এক বছরের বড় ছিলেন সুগত দা — সুগত হাজরা। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল মিষ্টি ছাত্রটি ছিলেন। উনি বাইরে কোন ব্যাঙ্কে উচ্চপদে আসীন। আমাদের এক বছরের অনুজ অভিজিৎ তরফদারের মেধার সমতুল্য কেউ ছিল বলে মনে হয় না। হায়ার সেকেণ্ডারীতে ওর দারুন ফল আমাদের বিদ্যায়তনের মুখ উজ্জ্বল করেছিল। ও পরবর্তীকালে আমাদের দেশের খ্যাতনামা সফল চিকিৎসক হয়েছে। এখন ও পোস্ট গ্রাজুয়েট পি.জি. হাসপাতালে নেফ্রলজী বিভাগের দেশে সাহিত্যের আঙিনায় ও তরুণ সাহিত্যিক। অভিজিৎ খেলাধূলাতেও ভাল ছিল।

আমি ১৯৭৪ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী (এগার ক্লাস) পাশ করি। বিজ্ঞানে ছত্রিশজন ছাত্রের সবাই উত্তীর্ণ হয়। আমরা বারো জন প্রথম বিভাগ পাই। ঊনিশজন দ্বিতীয় বিভাগ। বাকী চারজন তৃতীয় বিভাগ পেল। সবচেয়ে মেধাবী দীনু—অর্থাৎ আমাদের সকলের প্রিয় দীনবন্ধু ভট্টাচার্য হল প্রথম। ও সম্ভবত প্রথম কুড়ি জনার মধ্যে ছিল। চপল - চপলকান্তি ঘোষমণ্ডল, তুষার—তুষার চৌধুরী, সলিল - সলিল সাউ, প্রবীর— প্রবীর দত্ত, শ্রীমান ভট্টাচার্য্য ইত্যাদিরা সব পরে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে — প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সময় পিছনের বেঞ্চে আমার পাশে বসা সর্বক্ষণের প্রিয় সঙ্গী সলিল খুব ভালো ফুটবল ও বাস্কেটবল খেলতো। ও খুব স্বল্পবাক্ ও সরল ছিল। ওরা পিঠোপিঠি তিন ভাই-ই আমাদের স্কুলে পড়ত। কৃষ্ণেন্দু ও বদ্যিনাথ কল্যাণীতে গেল কৃষিবিদ্যা নিয়ে পড়তে। আমাদের ক্লাসের মেধাবী সবচেয়ে শান্ত স্বল্পবাক, সুশ্রী, গৌর ও বন্ধু বৎসল বন্ধু অমিতাভ — অমিতাভ চ্যাটার্জী হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় পরের বছর রক্তে ক্যান্সার হয়ে অকালে ঝরে গেল। অনেক ছাত্র গেল বিজ্ঞানের সাধারণ শাখায় বা আর্টস নিয়ে কলেজে। আমি গেলাম রাজ কলেজে রসায়ন নিয়ে পড়তে। পরের বছর তা ছেড়ে মেডিকেলে ভর্তি হলাম। দীনু সব কিছু পেয়েও সব ছেয়ে রসায়ন নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাশ করেছিল স্নাতকোত্তর কোর্স। ও পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে প্রশাসনে যোগদান করে। এখনও সরকারের অতি উচ্চপদে আসীন। সাহিত্যের অঙ্গনে তার বিস্তৃত প্রকাশ ঘটেছে। আমার শ্রেণীর কারো কারো সঙ্গে আজও কখনও কখনও দেখা হয়। তার সাথে কথোপকথনে বিদ্যালয়ের পুরনো স্মৃতি নিয়ে মধুর স্মৃতিচারণ করি। আমি প্রায় অর্ধ শত বৎসর অতিক্রম করে চলেছি। মাথার চুলের রং বদলাচ্ছে। আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে বিদ্যালয়ের আঙিনা ছেড়ে পা বাড়িয়েছিলাম পরিপুষ্ট মনে, আত্মবিশ্বাসী হয়ে। বিদ্যালয়ে আমার অতিক্রান্ত সাত বছর আমি প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করেছি। আমাকে একেবারে নতুন রূপে গড়ে বাইরের বৃহত্তর বিদ্যার অঙ্গনে সস্নেহে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার প্রিয় এই বিদ্যায়তন। বিদ্যালয়ের মধুর স্মৃতি আমাকে ঘিরে থাকে। আধো জাগা, আধো ঘুমে স্বপ্নে তাই বা কখনও যেন শুনতে পাই সেই স্বর — রাধিকাবাবুর — ''দাঁত চাটা, কি ট্রানশ্লেষণ করলি খাতাটা নিয়ে আয় দেখি।'', শ্যামবাবুর রুদ্ধস্বর — ''স্বাধীনতা মানে যা খুশি তা করা নয়। কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ না হলে স্বাধীনতা রক্ষাও করা যায় না। শৃঙ্খলাহীন পশুর জীবন আমরা ঘৃণা করি।'' কালীবাবুর সস্নেহ স্বর — ''হ্যাঁরে, কাকার ক্যানসার হয়েছিল'' স্কুলের মাঠে আশীষদার সারা মাঠ কাঁপানো কমাণ্ড ''অফিসার্স অনপ্যারেড, সাবধান!''

আমার স্কুল ঃ কিছু স্মৃতি, কিছু স্বপ্ন

সত্যদর্শন দত্ত

পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষেরই আর যা কিছু থাকার ব্যাপারে পার্থক্য বা তারতম্য থাক না কেন, একটা ব্যাপার বোধহয় দেশ-জাতি-ভাষা-লিঙ্গভেদে সমান– তা হল প্রত্যেকরই আছে বাবা ও মা। এত যে সাধারণ সার্বজনীন ব্যাপার, তবু প্রত্যেকটি মানুষের কাছেই তার নিজের বাবা-মাটি যেন অনন্য, অসাধারণ। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি' – লাইনটি একজন বাঙালি কবির কলম থেকে বেরিয়ে এলেও দুনিয়ার তাবৎ মনুষ্যকুলের নিজের নিজের জন্মভূমির প্রতি মনোভাব, আর্তি, আবেগ মূলত সেই একই। একজন মানুষের মনের মণিকোঠায় সেই রকমই ভুলতে না পারার জায়গাটা অবশ্যই দখল করে থাকে তার একান্ত নিজস্ব বিদ্যায়তন, যেখানে দিনের পর দিন তার পৃথিবীকে উপলব্ধি করার জ্ঞানের চোখটা খুলেছিল, তাইতো তার স্থান আর এক মায়ের — নাম তার Almamater.

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের ১২৫ বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মরণিকা। অনন্তকালের পরিধিতে ১২৫ বছরটা অকিঞ্চিৎকর হলেও একটা স্কুলের ইতিহাসের নিরিখে সেটা একেবারে ফেলনা কিছু নয়। এই ১২৫টা বছর ধরে বিদ্যালয়ের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে এসে জগৎ-সংসারের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়া কয়েক লক্ষ প্রাক্তনী, যাদের মধ্যে অনেকেই আজ এই মরজগতের সীমারেখাটাও পেরিয়ে গেছেন, সেই অসংখ্য নামের ভিড়ে বর্তমান লেখকের, যে কিনা ১২৫ বছরের মধ্যে মাত্র তিনটি বছর মাতৃরূপিনী বিদ্যালয়ের স্নেহচ্ছায়ায় ঘোরাফেরা করার সুযোগ পেয়েছিল, সে আর জননীস্বরূপা স্কুলটার ১২৫ বছরের লোলচর্মের বলিরেখাগুলোর কতটুকুই বা চিনতে পড়তে পারল? তবু সামান্য যে আঁচ বা ঝলক তার গা ছুঁয়ে চলে গিয়েছিল তারই আভাসটুকু দশজনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার অক্ষম প্রয়াস, এই আর কি।

১৯৫৯ সালে আমি যখন ক্লাস নাইনে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে এলাম সি.এম.এস. স্কুল ছেড়ে তখন স্কুলের ভূগোলটা ঠিক আজকের মতো ছিল না। খুঁটিনাটি মনে থাকা সম্ভব নয়, ভুল হলে ক্ষমা করবেন, তবে উল্লেখযোগ্য যেটা মনে পড়ে সেটা হল এখনকার স্কুলের মাঠের দক্ষিণ দিকটায় ছিল একটা পুরনো বিল্ডিং। এখনকার স্কুল বিল্ডিং-এর মাঠ পেরিয়ে বাক্সধাঁচের পুরনো বিল্ডিং-এ এসে উঠতে গেলে বিরাট চওড়া বেশ কিছু ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হতো, পুরনো বিল্ডিং-এর অপর দিকে আবার ওইরকমই সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামনেই ঢলদিঘির ঘাট। ঢলদিঘির বিস্তার তখন বিশাল, এখনকার মত চারপাশের কংক্রীটের চাপে দমবন্ধ অবস্থা ছিল না। যতদূর মনে পড়ছে এদিকটায় তেমন কোনও বাউণ্ডারি ওয়াল ছিল না; দক্ষিণ পশ্চিম কোণের একটা বিরাট ঝাঁকড়া গাছের নিচ দিয়ে দুপাশে পুকুরের মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা ধরে আমরা রাধানগর—তেলমারুই অঞ্চলের ছেলেরা মোটা ক্যাম্বিস কাপড়ের ব্যাগ কাঁধের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে ঝুলিয়ে কাবলি জুতো পায়ে হেঁটে হেঁটে স্কুলে আসতাম। পুরনো বিল্ডিং-এ আর একটা আশ্চর্য জিনিষ ছিল টানাপাখা – ক্লাসঘরের সিলিং থেকে ছাত্রদের মাথার ওপরে খসখসের চওড়া পাটি এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়াল পর্যন্ত ঝুলত, ক্লাসরুমের বাইরে টুলে বসে একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী কপিকলের ওপর দিয়ে পার করা দড়ি ধরে টানতে টানতে কখন যে ঘুমে ঢলে পড়ত তা সে নিজেও জানতে পারত না।

স্কুলের মাস্টারমশাই বা সহপাঠীদের কথা বলতে গেলে স্বভাবতই কয়েকজনের কথা বলতে গিয়ে বহুজনের কথাই না বলা থেকে যাবে। প্রথমেই সাফাই গেয়ে রাখি যাঁদের কথা বলা হল না, তাঁরা যে কোনও অংশে ন্যূন, অন্ততঃ আমার দৃষ্টিতে, এ কথা যেন কেউ ভুলেও মনে না করেন। আসল ব্যাপার হল এক-স্থানাভাব আর দুই – আমার স্মৃতির দুর্বলতা।

মাস্টারমশাইদের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই যাঁর কথা মনে আসে তিনি হলেন তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল স্কুলের কিংবদন্তী প্রধান শিক্ষক রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা

স্কুলে ভর্তি হবার পর বোধহয় বছর দুয়েক ওঁকে পেয়েছিলাম। একজন ছোট্টখাট্ট চেহারার গায়ে ধুতি শার্ট পায়ে কেড্‌স জুতো পরা মৃদুভাষী মানুষের কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে যে সেই মানুষটি শব্দহীন পায়ে একবার ক্লাসরুমগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে সমস্ত স্কুলটায় সূচীপতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে পারে তা এযুগের শিক্ষক-ছাত্রেরা কল্পনাও করতে পারবে না, মনে হবে গল্পকথা বলছি। রাধাকান্তবাবুর খাস পিওন ছিল বিপিনদা, ঘন্টা পড়ে যাবার পরেও হয়তো কোনও ছাত্র ক্লাসে ঢোকেনি, বাইরে গেটের কাছ থেকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ক্লাসে ঢুকে পড়ে ঘাপটি মেরে বসে পড়েও কি রেহাই আছে? রাধাকান্তবাবুর নির্দেশে বিপিনদা ঠিক ছেলেটির পিছন পিছন এসে সঠিক ছেলেটিকে সনাক্ত করে 'তোমাকে ডাকছেন' বলে পাকড়াও করে নিয়ে যায় হেডমাস্টারের ঘরে। ছেলের তো তখন প্যান্ট নোংরা করে ফেলার অবস্থা।

শৃঙ্খলাপরায়ণতার অপর নাম রাধাকান্তবাবু। তবে যতটাই ছিলেন শাসনে কঠোর, ততটাই স্নেহে কোমল। স্কুল থেকে অবসর নেবার পর যখন রাধাকান্তবাবু তেঁতুলতলা বাজারের একটি মেসের তিনতলার চিলেকোঠার ঘরের বাসিন্দা, একদিন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি। একথা সেকথার পর উনি আমাকে জিগ্যেস করলেন 'স্কলারশিপটা ঠিকমতো পাচ্ছ তো?' স্কলারশিপ মানে সি.এম.এস. স্কুল থেকে ক্লাস সিক্সের বৃত্তি পরীক্ষায় পাওয়া মাসিক পাঁচটাকা জলপানি, পড়াশুনা চালাতে যেটা পাওয়া আমার একান্ত দরকার আর সেটা পাওয়ার আশাতেই আমাকে ক্লাস ফাইভে সি.এম.এস. স্কুলে ভর্তি হতে হয়েছিল। আর মাত্র বছর দুয়েক মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র হিসেবে আমাকে জানলেও রাধাকান্তবাবু তার খবর রাখতেন। স্কুল পাল্টানোর দরুন বৃত্তিটা পেতে আমার কিছু অসুবিধে হচ্ছিল তাও জানতেন আর সে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এই ছিলেন আমাদের সময়কার শিক্ষক তথা প্রধানশিক্ষক। শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

আমার মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ভর্তি হবার পিছনে যে মাস্টারমশাই-এর উদ্যোগ ভোলবার নয় তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় কালীকৃষ্ণ মিত্র। আমার দুই দাদা মিউনিসিপ্যাল স্কুলের কৃতি ছাত্র ছিলেন এবং সেই সূত্রে কালীবাবু আমাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। ফ্রি স্টুডেন্টশিপ সহ স্কলারশিপের সব রকম ব্যবস্থা করে দেবার আশ্বাস দিয়ে তিনিই আমার বাবাকে বলে সি.এম.এস. স্কুল থেকে ট্রান্সফার করিয়ে আমাকে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ভর্তি করান। এরই সঙ্গে আরও একজন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে তিনি ট্রান্সফার করিয়ে নিয়ে এলেন নবগ্রাম স্কুল থেকে। তার নাম অপূর্বকৃষ্ণ মিত্র, যে পরে দুর্গাপুর আর.ই. কলেজের ফিজিক্সের প্রফেসর হয়েছিল। সে বছর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে নবম শ্রেণিতে উঠেছিল বহিলাপাড়ার মজুমদার বাড়ির ছেলে তপন। ক্লাস নাইনে তপন, অপূর্ব ও আমি তিনদিক থেকে আসা তিন ছাত্রের মধ্যে কালীবাবু উসকে দিতেন লেখাপড়ায় প্রতিযোগিতার মনোভাব, যেটা কিন্তু মোটেই ব্যক্তিগত রেষারেষির নয়। এই ছিল তাঁর টেকনিক। আমরা ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র, কালীবাবু মূলত আর্টসের টিচার ছিলেন, আমাদের ক্লাস কমই নিতেন। কিন্তু আমার ও অপূর্বর প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ার সঙ্গতি নেই জেনে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের দুজনকে শুধু বিনা পারিশ্রমিকে ইংরাজি ও বাংলা প্রাইভেট পড়াতেন তাই নয়, আমাদের যখন যা প্রয়োজন বই-খাতা-কলম এমনকি জামাকাপড়ও পর্যন্ত কিনে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে পিতার দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা নেই। আজকে আমি পরিচয় দেবার মত যদি কিছুমাত্র হয়ে উঠতে পেরে থাকি, তা যে তিনি না থাকলে হয়তো সম্ভব হয়ে উঠতো না একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে আমার কোনও দ্বিধা নেই। রাধাকান্তবাবু ও কালীবাবুর প্রসঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার এসে পড়ায় আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এগুলো না বললে আমি অপরাধী থেকে যেতাম। আমি নিজে ব্যক্তিগত স্তরে মাস্টারমশাই-এর কাছে অপরিশোধ্য ঋণপাশে আবদ্ধ তো বটেই, তবে আমার আশেপাশের সময়কার বর্ধমান শহরের কোনও কৃতি ছাত্র বিরল যে কালীবাবুর কাছে প্রাইভেট পড়েনি। সারাজীবন অকৃতদার ছাত্রবৎসল স্যারের প্রয়াত আত্মার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অন্যান্য স্যারেদের মধ্যে যারা আমাদের বিজ্ঞান বিভাগে পড়াতেন তার মধ্যে মনে পড়ে ইংরাজির শান্তিবাবু, কখনও রাধিকাবাবু বা রাজেনবাবু, বাংলার পাঁচুবাবু ও সন্তোষবাবু, অঙ্কের মৃত্যুঞ্জয়বাবু, কালী চ্যাটার্জী স্যার, ফিজিক্সের দিনেশবাবু, কেমিস্ট্রির বিমলবাবুর নাম। পাঁচুবাবুর বাংলা ব্যাকরণ পড়ানোর কায়দা ভোলবার নয়। ওঁর বাংলা আর শান্তিবাবুর মুখে পান আর চুন, নাকে নস্যি গুঁজে ইংরেজি পড়ানোর গুণে আর 'ওরে বাবা, ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে গেছে কেন জানিস্? ও সব গান্ধিজিও নয়, নেতাজিও নয়, তোদের ইংরেজি বলার বহর দেখে

মাতৃভাষার অপমান সহ্য করতে না পেরে পালিয়েছে'– ব্যাঙ্গোক্তির কষাঘাতে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও আজও দু-লাইন ইংরেজি-বাংলা লিখতে বলতে পারি। অন্য সকল স্যারের সাথে তাঁরা আমার প্রণম্য। বিমলবাবুর কেমিস্ট্রি পড়ানোর স্টাইল যে আমাকে পরবর্তী জীবনে ওই বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মৃত্যুঞ্জয়বাবু অনিলবাবুর হাতে মার খায়নি যে গুটিকতক অতি সৌভাগ্যবান অথবা হতভাগ্য ছাত্র আমরা কয়েকজন ছিলাম তাদের অন্যতম। হতভাগ্য এই জন্যে বলছি, তখনকার দিনে একটা দৃঢ়মূল বিশ্বাস ছিল যে স্যারদের হাতে মার না খেলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। ছড়ি বা ডাস্টার তো শুধু দেহে ক্ষতই সৃষ্টি করে না, স্নেহের গভীর ছাপও রেখে যায় মনে, পরবর্তীকালের মননে। আমাদের সময়ে স্কুলে জয়েন করলেন শ্যামাবাবু, এসেই ছাত্রদের মন জয় করলেন ভিনি-ভিডি-ভিসি কায়দায়। মূলত কলা বিভাগের শিক্ষক হলেও পরিবর্ত শিক্ষক হিসেবে বিজ্ঞানের ক্লাসে এসে তাঁর ক্যাপ্টেন ব্যোমগার্ডেনের গল্প বলা আজও কানের মধ্যে অনুরণন সৃষ্টি করে। ফুটবল খেলার মাঠে তাঁর ধুতি গুটিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছোটাছুটিও ভোলবার নয়। ইলেভেন ক্লাস (তখনকার উচ্চমাধ্যমিকের শেষ বছর) ফিজিক্স পড়াতে আসতেন রাজ কলেজের অধ্যাপক সাতকড়িবাবু। তাঁর পুত্র উৎপল আমাদের সহপাঠী হিসেবে শুরু করেও নিজগুণে তখনও ক্লাস টেনেই শিকড় গেড়েছে। বালকসুলভ চাপল্যে তার সঙ্গে তার পিতৃদেবের ক্লাসে পড়া ধরার অত্যাচাররূপ গুণপণা নিয়ে যে রসালো আলোচনা চলত, সে প্রসঙ্গ এই বৃদ্ধবয়সে এখানে আর না তোলাই ভাল। ক্লাস নাইন পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃত পড়তে হয়েছিল। সেখানে পেয়েছিলাম পণ্ডিতমশাই অশ্বিনীবাবু ও কালী মিশ্র মশাইকে। দ্বিতীয়জন ছাত্রমহলে ব্যোমকালী নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বোধহয় যুগে যুগেই হাসি-তামাসার পাত্র হয়ে এসেছেন সর্বত্রই। অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না, যদিও তাঁরা বহুদিন আগেই ক্ষমা-মার্জনার সীমা ছাড়িয়ে পাড়ি দিয়েছেন চিরশান্তির দেশে। স্পোর্টসের মাঠে বিনোদীবাবুর দাপট আর বিনয়বাবুর জলদগম্ভীর স্বরে 'A bit improvement this year' এখনও স্বপ্নের মধ্যে গমগম করে ওঠে। রাজেনবাবুর মতো ধোপদুরস্ত ফিটফাট এবং সংস্কৃত থেকে শুরু করে ফিজিক্স-ম্যাথমেটিক্স পর্যন্ত অনায়াস অবাধ বিচরণকারী শিক্ষক কি আর কখনও আসবেন? আরও অনেকের কথাই মনে পড়ে, স্মৃতিকথার কলেবরের দিকে তাকিয়ে নিবৃত্ত হলাম।

আমার সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিল অপূর্ব মিত্র, সুভাশিস দত্ত (চাঁপা দত্তের ছেলে), বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী (জহরবাবুর ভাইপো), আবুল খায়ের, আবদুর রহিম, তুষার ও তপন মজুমদার, অভিজিৎ মুখার্জী, অমর দত্ত, প্রবাল শীল, অমর পাল আরও অনেকের সঙ্গে। এদের মধ্যে অমর দত্ত পরবর্তীকালে কলেজ-ইউনিভারসিটি জীবনে একই বিষয় নিয়ে পড়ার সূত্রে আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে সকলের কাছেই পরিচিত হয়েছিল। চাকরি ও পারিবারিক জীবনে না জানি কি অজানা অভিমানবশত সিন্ধ্রির সার কারখানায় চাকরিরত অবস্থায় সে নিজের জীবনটাকে সংক্ষিপ্ত করে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তার স্মৃতি আজও আমায় শয়নে-স্বপনে তাড়া করে বেড়ায়। স্কুলের নিচু ক্লাসে খুব ভাল ফল না করতে পারলেও আমাদের ব্যাচে স্কুল থেকে সায়েন্সে যে চারজন ছাত্র প্রথম বিভাগে পাশ করেছিল, অমর দত্ত ছিল তাঁদের অন্যতম এবং পরবর্তী জীবনে আরও প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককুলের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছিল। আজকের ছাত্ররা কি কল্পনা করতে পারবেন কোনও একটি বছরে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে মাত্র চারজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ? প্রবাল অবসর নেবার দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে চাকরি করে বন্ধুত্ব অটুট রাখার সুযোগ দিয়েছে।

ক্লাসের পড়ুয়া ছাত্র হিসেবে পরিচিতি থাকলেও খেলোয়াড় বা অন্যান্য সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে আমার বেশ প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্কই ছিল। তাদের মধ্যে মনে পড়ে দুই ভাই বরুণ ও তরুণ পালের কথা, আরও দুই ভাই অপরেশ (নানি) ও বিপিন (বাঁটু) মিত্রের কথা, ওদেরই খুড়তুতো ভাই চন্দ্রশেখর (চাঁদু) মিত্রর কথা, শান্তি বাগ, সত্য রায় আরও কত জনের কথা। কুঁজোরও তো মাঝে মাঝে চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে যায়– সেই ইচ্ছের তাড়ায় একবার ফুটবল মাঠের সাইডলাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য্য হয়ে লক্ষণরেখাটা ডিঙিয়ে ঢুকে পড়তে চেয়েছিলাম মাঠের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে বরুণের ধমক – অ্যাই, তুই কি খেলবি? যা, পড়গে যা। ব্যাস্, আমার খেলার ইচ্ছের ফানুসটা ফট্ করে ফেটে গেল। গত পুনর্মিলন উৎসবেও শান্তি বাগ মটোরসাইকেল নিয়ে পদযাত্রার আগে আগে গেছে, প্রতিটা মিটিং অ্যাটেন্ড করেছে। তার মতো লংডিস্ট্যান্স রাণারের চলতে কষ্ট এটা

যেমন অবিশ্বাস্য লাগতো, তার থেকেও অবিশ্বাস্য লাগল একদিন সন্ধ্যোবেলাতে মিটিং অ্যাটেন্ড করে যাবার পরেও যখন পরের দিনই শুনলাম শান্তি বাগ আর নেই। স্পোর্টস্‌ম্যান কাকে বলে তার জ্বলন্ত উদাহরণ শান্তি। শান্তির আত্মা শান্তি পাক্।

খেলার মাঠের সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। স্পোর্টসে শর্ট-ডিসট্যান্স রান আর হাইজাম্প সহ চারটে ইভেন্টে সত্য রায় ফার্স্ট। ওদিকে চারটে থ্রো ইভেন্টে বরুণ পাল আর চারটে লং ডিস্ট্যান্স রানে শান্তি বাগ ফার্স্ট। তিনজনেই একসঙ্গে চ্যাম্পিয়ন, বছরের পর বছর। ভাবা যায়? স্কুল স্পোর্টসে তো বটেই, সাব-ডিভিশন্যাল এমনকি ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসের মাঠের সাইডলাইনের বাইরে কাতারে কাতারে ছেলেদের ভিড়, পিছন থেকে গুঁতো মেরে সামনের সারিতে এসে ভালভাবে দেখার অদম্য উৎসাহ আমার মত বইমুখো ছেলেরও। তেমনি উন্মাদনা ফুটবল ম্যাচ ঘিরে। মিউনিসিপ্যাল স্কুল বনাম টাউন স্কুল অথবা বাণীপীঠের খেলা থাকলে তো মাঠ ভেঙে পড়তো দর্শকে। কি ফুটবল টিমে, কি স্পোর্টসে উচ্চতা অনুসারে সিনিয়ার, ইন্টারমিডিয়েট ও জুনিয়ার তিন স্তরে প্রতিযোগিতা হত। মাঝে মাঝে উচ্চতার কারচুপি নিয়ে যে ঝগড়াঝাটি হত না, তা নয়। এখন গোটা স্কুল ঝেঁটিয়ে কি এগারোজন ফুটবল প্লেয়ার বা স্পোর্টসের প্রত্যেক ইভেন্টে কমপিট করার মত তিনটে করে অ্যাথলিট বেরুবে? সন্দেহ হয়।

অফিস স্টাফদের সঙ্গে আমাদের তেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না, কারণ আমাদের মাইনে আদায়ের কাজটা ক্লাসে ক্লাসটিচারই করতেন। তবু যতদূর মনে আছে অতুলবাবু নামে একজন অফিসে বোধহয় বড়বাবু ছিলেন, তারপর বোধহয় গুরুপদবাবু এসেছিলেন। লাইব্রেরিতে মোহিনীবাবু বলে একজন টাকমাথা লাইব্রেরিয়ান থাকতেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের কদাচিৎ মোলাকাত হত লাইব্রেরিতে গল্পের বই আনতে বা ফেরত দিতে গিয়ে। গল্পের বই বলতে তখন 'ডন কুইকসোট', 'হাঞ্চব্যাক অফ নোতরদোম', 'গ্যালিভার ট্যাভেলস্' – এই জাতীয় কালজয়ী বিদেশি সাহিত্যের বাংলা অনুবাদের বই আমাদের বরাদ্দ ছিল। কচ্চিৎ কেমন উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা 'স্বপনকুমার' বা 'দস্যু মোহন' সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনী বা থ্রিলার পেতো। এগুলো আমাদের কাছে তখনও ছিল প্রায় নিষিদ্ধ পাঠ্যের তালিকাভুক্ত। তাই তা নিয়ে কাড়াকাড়ির অন্ত থাকতো না। সহায়ক কর্মচারিদের মধ্যে আমাদের কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির কেষ্টদার সঙ্গে বিশেষ ভাব ছিল। কেষ্টদা আমাদের পরম যত্নে হাতে ধরে কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল করতে ও শিখতে সাহায্য করতেন। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের মধ্যে শিবুদা ও পণ্ডিত (হরেকিষণ) আমাদের বিশেষ প্রিয় ছিল কারণ প্রথমজন টিফিন দিয়ে যেতো ও দ্বিতীয়জন ছুটির ঘন্টা বাজাতো। শ্যামাদা (মাস্টারমশাই) ও কেষ্টদার হাতে হাতে মিলিয়েই এখনও 'চিরন্তনী'-র কাজ করতে পারছি, এটা আমার গর্বের জায়গা।

এরকম অজস্র মুখের মিছিল মনের ভিডিও ক্যামেরার স্ক্রিনের ওপর দিয়ে সরে সরে যায়। তাদের কেউ বা ক্লোজআপে, কেউ লংশট। কেউ ফেড ইন তো কেউ ফেড আউট। একজন ফোকাসে আছেন তো অন্যজন হয়তো আউট অফ ফোকাস। কিন্তু সকলেই গণ্য, সকলেই মান্য। আজকে স্কুলের ১২৫ বর্ষপূর্তিতে নামোল্লেখ করা বা না করা সব্বাইকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

স্মৃতির ঝাঁপি খুলে আবোল-তাবোল অনেক তো বকা হল, এবার স্বপ্নের অ্যালবামটা একটু মেলে ধরি। আমার বড় সাধ আবার ফিরে আসুক শিক্ষক-ছাত্রের সেই শাসন-অনুশাসন-স্নেহের মিঠে-কড়া দিনগুলো, সেই খেলার মাঠের উপচেপড়া ভিড়ের সঙ্গে কান-ফাটানো আওয়াজ, সন্ধ্যেবেলা মাঠের আলোচনা করতে করতে বাড়ি ফিরে ঢুলতে ঢুলতেও নিয়ম করে পড়তে বসা, বাড়ির গুরুজন এমনকি পাড়ার বয়োঃজ্যেষ্ঠরা কোনও বেচাল দেখলে কান মলে দিতে পারেন সেই ভয়ে তটস্থ থাকার দিনগুলো। সেই সোনার খাঁচার দিনগুলি যদি ফিরে আসে তো কেমন হয়? ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ভুলে আমরা সকলে মিলে যদি চেষ্টা করি, ফিরিয়ে আনতে পারি না কি সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো? স্মৃতির সরণি বেয়ে স্বপ্নের রাজপ্রাসাদে যদি পৌঁছুতে পারি, ক্ষতি কি? তাতে আখেরে কিন্তু তোমার-আমার সকলেরই লাভ, একটু ভেবে দেখতে বলি। অবশ্যই উন্নত প্রযুক্তির হাত ধরাধরি করেই এগোবে মানবিক মূল্যবোধের গাড়িটা, নয়তো ছিটকে যেতে হবে। কিন্তু ভালবাসার শ্রদ্ধার নাড়ির টানকে ট্যারাচোখে দেখে পাশ কাটিয়ে দিনে দিনে আমরা যে গাড়িটার সওয়ার হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি, তা থেকে শেষপর্যন্ত তো বেরিয়ে আসছে দলে দলে শিক্ষিত সুদক্ষ রোবট, মানুষ কোথায়?

আমার দেখা আমার বিদ্যালয়

ড. শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জী

জীবনের প্রান্তসীমায় এসে ফেলে আসা দিনগুলিকে ফিরে দেখি, অনেক ঘটনাই মনে পড়ে। কোনটা স্পষ্ট, কোনটা অস্পষ্ট। স্মৃতির পথ বেয়ে আসে ছাত্র জীবনের নানান রঙের দিনগুলি। অতীত হয়ে যায় 'এই তো সেদিন'।

১৯৪৫ সালের ভয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধ তখনও চলছে। যুদ্ধ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ তখন বাংলাকে করেছিল বিপর্যস্ত। সেই সময় স্কুলে ভর্তি হলাম। তখন তিন জায়গায় বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন চলতো। আমরা পড়তাম এক কুঠীতে যার নাম ছিল 'কক্সসেড'। এই কুঠীটির অবস্থান ছিল বর্তমান টাউন স্কুলের পূর্বে।

যে মানুষটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তিনি হলেন আমার শ্রেণীশিক্ষক আশুতোষ চৌধুরী। মানুষটি ছিলেন বড় আগেপ্রবণ। শিক্ষকরা ছিলেন ছাত্রদরদী। এই বছরের সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো জাপানের আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধের অবসান। ওই দিন বিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করা হলো। পরের দিন আমাদের সরকারি ব্যয়ে মিষ্টি খাওয়ানো হলো। এই দিনটায় বিদ্যালয়ে ছিল আনন্দের রেশ। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে ভয়াবহ দিনগুলির হয়েছিল অবসান।

যুদ্ধশেষ হলো কিন্তু দেশে এলো না শান্তি। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত করেছিল বাংলাকে। দাঙ্গা ছড়ালো বাংলার গ্রামে গঞ্জে। তার আঁচ এলো বর্ধমানে। তখন আমরা পড়ি বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়িতে। সেদিন ছিল জন্মাষ্টমী। বর্ধমান ছিল অশান্ত। বিদ্যালয়ে আসা ছাত্রদের সংখ্যা ছিল কম। বিদ্যালয়ে ছিল একটা চাপা ভয়ের ভাব। ছুটির পর আমরা বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছি। শিক্ষকেরাও স্কুলেই ছিলেন। অভিভাবকেরা আসতে পারছেন না আমাদের নিয়ে যেতে। শেষে পড়ন্ত বেলায় অশান্তি থামলে আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম। জনমানবশূন্য ছিল রাস্তা। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো প্রধান শিক্ষক পি.এন. নস্করের বিদ্যালয় হতে বিদ্যায় নেওয়া। ইনি ছিলেন একজন নিয়মনিষ্ঠ প্রশাসক। আচার আচরণে ছিল সাহেবীয়ানা। প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকলেও শিক্ষকদের পরিচালনায় বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন পুরোদস্তুর চলতে লাগলো।

রক্ত পিছল পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো স্বাধীনতার দিনটি। বিদ্যালয়ে উঠলো স্বাধীন ভারতের পতাকা। এই দিনে স্কুলে হয়েছিল একটি অনুষ্ঠান। স্বাধীনতার তাৎপর্য না বুঝলেও ওই দিনে দেশব্যাপী আনন্দের রেশ, আমাদের মনে এনেছিল দারুণ খুশির ভাব।

ক্লাস করতাম বর্তমান বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের ঘরে। তখনও ওই ঘর ছিল এই স্কুলের অংশ। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় স্কুল হতে বিদায় নিলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন বাণীপীঠ স্কুলের। স্কুলের শিক্ষক বামাপদবাবু ও সমধীশবাবু বাণীপীঠে যোগ দিলেন। অনেক ছাত্রও বাণীপীঠে পড়বার জন্যে স্কুল ছাড়লো।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হলো। পাকিস্তান নামে নতুন রাষ্ট্র তৈরি হলো পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশ হলো। দলে দলে হিন্দুরা পূর্ব বাংলা ছাড়লো। ভারতের সীমান্ত তাদের জন্যে খুলে দেওয়া হলো। শিক্ষক হিসাবে পদ্মার ওপার হতে আসা বিজনবাবু, রতীশবাবু, শ্রীশবাবু, অতুলবাবু বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন।

এই সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ফণিভূষণ চন্দ্র। তিনি ওপার বাংলার মানুষ। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের উৎকর্ষের দিকে তার নজর ছিল। বিদ্যালয়ের সংস্কার কাজ চললো তাঁর তত্ত্বাবধানে। বিদ্যালয়ের ভাঙা অংশ মেরামত

হলো। নতুন চেয়ার, বেঞ্চ শ্রেণিকক্ষের ভাঙা আসবাবপত্রর স্থান নিলো। সর্বত্র ছিমছামভাব। গ্রন্থাগারটির আমূল পরিবর্তন হলো। পুরানো বইগুলো কে সাজানো হলো নতুন আলমারিতে। অনেক নতুন বই গ্রন্থাগারের জন্যে কেনা হলো। সুযোগ্য গ্রন্থাগারিক চণ্ডী সাঁইয়ের উপরে গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণের ভার দেওয়া হলো। বইগুলি বর্ণনানুক্রমিক রীতিতে সাজানো হলো। বর্তমানে একতলার হলঘরের একদিকে গ্রন্থাগার ও অপরদিকে ছিল ছেলেদের পড়ার ঘর। ছেলেদের পড়ার উৎসাহ বাড়াবার জন্যে পড়ার ঘরে থাকতো দৈনিক খবরের কাগজ, পাক্ষিক পত্রিকা ও ছোটদের ইংরাজি বাংলার গল্পের বই। বিজ্ঞান পড়ার উৎসাহ দেবার জন্য বিদ্যালয়ের একটি ঘর পরীক্ষাগার হিসাবে নির্দেশিত হলো নতুন যন্ত্রপাতি কেনা হলো। ঘরটিকে সাজানো হলো। ফণিভূণবাবু কোন এক অজ্ঞাত কারণে বিদ্যালয় ত্যাগ করলেন। শুনেছিলাম তিনি কলকাতার কোনো এক বিখ্যাত মহাবিদ্যালয়ে অংকের শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছেন।

রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হলেন। মিতভাষী অকৃতদার মানুষটি আমাদের অংক ও বিজ্ঞান পড়াতেন। শীর্ণ মানুষটির ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। শিক্ষক ও ছাত্রদের সহযোগিতা পেতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি।

রাধাকান্তবাবুর আমল স্কুলের আর এক স্বর্ণযুগ। স্কুলের ছাত্রদের শৃঙ্খলাবোধের সাথে এল পঠন-পাঠনের উৎকর্ষ। পৌর বিদ্যায়তন জেলার শ্রেষ্ঠ স্কুলে পরিণত হলো। ছেলেদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ এতই প্রবল ছিল যে স্কুল চলাকালীন সময়ে ছাত্রদের হৈহুল্লোর শোনা যেত না।

সে সময় বিদ্যালয় ঘর ছিল একতলা। বিদ্যালয়ের সীমানা নির্দেশক পাঁচিলের ভগ্নাবশেষ ছিল পূর্বদিকে। পূর্বদিকেই ছিল আম, জাম, লিচু গাছ। দক্ষিণে ঢলদিঘির বিস্তার। পিটুলি, করমচা, পলাশ গাছ যেমন স্কুলের দক্ষিণ সীমা নির্দেশ করছে পশ্চিমে ছিল একটি গাছ যাকে মহীরূহ বলা যায়। উত্তরে ছিল বিশাল বট গাছ ও একটি আমগাছ। বটগাছের গুঁড়ি লাগাও একটি বড় পাথর। এই পাথরখণ্ডে অজানা ভাষায় খোদাই করা কিছু লিপি। এই প্রস্তর লিপি এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। বড়গাছের তলায় ছিল জলঘর। সেখানে জালা ও কলসীভর্তি জল রাখা হতো ছাত্রদের জন্যে। বিদ্যালয়ের এক অশিক্ষক কর্মচারীর ভার ছিল ছেলেদের জল খাওয়ানোর। আর একটি ঘরে রাখা হতো খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম। জিটি রোড হতে রাণীগঞ্জ বাজার যাওয়ার সহজ রাস্তা ছিল বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের মাঝখান। যাতায়াত ছিল অবাধ। মাঠের মাঝখানে ছিল একটি কুঠীঘর এখানেও বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ছিল। এর দক্ষিণ দিকের ঘরে ছিল এ.আর.পি. অফিস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখান হতে জাপানী বিমান আক্রমণের সংকেত দেওয়া হতো। বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে সাইরেনের মাধ্যমে বর্ধমানবাসীকে সাবধান করা হতো। বিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে ঢলদিঘির স্নানের ঘাট ছিল। স্কুলের মাঠ পেরিয়ে স্নান করতে যাবার উপর ছিল না কোন বিধিনিষেধ।

শিক্ষকদের সকলেই ধুতি পাঞ্জাবি পরে স্কুলে আসতেন। কারো কারো ঘাড়ে থাকতো পাট করা চাদর। অতি অল্প মাইনেতে এঁরা স্কুলে পড়াতেন। এঁরা দরিদ্র কিন্তু কখনও কর্তব্যকর্মে অবহেলা দেখাননি। শিক্ষাদানই ছিল তাঁদের বৃত্তি। এঁরা যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনি ছিল তাঁদের ছাত্রদের উপর কর্তৃত্ব। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক স্নেহভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁরা ছিলেন ছাত্রদের হৃদয়ের প্রেরণাদাতা ও অবসরের সুহৃদ। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের উপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করা হতো। গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হতো না, এরা চাইতেন সুশিক্ষকরূপে পরিচিত হতে। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের কতটা আত্মিক সংযোগ ছিল তা দেখা গিয়েছিল শান্তি চট্টোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে। বর্ধমান এত বিশাল শোক মিছিল-এর আগে দেখেনি। শিক্ষক ও ছাত্রগণ চোখের জলে তাঁকে চিরবিদায় দিয়েছিল। ছাত্র শিক্ষকের মধুর সম্পর্কের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সেদিন স্থাপিত হয়েছিল।

শিক্ষকদের পাঠদানে ছিল গভীর আগ্রহ, একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা আজও মনে পড়ে হরিপদবাবু, নরেন কোঁয়ার মহাশয়ের উদাত্ত কণ্ঠে কবিতাপাঠ। আমরা একতান মনে শুনতাম। শান্তিবাবু ও রাজেন্দ্রনাথ মহাশয়ের ইংরাজি পড়ানোর রীতিটি ছিল খুব সহজ ও সরল। তার ফলে ভাষাটি আমাদের আয়ত্তে আনতে সময় লাগেনি। রাধাকান্তবাবুর কাছে শিখেছি সহজ উপায়ে অংক করার কৌশল। ফকিরবাবু অংক শেখাতেন গল্প ও ছড়ার মাধ্যমে। কালী মিত্র মহাশয়ের ইতিহাসের গল্পগুলি ছিল চিত্তাকর্ষক। নরেন গাঙ্গুলির চেয়ে ভালো ভূগোল শিক্ষকের সংখ্যা বিরল। সহজ সরল শিক্ষণপদ্ধতি সম্বন্ধে যে এঁরা কত চিন্তা করতেন তা ভাবলে

বিস্ময় জাগে। সংস্কৃত শিক্ষক কালী মিশ্র ছিলেন আপনভোলা মানুষ এবং পণ্ডিত সমাজের বহু প্রশংসিত ব্যক্তি। নিত্যানন্দ কোঁয়ার ও সূর্য বক্সী ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। স্কুলের শিক্ষার মান উন্নয়নে এঁরা নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন। ক্রীড়া শিক্ষক বিনোদীমাধব সামন্ত নিজে ছিলেন একজন বড় খেলোয়াড়। তৈরি করেছিলেন অনেক কৃতি ক্রীড়াবিদকে।

শিক্ষার উৎকর্ষের সাথে সাথে খেলাধূলা উন্নত মানে পৌঁছিয়ে ছিল। এ্যাথলেটিক্সে সূর্য দে, সত্য রায় সব্যসাচী চৌধুরী, ফুটবলে দেবাশিস কোঙার, হকিতে সজল ব্যানার্জী, ভলিতে বরুণ পাল, দেবকুমার ঘোষ, বাস্কেটে অরিন্দম বটব্যাল, সাঁতারে অলিফুল ইসলাম ও কার্তিক ঘোষ প্রমুখ ছাত্রগণ খেলাধূলার ক্ষেত্রে নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। দেবাশিস কলকাতার তিন প্রধান ক্লাবেরই খেলোয়াড় ছিল।

১৯৪৮ সালে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর ইউনিট খোলা হলো। জগজ্জ্যোতি মিত্র, অনিল ব্যানার্জী ও বিনোদীবাবুর সুপরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো। ক্যাডেটদের অনেকেই দিল্লির রিপাবলিক ডে-র কুচকাওয়াজে স্থান পেয়েছিল।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কত উন্নত ছিল তা জানা যাবে ছাত্রদের অবদানে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল প্রফুল্ল কুমার বসু। শিক্ষা জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ড. সুকুমার সেন এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। আচার্য জগদীশ বসু এই বিদ্যালয়ে পড়েছেন। জ্যোৎস্না কুমার চৌধুরী এই বিদ্যালয়ের ছাত্র যিনি ছিলেন খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিক। অসীম রায় বিলাতের ডি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি আমাদের গর্ব। বিনায়ক সমাদ্দার চৌধুরী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সফল অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি। ডাঃ অভিজিৎ তরফতার শুধু উচ্চমাধ্যমিকে উচ্চস্থান লাভ করেছিলেন তা নয় চিকিৎসক হিসাবেও উচ্চপদে আসীন এবং একজন সুলেখক। ডাঃ উজ্জ্বল সিদ্ধান্ত, অর্ঘ দরফতার, শ্যামল পবি শুধু মেধাবী ছাত্র নয় এঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মীদের কথা মনে পড়ে। তাঁদের প্রতি আমাদের ছিল শ্রদ্ধার ভাব। সুরেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রতি ছিল আমাদের শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের ভাব। ধুবড়ীদা ছিলেন এক নিরলস কর্মী। তিনি তাঁর জীবনের সব সঞ্চয় বিদ্যালয়ের কল্যাণে উৎসর্গ করেন। গঙ্গাধর কোলে মহাশয় ছিলেন আমাদের কাছের মানুষ। তাঁকে আমরা ভাল বাসতাম। মিতভাষী বৃদ্ধ বিপিন দে মহাশয়ের নিয়ম নিষ্ঠা ও কর্তব্য পরায়ণতা আমাদের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্মৃতির পাতা থেকে কিছু অতীত দিনের কথা তুলে ধরলাম। আরও অনেক কিছু বলার ছিল। কারণ স্মৃতির দুয়ার খুলে গেলে বন্ধ করা কঠিন। তবুও থামতে হলো। আমার শিক্ষকদের অনেকেই পৃথিবী ত্যাগ করেছেন, সহপাঠীদের অনেকেও স্বর্গধামে। আমি এই অবসর জীবনে অতীত স্মৃতির রোমন্থন করছি। আর মৃত আত্মাদের প্রতি জানাচ্ছি শ্রদ্ধা। বর্তমান প্রজন্মের প্রতি থাকলো স্নেহ-প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

‘চিরন্তনী’

সজল রাজা

ঐতিহ্যমণ্ডিত শতোত্তর রজতজয়ন্তী প্রাচীন আমাদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের তৃতীয় পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ৫ জানুয়ারি, ২০০৮। বিভিন্ন দশকের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলিত হবার উৎসবের আয়োজক প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন ‘‘চিরন্তনী’’। চিরন্তনীর সাধ্য গণ্ডীবদ্ধ কিন্তু স্বপ্ন অসীম। ‘চিরন্তনী’ আমি থেকে আমরা হয়ে ওঠা। বিদ্যালয়ের শতবর্ষের সময় এবং ইতিপূর্বেও বিক্ষিপ্তভাবে পুনর্মিলন কমিটি গঠন বা উৎসব করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু সঠিক ভাবে প্রাক্তনীদের কোন সংগঠন গড়ে ওঠে নি। পথ চলার শুরু ২০০১ সাল থেকে। কিছু প্রাক্তন ছাত্র বিদ্যালয় জীবনের স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থনের জন্য, শতাব্দী অধিক সময় ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নানা বয়সের ছাত্র হৃদয়ের একত্রিত উষ্ণতা লাভ করার জন্য এবং সর্বোপরি আমাদের মাতৃসমা এই বিদ্যালয়ের পাশে দাঁড়াবার জন্য প্রাক্তনীদের একটি সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা শুরু করেন। সব থেকে বেশি সাহায্য এল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে। বিদ্যালয়ে বর্তমানে কর্মরত প্রাক্তনীরাও এ-বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগ নেন। চলার পথ বিশেষতঃ সদ্য জাতের অগ্রগমন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না মোটেই। নানা বিতর্ক, দ্বন্দ্ব বারবার ছায়া ফেলেছে। অর্থের সঙ্কুলান অনর্থ বাধিয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রাক্তনদের সাথে অর্থ সংগ্রহে বাড়ী বাড়ী মাধুকরী করেছেন বলা যায়। ২০০২ সালের ২২-২৩ ডিসেম্বর প্রথম পুনর্মিলন উৎসব আয়োজন করা সম্ভব হল। ২২ ডিসেম্বর বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাক্তন ছাত্র শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র বক্সী (বর্তমানে প্রয়াত) মহাশয়ের পতাকা উত্তোলন আসলে ‘চিরন্তনী’র জয়পতাকা উত্তোলন। ২২-২৩ ডিসেম্বরের ওই পুনর্মিলন যেন দীর্ঘদিনের জমে থাকা আবেগ, ভালবাসা, স্মৃতির বিস্ফোরণ ঘটাল। শ্রদ্ধেয় বলাই রায়, নিশীথনন্দন অধিকারী, সুভাষ বক্সী মহাশয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ও শতবর্ষে এই দুবার পুনর্মিলন উৎসব হবার পর এই প্রথম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল ‘চিরন্তনী’ আয়োজনে। প্রাক্তনীদের মধ্যে অনেকেই তাদের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে পুনর্মিলন উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয়েছিল সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ওই পুনর্মিলন উৎসবে বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। প্রথম পুনর্মিলন উৎসবেই চিরন্তনী ঘোষণা করে নিছক মিলন বা বিনোদনের জন্য উৎসবের আয়োজন নয়। ওই পুনর্মিলন উৎসবে বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। প্রথম পুনর্মিলন উৎসবেই চিরন্তনী ঘোষণা করে নিছক মিলন বা বিনোদনের জন্য উৎসবের আয়োজন নয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে দাঁড়িয়েও চিরন্তনী কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে চায়। সাহায্য করতে চায় বর্তমানের ছাত্রদের, এগিয়ে আসতে চায় মেধাবী ও অভাবী ছাত্রদের পাশে। ‘চিরন্তনী’ গঠিত হবার পর থেকেই সঞ্জীব চক্রবর্তী সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। প্রথম পুনর্মিলন উৎসব থেকে সেই গুরু দায়িত্বের ভার গিয়ে পড়ল শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত ব্যানার্জীর উপর। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চিরন্তনীর দাবি মতো আনন্দের সাথে একটি ঘর চিরন্তনীর অফিস হিসাবে ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দিলেন এবং এখনও পর্যন্ত স্টাফ রুমের পাশের ঘরটি (১০ নম্বর) অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রথম পুনর্মিলন উৎসবের সফলতা চিরন্তনীর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছিল। ওই উৎসব আয়োজন করে উদ্বৃত্ত দু লক্ষ টাকা বিদ্যালয়ের উন্নয়নে চিরন্তনীর পক্ষ থেকে বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে প্রথম পুনর্মিলন উৎসব থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল চিরন্তনীর একটি সংবাদ বুলেটিন বা মুখপত্র প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। কয়েকজনের সহায়তায় বিশেষত ভ্রাতৃপ্রতিম অনুজ সুজয় মিত্রের সহায়তায় ১০ ডিসেম্বর, ২০০৩ মুখপত্রটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাম দেওয়া হয় ‘চিরন্তনী’। এই মুখপত্রটির দ্বিতীয় সংখ্যাও

প্রকাশিত হয়। নানা অসুবিধার জন্য বিশেষতঃ আর্থিক অপ্রতুলতা ও প্রয়োজনীয় লেখা সংগ্রহের ব্যর্থতাই তার মূল কারণ বলে মনে হয়।

২৬ জানুয়ারি, ২০০৪ সরস্বতী পূজার দিন চিরন্তনী একটি মিলন উৎসবের আয়োজন করে। মূলত সাধারণ সভার আয়োজনের সাথে সাথে ছাত্র জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনটি (সরস্বতী পূজা) নিজের বিদ্যালয়ে ফিরে দেখার আগ্রহ থেকেই ছিল সেই আয়োজন। গোটা দিনটি প্রাক্তনীরা বিদ্যালয়ের হল ঘরটিতে স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে নিজের ছাত্র জীবনেই যেন ফিরে গিয়েছিলেন। ঐ মিলন উৎসব থেকে দ্বিতীয় পুনর্মিলন উৎসব আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঠিক হয় ২০০৪এর শেষ দিকে বা ২০০৫-র প্রথম দিকে দ্বিতীয় পুনর্মিলন উৎসব আয়োজন করা হবে।

২০০৫ সালের ৭-৮ মে দ্বিতীয় পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন হল। উদ্বোধন করলেন ও পতাকা উত্তোলন করলেন প্রবীণতম ছাত্র এবং আমাদের শিক্ষক গদাধর রক্ষিত মহাশয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাননীয় অমিত মল্লিকের উপস্থিতিতে এই উৎসবের শুভ সূচনা হয়। দু-দিন ধরে যেমন ছিল স্মৃতিচারণা তেমনি ছিল আত্মসমালোচনা। চিরন্তনীর অনেক কিছুই করার ছিল যা প্রায় অধিকাংশই করা যায় নি। না পারা কাজ আগামী দিনে করা যাবে এই স্বপ্নকে সামনে রেখে 'চিরন্তনী' সব প্রাক্তনীদের একান্ত আপন জন হয়ে উঠুক এই আশা উৎসব থেকে সঞ্চারিত হয়। ৮ মে-র প্রাক্তনীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল হৃদয়গ্রাহী। চিরন্তনীর আর একটি লক্ষ্য প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যেও সেতুবন্ধনের কাজ করা আর সেজন্য বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। এই পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষ্যেও আয়োজন করা হয়েছিল প্রতিযোগিতার যা যথেষ্ট সফলতা লাভ করে।

দ্বিতীয় পুনর্মিলন উৎসব থেকেই দাবি ওঠে বিজয়া সম্মিলনী আয়োজনের। সেই মতো ৬ নভেম্বর, ২০০৫ চিরন্তনীর উদ্যোগে প্রথম বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। ঐ দিনের আয়োজিত সাধারণ সভাতে চিরন্তনীর সংবিধান সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য ২০০৬ সালেও নভেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজিত হয়। ঐ দিনের সাধারণসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তৃতীয় পুনর্মিলন উৎসব আয়োজন করা হবে বিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপনের সময় মূল অনুষ্ঠান চলাকালীন ও শ্রদ্ধেয় গদাধর রক্ষিত মহাশয়ের মৃত্যুর জন্য বিমলকৃষ্ণ চ্যাটার্জী মহাশয় চিরন্তনী সভাপতি মনোনীত হন। সেই সিদ্ধান্তমতোই ৫ জানুয়ারি ২০০৮ তৃতীয় পুনর্মিলন উৎসব আয়োজিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে চিরন্তনী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করে যার বিষয় ছিল — Oral Health, বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডঃ সন্দীপন ভট্টাচার্য। এই ধরণের নানা পরিকল্পনা রূপায়ণে চিরন্তনী নিশ্চয় আগামী দিনে আরো যত্নবান হবে বলে আশা করি। ১২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত পদযাত্রায় (১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৭) চিরন্তনী বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। চিরন্তনীর পক্ষ থেকে পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের একটি টিফিন প্যাকেট দেওয়া হয় এবং ১২৫ বর্ষপূর্তির সমস্ত উৎসবে চিরন্তনী সাধ্য মতো অংশগ্রহণ ও সাহায্য সহযোগিতা করে চলেছে।

'চিরন্তনী' এগিয়ে চলেছে। চলার পথে ছিল দ্বন্দ্ব, বিতর্ক, অনুরাগ, বীতরাগ। কেউ আকর্ষিত হয়েছেন, কেউ বা সামান্য বিকর্ষিত। তবুও বিশ্বাস করি এই সত্যকেই যে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই বিকাশ ঘটবে। তাই বিদ্যালয়ের ১২৫ বর্ষে আশা রাখি চিরন্তনী ফিরিয়ে আনবে কৈশোরের আবেগ এবং ভবিষ্যতের জন্য আমাদের একত্রে কাজ করার দায়বদ্ধতাকে। বহমান সময়। ভীষণ ব্যস্ত আমরা সবাই। আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসর্বস্ব জীবনদর্শন আমাদের সামনে প্রতিমুহূর্তে হাতছানি দেয়। আবেগ ও অনুভূতি প্রায় নির্বাসনে, বিষয় সর্বস্বতা গ্রাস করতে চায় চিন্তা ও মনোজগৎকে। ''চিরন্তনী'' এই ভ্রান্ত জীবনবোধের বিরুদ্ধে। স্বপ্ন দেখার শেষ নেই মানুষের স্বপ্ন নিয়েই সে বেঁচে থাকতে চায়। যে স্কুলের ক্লাসরুমে একদিন স্বপ্ন দানা বেঁধে ছিল সেই স্কুলের প্রতিটি ইঁট, পাথর, ঘাসে তাকেই খুঁজে বেড়াই। তাকিয়ে থাকি অধীর আগ্রহে নূতন প্রজন্মের দিকে। অতীতের যা কিছু ভালো — তাকে রক্ষা করে আরো উন্নততর দিকে যাত্রাই তো মনুষ্যত্বের সাধনা। সেই সাধনা সার্থক হোক অতীত আর বর্তমানের সেতুবন্ধনে। অতীতের কাছে বর্তমানের যে ঋণ, ভবিষ্যতের জন্য কাজ করার মাধ্যমে সেই ঋণ পরিশোধের দায়বদ্ধতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ব্যস্ত জীবনের কোন এক ক্ষণে ঝিলিক দেওয়া স্কুল জীবনের স্মৃতিকে উস্‌কে দেওয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কাজ করার দায়বদ্ধতার নাম হোক 'চিরন্তনী'। সবার পরশে, সবার সহযোগিতায় শত বরষের বনস্পতির শতেক শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হয়ে উঠুক আমাদের 'চিরন্তনী'।

রবীন্দ্র সংগীত ঃ যে গানে শুরু যে গানে শেষ

আশিসবরণ সামন্ত

রবীন্দ্র সাহিত্য মহাসাগর অপেক্ষা কম গভীর এবং কম ব্যাপক নয়। রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সে ধারণাই বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। বিশ্ব কবির বিভিন্ন গ্রন্থের সান্নিধ্যে এসে এবং জীবনীকার ও সমালোচকদের রচনাকে কেন্দ্র করে গানগুলি সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়। প্রশ্ন জাগতে পারে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি গান রচিত হলেও তাঁর প্রথম ও শেষ গান কী কী? বর্তমান নিবন্ধে আমার 'রবীন্দ্র সংগীতের জন্মকথা' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থ থেকে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গান কোনটি? এই নিয়ে বিভিন্ন সমালোচক নানান মত ব্যক্ত করেছেন। কারও মতে 'বলি ও আমার গোলাপবালা', কেউ বলেছেন 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়', কেউ কেউ বলেন—'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুন' এবং কারও মতে 'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে' গানটি।

এখন গানগুলির রচনাকাল নিয়ে আলোচনা করলেই প্রথম গান কোনটি তা খুঁজে বের করা সহজতর হবে।

তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১২৮৫ সালের ৫ আশ্বিন প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাত্রার প্রস্তুতিপর্বে তিনি ছিলেন আমেদাবাদের শাহিবাগে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে। ঐ সময় অর্থাৎ ১৮৭৮ সালে 'বলি ও আমার গোলাপ বালা' গানটি রচনা করেন।

'নীরব রজনী কেন মগ্ন জোছনায়' — গানটিও ওই সময়ে লেখা। শাহিবাগের নির্জন বাড়িতে তরুণ রবীন্দ্রনাথের দিন কাটতো মেজদাদার লাইব্রেরীতে। সেই সময়ে নির্জন বাড়ির ছাদে একা একা ঘুরতেন। কত কবি কল্পনা জাগতো তাঁর মনে। কবির শেষ জীবনের অন্যতম সহচর সুদক্ষ রবীন্দ্র জীবনবিদ — নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৩ চৈত্র ১৩৪৭ সালের একটি দিনের কথা লিখেছেন, যে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছেন— 'প্রথম গান যেটি রচনা করেছিলাম আমেদাবাদে, তা রাখবার সাহস তখনো হয়নি।... তাতে ছিল গানের একটি সত্যিকারের মুক্তরূপ। একটি মাত্র কলি তার মনে পড়ছে (কবি গেয়ে উঠলেন) — 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়।'

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে এইটি তাঁর প্রথম সুর দেওয়া গান।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সরোজিনী' নাটিকায় রাজপুত রমণীদের চিতা প্রবেশের যে দৃশ্য আছে তাতে একটি গদ্য সংলাপ ছিল। যখন সেই স্থানটি বারবার পাঠ করে রচনার অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা হচ্ছে তখন পাশের ঘরে বসে পড়াশোনা বন্ধ করে রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে শুনছিলেন। হঠাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে এসে উক্ত স্থানে একটি সংযোজনের কথা বললেন। তখন সময় অভাবে সম্ভব হবে না বলতেই রবীন্দ্রনাথ অল্প সময়ের মধ্যে এই গানটি রচনা করে সকলকে চমৎকৃত করলেন এবং নাটকটির প্রাণ সঞ্চার হল। গানটি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। সুতরাং তার পূর্বেই রচিত।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল তাঁর 'রবি জীবনী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেছেন — 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটক সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' প্রকাশিত হয় (বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী) 30 Nov. 1875 (মঙ্গল ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২)। গানটি আছে নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের একেবারে শেষ অংশে (১ম সং, পৃ. ২৩৩-৩৮)। সুতরাং শেষ ফর্মার প্রুফ দেখার সময়েই শিলাইদহ যান তখন ২৩ অগ্রঃ 'কর্তামহাশয়ের নিকট ছোট বাবুর সরোজিনী পুস্তক' পাঠাবার হিসাব পাওয়া যায়, তাহলে আমরা গানটির রচনাকাল কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ বা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ (Nov 1875) এর মাঝামাঝি বলে নির্ধারণ করতে পারি।'

১২৭৯ সালের ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে (মার্চ ১৮৭৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনুচরাদিসহ হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। জীবন প্রত্যুষের যে কয়টি ঘটনা কবির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল তার অন্যতম হল হিমালয় যাত্রা। 'জীবন স্মৃতি' তে একথা তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন।

বোলপুর থেকে বের হয়ে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, আলিগড় প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে করতে অবশেষে পিতা পুত্র অনুচরাদি সহ অমৃতসরে পৌঁছেছিলেন। অমৃতসরে শিখদের বিখ্যাত গুরুদ্বার বা ধর্ম মন্দির সেখানকার প্রধান দর্শনীয় স্থান। শিশু রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে

গ্রন্থ সাহেব থেকে অখণ্ড পাঠ, ভজনগান মনোযোগ সহকারে শুনতেন। গুরু নানকের বিখ্যাত ভজন 'গগন মে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে' গানটিও ওইখানেই কবির কর্ণগোচর হয়। গানটির আক্ষরিক অনুবাদ 'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে' যে কার রচনা এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকায় অনেকে এই গানটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গান বলে মেনে নিতে না পারলেও বিভিন্ন আলোচনা থেকে গানটিকে রবীন্দ্র সংগীত পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রকাশিত 'ব্রহ্ম সংগীত স্বরলিপি' দ্বিতীয়ভাগে গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলে উল্লেখিত হয়েছে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্রহ্ম সংগীত' গ্রন্থের সূচিপত্রেও গানটিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বলা হয়েছে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই 'রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী'তে (শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৬) সংখ্যায় লিখিত হয়েছে — ''আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্ম সংগীত স্বরলিপি' (দ্বিতীয় ভাগ) পুস্তকে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এটি তাঁহার রচনা।''

কবির ভ্রাতৃষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী বিশ্বভারতী পত্রিকার অষ্টম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬ সংখ্যায় 'রবীন্দ্র সংগীতের ত্রিবেণী সংগম' প্রবন্ধে এই গানটি সম্পর্কে লিখেছেন— 'এই শিখ ভজনেরই আর একটি বহুকাল আগে আমাদের কাছে এসেছিল, কী সূত্রে তা জানি না; এবং আশ্চর্যের বিষয় সেটিও জ্যোরিন্দ্রনাথ একেবারে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করেছেন। .... কেউ কেউ ভুল করে ভাবেন এটি রবীন্দ্রনাথের।'' এ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে তা হল — ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের বাংলা পাক্ষিক মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রকার ১ ভাদ্র ১৭৭৪ শক বাংলা ১২৭৯ এবং ইংরেজি ১৮৭২ সংখ্যায় (৫/১৪) ৭৩৮ পৃষ্ঠায় নানকের ভজনটি প্রথম বংলা হরফে প্রকাশিত হয়। এরপরই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায় ১৯১-১৯২ পৃষ্ঠার সংবাদ শিরোনামায় ২৪ ভাদ্র লাহোর সত্সভার দ্বিতীয় সাং বাৎসরিক প্রসঙ্গে গদ্যানুবাদ সহ গানটি প্রকাশিত হয়। গানটি সুর সংযোজিত হয় ১২৮১ সালের ১১ মাঘ শনিবার ২৩ জানুয়ারি ১৮৫৭ আদি ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চ চত্বারিংশ সাংবাৎসরিক সায়ংকালীন উপসনায় গীত হয় ও পরবর্তী ফাগুন সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ২০৯ পৃষ্ঠায় তা মুদ্রিত হয়।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানি পূর্বোক্ত মন্তব্য করলেও গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে (আশ্বিন ১৩৫৭) গানটি রবীন্দ্র সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য ইন্দিরা দেবী এই সংকলন গ্রন্থটির অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল তার রবি জীবনী (১ম খণ্ড) তে বলেছেন — 'আমাদের অনুমান পদ্যানুবাদটি রবীন্দ্রনাথেরই কৃত। ফাল্গুন সংখ্যায় অনুবাদ সহ মূল রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে বোলপুর হয়ে অমৃতসর এ আসেন। খুবই সম্ভব যে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' মারফত রচনাটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। অমৃতসরে পিতার সঙ্গে যখন গুরুদ্বারে উপস্থিত থাকতেন তখন অন্যান্য শিখ ভজনের সঙ্গে এই গানটিও তিনি শুনেছিলেন এমন সম্ভাবনার কথা সহজেই ভাবা যেতে পারে। আর এই যোগাযোগের অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথ ভজনটির বঙ্গানুবাদ করেন। তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে গদ্যানুবাদ দেওয়া ছিল এবং দেবেন্দ্রনাথ ও গানটি জানতেন, সুতরাং গুরুমুখী ভাষার অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। আমাদের এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত যদি বিদগ্ধ জনের সমর্থন যোগ্য হয় তবে এটিই রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম ব্রহ্ম সংগীত বলে গণ্য হবে। অবশ্য প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী' প্রথম খণ্ডে (১৯৭৩) গানটিকে সূচির প্রথমেই স্থাপন করা হয়েছে। তবে, আমাদের মত গ্রাহ্য হলে সেখানে বয়স ও সালটি সংশোধনের প্রয়োজন হবে, লিখতে হবে 'বয়স ১১/১২৭৯/১৮৭৩'।

উল্লেখ্য রবিজীবনী ১ম খণ্ড ১৯৮২ তে প্রশান্ত কুমার পাল এই মন্তব্যের পর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। সুধি পাঠক সমাজের কোনোরূপ বিকল্প ভাবনা বা আলোচনা থাকলে এই সংস্করণেই তা সংশোধনী আকারে প্রকাশিত হোত। তা না হওয়ায় এটিই যে প্রথম রবীন্দ্র সংগীত সে বিষয়ে আর কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

কবিগুরুর প্রথম গান নিয়ে সমাধান পর্বে পৌঁছাতে এতগুলি ধাপ পার হতে হলেও শেষ গানটি ছিল যথেষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষ। ১৩৪৮ সালের আগে কবি নিজের জন্মদিন উপলক্ষে কোনো গানই রচনা করেন নি। ঐ বছর ২৫ বৈশাখ পালনের জন্য সারা বাংলা যখন মেতে উঠেছিল তখন তাঁর প্রিয় শিষ্য শান্তিদেব ঘোষের একান্ত অনুরোধে ২৫ বৈশাখ কবিতাটির একটু পরিবর্তন করে লিখলেন—

'হে নূতন, দেখা দিন আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ' — এই গানটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের শেষ গান। শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে লিখেছেন— 'যেদিন একথা ঘূণাক্ষরেও মনে হয়নি, এই তাঁর জীবনের সর্বশেষ গান।'

লেখক বর্ধমান জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক।

R N T C P B A R D H A M A N

Revised National Tuberculosis Control Programme

DOTS- sure cure for TB.

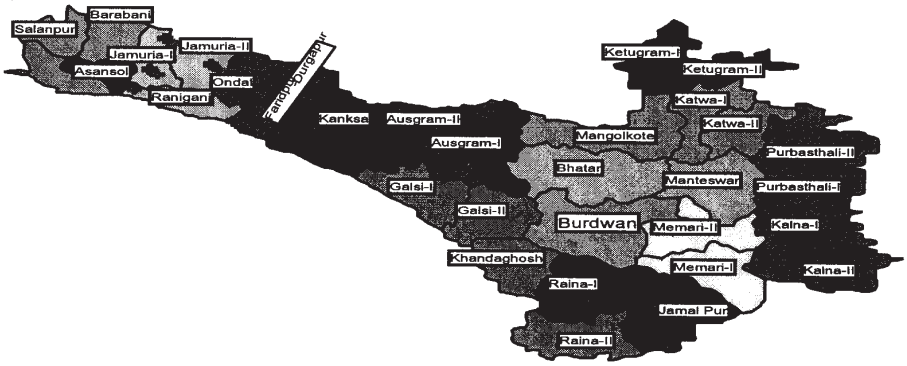

সংশোধিত জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসুচী

যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে জানুন ও অপরকে জানান।

* যক্ষ্মা একটি জীবানু ঘটিত রোগ। জীবানুর নাম মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। এই রোগ হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে ছড়ায়।
* তিন সপ্তাহের বেশী একটানা কাশি হলে যক্ষ্মা রোগ হতে পারে।
* কফের তিনটি নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে দ্রুত যক্ষ্মা রোগ সনাক্ত করন সম্ভব।
* সমস্ত সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও কিছু অনুমোদিত বেসরকারী কেন্দ্রে বিনামূল্যে কফ্ পরীক্ষা ও ডট্স পদ্ধতিতে (সরাসরি নজরদারি) চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে।
* নিয়মিত ডট্স পদ্ধতিতে (সরাসরি নজরদারি) চিকিৎসা করালে যক্ষ্মা রোগ সম্পূর্ন নিরাময় সম্ভব।
* ডট্স পদ্ধতিতে ৬ থেকে ৯ মাস নিয়মিত ঔষধ খেতে হয় ও নির্দেশমত তিনবার ফলোআপ কফ্ পরীক্ষা করতে হয়। চিকিৎসা চলাকালীন কোন ও অসুবিধা হলে স্বাস্থ্য কর্মী বা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
* মাঝপথে ঔষধ খাওয়া বন্ধ করলে ফল মারাত্মক হয়, এমনকি রোগী মারা যেতে পারে।
* যক্ষ্মা হলেই ডট্স পদ্ধতিব (সরাসরি নজরদারি) চিকিৎসা নিন ও দেশকে যক্ষ্মা মুক্ত করুন।
* সংকোচ, ভয় ও আতঙ্ক দূর করুন, ডট্স পদ্ধতির চিকিৎসার মাধ্যমে সমাজকে যক্ষ্মা মুক্ত করুন।
* ডট্স পদ্ধতিতে (সরাসরি নজরদারি) যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসা হল সরাসরি নজরদারীতে স্বাস্থ্যকর্মী / প্রশিক্ষিত কর্মীর কাছে নিয়মিত প্রথম ২-৩ মাস একদিন অন্তর সপ্তাহে তিনদিন ঔষধ খেতে হবে। পরের ৩-৯ মাস সপ্তাহে একদিন স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে খেয়ে, বাকী দিনগুলিতে বাড়ীতে ঔষধ খেতে হবে।

জেলা যক্ষ্মা আধিকারিক
বর্ধমান

জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান সমিতি, বর্ধমান

কুড়ি বছর পর

সঞ্জীব চক্রবর্তী

কুড়ি বছর পর আবার হাঁটলাম
কডির দিয়ে, স্টেজে —
কই, আর তো তেমন বড়, উঁচু লাগছে না!
মাঠটাও তেমন দিগন্ত ছোঁয়া নয়
সত্যজিৎ রায়ও এমনটাই ভেবেছিলেন
যখন অনেক লম্বা হয়ে একবার
তাঁর স্কুলে গিয়েছিলেন।
আমি সত্যজিৎ রায় নই, তবু
তেমনটাই মনে হল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে শিহরণ হল

আরে— এই তো এইখানে
টিফিনের সিঙাড়া হাত নামার সময়
সমীরদার চোখে চোখ পড়তে
সে ফিক্ করে হেসেছিল।
৩৬ নং ঘরে দুরন্ত ছেলে বিশ্বরূপ
লাফিয়ে বেড়াতো বেঞ্চে বেঞ্চে—
সে কোথায় কেমন আছে, কে জানে।
ওইখানে বোকা শুভেন্দু বেদম মার খেয়েছিল
মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে, যে মার
ফুল হয়ে ফুটেছিল তার অঙ্কের খাতায়—
ওই ঘরে কালীবাবু ডাকছে, 'গয় গবাক্ষ
নল নীল...' ছেলেদের অবাধ্য সত্ত্বাকে সম্বোধন করে।
ওইখানে আপন মহিমায়
পান্ডিত্য উজাড় করে চলেছেন
নির্বিকার কালী মিশ্র —
ছেলেদের চোখে মায়া অঞ্জন মাখিয়ে যাচ্ছেন
গৌরীবাবু, ইতিহাসকে ছবি করে তুলছেন
ভোলানাথবাবু,
প্রশ্রয়ের হাসি হাসছেন পাঁচুগোপাল রায়।
ওই বাঁশি বাজল, খেলোয়াড় নিয়ে
মাঠে নামছেন বিনোদীবাবু...

ছবি আসছে, ভাঙছে মিলে মিশে
ক্যালাইডোস্কাপে নতুন নকশা গড়ছে—
আজকের ক্লাসরুমে তারা ধরবে না—

কুড়ি বছর বাদে মনবরে বিষণ্ণতা নিয়ে
ফিরে যেতে আসি নি—
ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজছে,
কোন নতুন বিপিদার হাতে —
ওই লালসাদা পোশাক পরে
ছেলেরা আসছে, কোলাহল করে
ছুটে ক্লাসে ঢুকছে, বসছে...
আমার চোখের সামনে ক্লাস রুম
আবার আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে,
মায়া কাননে মিশে যাচ্ছে
মাঠের সবুজ সীমানা।

THE 125TH YEAR CELEBRATION COMMITTEE

Burdwan Municipal High School

All the students of our school are hereby informed that a programme has been organised on January 4, 5, 6, 2008 respectively to mark the 125th year of our glorious alma maler in a befitting ma... on this occasion, a museum is going to come up along with the release of documentary film, enshrining the golden history of our institution. In addition to this a book, dealing with the 125 yr. of our school is going to be launched and this for your kind information could be collected from our school.

To take part in the proposed Re-union of our school on Jan. 5, 2008, you are requested to deposit for registration Rs. 100/- will the school-office in person or through cheque through the SBI Account No. ..... If you so feel, you could even donate to ensure a stupendous success of this mamm.. programme. However, it is to be kept in mind that the Registration amount as will as Donation .... is to be paid through two separate cheques. Therefore you will have to E-mail us in the following address 125_bmhs@bmhschool.com to get the official confirmation as to the receipt of the said amount by our office.

You see, any programme of this magnitude can only become successful only if you, for whom the entire exercise is chiefly meant, your helping hands in large number. We fervently believe that whether be the distance, almost everybody among you certainly enjoys a sort of kinship with this Institution. The very spra.... play-ground, the class-rooms, the corridor, I mean, every nook and corner of this institution be.. every alumnus with the fond memory of the by-gone childhood & boy-hood. As such, taking some time off from our hectic, ... work-a-day existence, let us come together and make a trip to the memory lane for a brief session of reminiscence. This institution only seeks your whether-hearted cooperation in this regard to make this once-in-a-life time event a grand success and indeed a memorable one.

Thanking you,

Amitjyoti Samanta
Teacher-in-charge
Burdwan Municipal High School

১ নং তালিকা এনট্রান্স পরীক্ষা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৮৮৩-১৯০৯	১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	মোট
(৮৪তে পরীক্ষা হয়নি)	৪০	১৩০	৯৭	২৬৭

(১৯০৭-১৯০৯ বৃত্তিলাভ করেছেন ৪টি)

২ নং তালিকা	১ম	২য়	৩য়	মোট
১৯১০-১৯৫১	৬৫২	৬৩৩	৫২৪	১৮০৯

(বৃত্তিলাভ করেছেন ৪৫টি; ১৯১৫ তে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন প্রফুল্লকুমার বসু এবং ১৯২২-এ ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন গোপালদাস চক্রবর্তী)

৩ নং তালিকা স্কুল ফাইনাল (মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ)

	১ম	২য়	৩য়	মোট
১৯৫২-১৯৫৯	৪৪	১৫০	২৮৪	৪৭৮

(বৃত্তিলাভ করেছেন ৬ জন; ১৯৫৭ তে দশম স্থান অধিকার করেছেন শ্রী অজিত সামন্ত)

৪ নং তালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা (মাঃ শিঃ পঃ; পঃ বঃ)

১৯৬১-১৯৬৫	১ম	২য়	৩য়	মোট
মানবিকী	১	৪৩	৯৫	১৩৯
বিজ্ঞান	৪৯	১০৭	৩৫	১৯১

(৭ জন বৃত্তিধারীর ৫ জন জাতীয় বৃত্তি লাভ করেছেন — সর্বশ্রী অনুপকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যদর্শন দত্ত, দেবব্রত মৈত্র, নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাল হোসেন)

৫ নং তালিকা	১ম	২য়	৩য়	মোট
১৯৬৬-১৯৭৫				
মানবিকী	৫	৬৮	১২৭	২০০

(১৯৭৩ সালে শ্রী সুগত হাজরা পঞ্চম স্থান অধিকার করেন)

				পি.
বিজ্ঞান	১৮৩	২৩৮	৪৩	১ ৪৬৫

(১৯৭৫-তে শ্রী অভিজিৎ তরফদার পঞ্চম স্থান অধিকার করেন)

বাণিজ্য		২৯	৯৬	৮ ১৩৩
৬ নং তালিকা	মাধ্যমিক			
১৯৭৬-১৯৮১	১ম	২য়	৩য়	মোট
	১৭৬	২৮৬	৫২	৫০৪
	উচ্চমাধ্যমিক			
১৯৭৮-১৯৮১			পি.	
বিজ্ঞান-বাণিজ্য				
মানবিকী	৬৭	২৯৭	১৬২	৫২৬

৭ নং তালিকা মাধ্যমিক

	১ম	২য়	৩য়	মোট
১৯৮২	৪৬	৭০	১৩	১২৯
১৯৮৩	৪৮	৭৮	২০	১৪৬
উচ্চমাধ্যমিক				
১৯৮২	২০	৭৯	৪৯	১৪৮
১৯৮৩	২৯	৭৯	৪১	১৪৯

সম্পাদকের কলমে

১৯৮৩ সালে বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন সেই উৎসবের আলোর রোশনাই, সঙ্গীতের মূর্ছনা আজও তাঁদের সকলের হৃদয়ে প্রোথিত। প্রবাদপ্রতিম শিক্ষককুল ও সুসন্তান (প্রাক্তন ছাত্রগণ) যাঁরা ঐ উৎসব আড়ম্বরে সংগঠিত করেছিলেন। কালের নিয়মেই অনেকে আজ আর নেই আমাদের মধ্যে — দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর অনেকেই আজ শ্রান্ত - বিশ্রামে অবসরে। মহাকালের নিরীখে এই আড়াই দশক হয়তবা বেশি কিছু সময় নয়। বিশ্বচরাচর কিন্তু দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে তার তাই নতুন আঙ্গিকে আমাদেরও মানাতে হচ্ছে — দৌড়াতে হচ্ছে শব্দের বেগ ছাড়িয়ে। পঁচিশ বছর পর আমরা যখন সাতোত্তর রজতজয়ন্তী বর্ষ পালন করতে যাই আমাদের উৎকণ্ঠা ছিল। আশা ছিল কতটুকু রাঙাতে পারব এই উৎসব, অগণিত প্রাক্তনীর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ফারাক কতটুকুই বা কমাতে পারব। বিদ্যালয়টির প্রতি অনুরক্ত বর্ধমানবাসীর কাছে কতটুকু পৌঁছাতে পারব উৎসবের জয়গান এমন শঙ্কাও ছিল আমাদের মননে। আমরা দিতে পারি দৈহিক শ্রম, হৃদয়ের আবেগ আর সংকল্প কিন্তু কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারব না সেই সব মহান মানুষগুলি।

প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে আমরা নেমেছিলাম অসাধ্য সাধন কাজ—'১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন'। অঙ্গীকার ছিল বর্ষব্যাপী এই অনুষ্ঠান চলবে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পঠনপাঠনের বিঘ্ন না ঘটিয়ে। অনুষ্ঠানগুলি সংগঠিত করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের কাছ হতে যেভাবে সহায়তা পেয়েছি তাতে ৪-৫ জানুয়ারি ২০০৮-এর মূল অনুষ্ঠানটি ও সফলভাবে রূপায়িত করতে পারব এই আত্মবিশ্বাস আমাদের হয়েছে। ইতিমধ্যে ২টি পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০০২ এবং ২০০৫ সালে প্রাক্তনীদের সংগঠন 'চিরন্তনী'র হাত ধরে।

যৎসামান্য অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়েই ২০০৭ সালে বর্ধমান পৌরসভার বর্ধমান উৎসবের একটি ঋণ বিনামূল্যে পাওয়া যায় ও প্রচারের কাজ শুরু হয়।

অশীতিপর প্রাক্তনী ডা. বিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কম্পিত হাতে ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সকাল ৮টায় যখন বিদ্যালয়ের শ্বেত মেরুণ পতাকা উত্তোলন করলেন। করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ — শুভ সূচনা হল উৎসবের। বিদ্যালয়ের সময় শিক্ষার্থী বাহিনী, বিদ্যালয়ের ছাত্ররা, অভিভাবক অভিভাবিকাবৃন্দ, বিদ্যালয় প্রাক্তন ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, পরিচালনসমিতির সদস্য, পৌরপতি কে নেই সেখানে — বিদ্যালয়ের গৌরব আরও ছড়িয়ে পড়বে এই অঙ্গীকারই ছিল সেদিন। শতোত্তর পঞ্চবিংশতি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন আর প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক শ্রী অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। শত সহস্র বর্ষ আলোকিত থাকবে বিদ্যালয় এই ছিল আমাদের প্রত্যয়। একঝাঁক বেলুন ওড়ালেন পৌরপতি। বর্ধমান পৌরসভা আর পৌর বিদ্যালয় জন্মলগ্ন থেকেই একসাথে হেঁটেছে — হাঁটবে — এই বার্তাই ছিল সেদিন। ঘন্টা বাজিয়ে পদযাত্রার সূচনা করলেন প্রাথমিক বিভাগের অবসর প্রাপ্ত প্রবাদপ্রতিম প্রধান শিক্ষক (প্রাক্তন ছাত্র) শিশির রঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়। উদাত্তকণ্ঠে ছাত্র-শিক্ষক, সমবেতভাবে গেয়ে উঠলেন শতবর্ষের গান। ১২৫ তম বর্ষ পূর্তি উৎসবের গান। দেশাত্মবোধক গান। ব্যাণ্ডের তালে তালে, ফেস্টুন, ট্যাবলো, বিদ্যালয়ের পতাকা ও হরেকরকম ফুল হাতে ছাত্র শিক্ষকদের বর্ণাঢ্য পদযাত্রা রাজপথ পরিক্রমা করে। এমন বর্ণময় শোভাযাত্রা বর্ধমানবাসী সুদূর অতীতে দেখে নাই।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চালু হল বিদ্যালয়ের নিজস্ব website (www.bmhschool.com) উদ্বোধক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. বিষ্ণুচরণ সরকার। প্রবাসে পাতা ঝরানো শীতের কোন সন্ধ্যায়

প্রবাসী কোন প্রাক্তনীর মনে পড়তেই পারে 'পুরানো সেই দিনের কথা' — LapTop-এর সামনে বসে মুহূর্তেই মধ্যেই ঢুকে পড়তে পারেন বিদ্যালয়ের অলিন্দে কোন্ স্যার অবসর নিলেন। এ বছরের ফল কেমন হল — সকলের হরেক রকম কাজের সুবিধার জন্যই এটির প্রয়োজন ছিল।

স্কুলের বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়েছে মে-মাসে। গান, নাট্যাংশে পাঠ, আবৃত্তি, অঙ্কন ক্যুইজ, বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়ে। ছেলেদের দক্ষতা প্রমাণ করে আজও প্রতিভার অভাব নেই। ঐ মাসেই অঙ্কনে সেরা প্রায় ৬৫ জন ছাত্রকে নিয়ে তিন দিনের অঙ্কন প্রশিক্ষণ কর্মশালা। অভিনব এই পরিকল্পনাটি পরিচালনা করেন বর্ধমান আর্ট কলেজের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীরা। গ্রীষ্মের দাবদাহ উপেক্ষা করে ছেলেরা আপন মনে এঁকেছে রং তুলিতে মাটি দিয়ে পড়ে তুলেছে অসম্ভব সুন্দর সব শিল্পকর্ম। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রাপ্য 'কলেজ অফ আর্ট এণ্ড ডিজাইনের' অধ্যক্ষঅ, শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের।

হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ, শৈশব আর ফুটবল ছাত্রদের কাছে বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এই বিদ্যালয়ের সবুজ মাঠ। একদা সকাল দুপুর আর বিকালে ফুটবল নিয়ে মাঠে দাপাদাপি করত ছেলের দল। সে দিন আর নেই। আবার আগ্রহ ফিরিয়ে আনতে শহরের আটটি স্কুলের ফুটবল দল নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। খেলাগুলিতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই-এর পর বাবুরবাগ সি. এম. এস. আমাদের স্কুলকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। পুরস্কার তুলে দেন অতীতে খ্যাতনামা ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য মহাশয় এবং 'সাই' এর বর্ধমান শাখার ফুটবল প্রশিক্ষক অনন্ত কুমার ঘোষ মহাশয়। শুধুমাত্র মনের তাগিদেই তাঁরা আজও খেলাধূলার প্রচারে ব্যস্ত — তাঁদের অবদান আমরা মনে রাখব।

২১-০৭-২০০৭ তারিখে মোহনবাগান প্রি-সাব জুনিয়র-এর এক ঝাঁক ক্ষুদে ফুটবলার অসামান্য দক্ষতায় যে ফুটবল শিল্প উপহার দেয় সেটির বর্ণনার কোনো ভাষা নেই। ধন্যবাদ জানাই মোহনবাগ কর্তৃপক্ষ, কোচ ও ফুটবলারদের।

খুব খুশী হতেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন মাস্টারমশাই বিনোদীবাবু, পাঁচুবাবু, কালীবাবুরা থাকলে আর টাউনস্কুল — মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষকদের খেলাটি দেখলে। এই দুই স্কুল যেন পিঠোপিঠি দুই সহদোর। এক স্কুলের গৌরবে অন্য স্কুল গৌরবান্বিত হয় আর তাই বোধহয় মাঠে এত প্রতিদ্বন্দ্বিতা — সে ছেলেদের ঘেলা হোক বা শিক্ষকদের। ভরা বর্ষায় অমিমাংসিত এই খেলাটি সকলের হৃদয় জয় করে নেয়।

এই স্কুলের প্রাক্তনীদের সঙ্গে বর্ধমান শহরের অন্যান্য স্কুলের প্রাক্তনীদের মধ্যে যে ফুটবল খেলাটি হয় সেটি বাঁধিয়ে রাখার মত একটি ছবি। অতীতের যেসব নক্ষত্ররা তাঁদের সোনালী দিনে বিদ্যালয়ের জন্য ক্লাবের জন্য বর্ধমানের ময়দান কাঁপিয়েছেন তাঁরা নেমেছিলেন কিছু শিল্প আজও তাঁদের পায়ে আছে। মন আছে অথচ শরীর যাচ্ছে না। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। মাথা গরম সব উপাদানই মজুদ ছিল সে খেলায়। ফুটবল ছাড়া অন্যান্য খেলাগুলির আয়োজন করার ইচ্ছেও ছিল আমাদের। না পারার দায়ভার স্বীকার করে নিচ্ছি। শিক্ষামূলক ভ্রমণের অঙ্গ হিসাবে ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমরা বিষ্ণুপুর গেলাম। প্রায় ৩০০ জন ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, রেডক্রশের মেডিকেল টিম নিয়ে ৫টি বাসে যাত্রা শুরু হয় সকাল ৭টায়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ শান্তনু ঘোষ সঙ্গ দিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করেছেন। বিষ্ণুপুর .... হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ... এবং তাঁর সহকর্মীরা যেভাবে স্কুল ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে এবং প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন তাতে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব তাঁদের প্রতি। বিষ্ণুপুর পুরসভার কাউন্সিলর উদয় চক্রবর্তী এবং তাঁর ভাই সুজয় চক্রবর্তী যেভাবে আমাদের আপ্যায়িত করেন তা আমাদের মনে থাকবে। ছাত্রদের আচরণ সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সুশৃঙ্খলভাবে থাকা, খাওয়া এবং ঘোরার ব্যাপারে। তাদের কৌতুহল, অনুসন্ধিৎসা আমাদের সবার তা্ লাগিয়ে দিয়েছে। খোলামাঠে বসে ছবি এঁকেছে, ছবি তুলেছে, স্থানীয় মানুষদের কাছে তথ্য সংগ্রহ করেছে। কেউ বা গাইড-এর কাছ থেকে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করেছে বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীর ইতিহাস। কেউ বা কিনেছে বিষ্ণুপুর খ্যাত পোড়া মাটির কাঁসার বস্তুসামগ্রী। ভাদ্র মাসের গরম, খিদে তেষ্টা কোন কিছুই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি ওদের কাছে। অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য, লক্ষ্য করা গেছে ফেরার সময়েও। ছাত্রদের অভিভাবকরা সর্বোতভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন। ইচ্ছে থাকলেও আমরা পারিনি বিদ্যালয়ের সব ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে। এই খেদ ভোলবার নয়।

সেপ্টেম্বরের ৮-৯ তারিখে বর্ধমান শহরের প্রায় ৩৫টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আমরা সাথী করতে চেয়েছিলাম — সফল হয়েছি আমাদের ১২৫ তম বছর উদ্‌যাপনে অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে। যাঁরা বিচারকের আসনে বসেছিলেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

গণিত ও পদার্থবিদ্যার উপর দুটি সেমিনার হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ড. বিষ্ণুচরণ সরকার তথ্য প্রযুক্তির বিবর্তনের ধাপগুলি ব্যাখ্যা করেন অসামান্য দক্ষতায়। সবার কাছে বোধগম্য ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল তাঁর বক্তৃতা। পৃথিবীখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের কথা — তাঁরাও যে রক্ত মাংসের মানুষ — লোভ, ঈর্ষা, হতাশায় তাঁরও যে আক্রান্ত হন গল্পচ্ছলে শোনালেন সেসব।

গণিতের সেমিনারে এসেছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়। কথায় আছে গণিতের শেষ আর দর্শনের শুরু — গণিতের এই দার্শনিক অধ্যাপক তারই নিদর্শন যেন। সংখ্যাতত্ত্বের অদ্ভুত রীতিনীতি সুন্দর ও সহজভাবে বললেন। ছাত্র শিক্ষক আমরা সবাই অভিভূত। সময় বড় বেরসিক— তাই 'আবার আসিব ফিরে' এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ হয় গণিতের সেমিনার। দুই অধ্যাপকেরই বিচরণ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে — তাঁরা যেভাবে স্কুল স্তরে নেমে এসে সহজ সরল, সকলের বোধগাম্য করে তুলেছিলেন তাঁদের আলোচনা — বিষয়দুটি উপর ছাত্রদের কৌতুহল যেভাবে বাড়িয়ে তুলেছিলেন — তাদের সার্থক আমাদের পরিকল্পনা। অধ্যাপকদ্বয়ের পরিশ্রম সার্থক। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতি। আরও কয়েকটি বিষয়ের ওপর সেমিনারের আয়োজন করার ইচ্ছে ছিল — হয়ে ওঠেনি সময় আর তাগিদের অভাবে।

বিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আরও দুটি চমকপ্রদ ও অভিনব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। একটি সংগ্রহশালা ও একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের দাবী ছিল। দুই প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান শিক্ষক অরুণাভ চক্রবর্তী ও সঞ্জীব চক্রবর্তীর উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় রূপায়িত হতে চলেছে তথ্যচিত্র ও সংগ্রহশালা নির্মাণ। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র প্রমথ অধিকারী ও অমৃতেন্দু অধিকারীর আর্থিক সহায়তা না পেলে আমাদের স্বপ্ন অধরা থেকে যেত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সবই ধরে রাখার চেষ্টা হচ্ছে সংগ্রহশালা ও তথ্যচিত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে বর্ধমানের তৎকালীন মহারাজা ও কতিপয় শিক্ষানুরাগীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত বালক বিদ্যালয় কিভাবে ভগবান চন্দ্র বসু ও পুরসভার অর্থানুকূল্যে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পরিণত হল, কিভাবে বারবার ভাঙাগড়া ও স্থান পরিবর্তন, আর্থিক অনটন, দুটি বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড এসবের মধ্যে দিয়েও। কিভাবে আজও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা একটি বিদ্যালয় বিবর্তনের ধাপগুলি ধরে রাখা আছে। এ দুটি নির্মাণে প্রাক্তন ছাত্রদের সর্বোতভাবে সহায়তা বিদ্যালয়টির প্রতি আনুগত্যই প্রকাশিত হয়। আজও জীবনের শৈশব, কৈশোর কাটানো প্রাক্তনীরা কিম্বা দীর্ঘদিন সেবার পর অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মশাইরা আসেন কেউ খোঁজেন গুরুকূল কেউবা সতীর্থদের। অনেকে আজও আছেন। নেই অনেকেই তাঁদের ছবি ও উজ্জ্বল কিছু প্রাক্তন ছাত্র — যাঁরা ছাত্রদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের স্থান দেওয়া হয়েছে সংরক্ষণ শালার। অনেক কাজ এখনও বাকী রয়েছে— আগামী দিনে আরও তথ্য উপকরণ সমৃদ্ধ আরও আকর্ষণীয় হবে সংগ্রহশালাটি এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

শতোত্তর রজতজয়ন্তী বর্ষ পালনের মূল অনুষ্ঠান হবে ৪, ৫,৬ জানুয়ারি, ২০০৮। একটি শিক্ষামূলক মেলার আয়োজন করার কথা ছিল ঐ সময়ে। সময় ও অর্থের টানাটানিতে তা আর হয়ে উঠল না। বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানগুলির সাফল্য আমার সহকর্মীদের ব্যর্থতার দরকার আমার।

আমাদের পরম শ্রদ্ধের প্রয়াত শিক্ষক পাঁচুগোপাল রায়-এর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'হে অতীত কথা কও' যাতে বিদ্যালয়ের ইতিহাস রুদ্ধ আছে শতবর্ষে। অসমাপ্ত ইতিহাসের গুরুদায়িত্ব পড়েছে শিক্ষক অরুণাভ চক্রবর্তীর উপর। অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে তা সম্পন্ন করেছেন। নব কলেবরে সেই ইতিহাস প্রকাশিত হবে ৪ঠা জানুয়ারি।

বিদ্যালয়ের ইতিহাসে পাওয়া যায় সরকারী হিসাবে অনুযায়ী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ৬-১-১৮৮৩ সালে। ঠিক একশ পঁচিশ বছর পর ঐ দিনেই উৎসবের উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

৫ জানুয়ারি হবে 'চিরন্তনী' পুনর্মিলন উৎসব আর ৬ তারিখে মিলন মেলা — সেখানে অতীত আর বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটবে।

স্কুলের সাফল্যের ইতিহাসে এক ইংরেজ T. E. Coxhead সাহোদর অবদান স্মরণীয়। তাঁর স্বপ্ন ছিল বড় রাস্তার ধাপে বেশ বড় বাড়ি, সামনে বড় মাঠ। তিনি চেয়েছিলেন স্কুল সংলগ্ন একটি বড় হল। তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। একটি ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। পুরোদমে। সেটি দ্বারোদঘাটন ঘটবে ৪ঠা জানুয়ারি, ২০০৮। সানাই-এর সুর, অতিথি আগমন আর ছাত্রদের কাকলিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠবে — আমরা স্বপ্ন দেখব, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব এই বিদ্যালয়টিকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতসেবা করে তোলার।

প্রাক্তনীর ডায়েরী (১৯৩৪-৩৭)
মো. মোকসেদ মণ্ডল

(আমার পিতা জা. মো. মোকমেদ মণ্ডল ১৯৩৪-৩৭ পর্যন্ত বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। কৃতি ছাত্র হিসাবে মহসিন ফাণ্ড-এর বৃত্তি পেয়ে তিনি সপ্তম শ্রেণিতে এই বিদ্যালয়ের ভর্তি হন। তবু দুঃস্থ ছাত্র হিসাবেও তিনি কর্তৃপক্ষের আনুকুল্য লাভ করেন। তাঁর ডায়েরির পাতায় পাতায় তিনি যেমন সে-কথা অকপটে স্বীকার করেছেন তেমনি এই সময়কালের বহু অজানা তথ্যও তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। (১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। আরবী বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় পুরস্কৃত হন। পরে বর্ধমানের রোল্যাণ্ডসে মেডিক্যাল স্কুল থেকে তিনি এল. এম. এফ. পাশ করেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি শহরের একটি নার্সিং হোমের আর এম ও পদে ছিলেন। পুনর্জীবন নার্সিংহোমে ১৯৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি তিনি প্রয়াত হন। তাঁর ডায়েরির ধূলিধূসর পৃষ্ঠা থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরা হল।

সংকলক ঃ শফিরুল হক, শিক্ষক ও সাংবাদিক

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষে জুনিয়র মাদ্রাসার ফল প্রকাশিত হল। আমি বর্ধমান বিভাগের মধ্যে প্রথম ও ঢাকা বোর্ডে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করি। এ জন্য আমাকে মাসিক পাঁচ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়া কুলগড়িয়া জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা থেকে জানানো হয়।
সে বছর ২ ফেব্রুয়ারি ছিল বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ভর্তির শেষ তারিখ। আমাদের কান্টিয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী বালিয়াড়া গ্রাম। ওই গ্রামের পণ্ডিতমশায় আমাকে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের লইবার জন্য জনৈক শিক্ষককে ভার দিলেন। তিনি পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তো স্কলার। আমি বলিলাম, হ্যাঁ স্যার।
যাহা হউক, প্রধান শিক্ষক আমাকে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়া লইবার অনুমতি দিলেন। তাঁহাকে যখন ফ্রি স্টুডেন্টশিপ-এর কথা বলা হইল তিনি সার্টিফিকেট দেখিয়া বলিলেন ও মহসিন ফাণ্ড। তা মাহিনা দেবার জন্যই তো টাকাটা দেওয়া হচ্ছে। আমি তাঁহাকে বোঝাতে লাগিলাম, স্যার জুনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করায় আমি এই স্কলারশিপ পাইয়াছি। তিনি তখন বলিলেন, ফ্রিশিপ-এর জন্য তা হলে একটা দরখাস্ত করে দিও। পরে মিটিং হলে আমাকে প্রথম বছরের জন্য হাফ ফ্রি শিপ মঞ্জুর করা হয়। আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমার স্কুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ মঞ্জুর করা হয়। মহসিন ফাণ্ড-এর পাঁচ টাকা ছাড়া মাসিক তিন টাকা করিয়া আরও একটি বৃত্তি আমি পাইলাম। ইন্টারস্কুল কমপিটিশনে প্রথম হওয়ায় আমার শেষোক্ত এই বৃত্তি লাভ সম্ভব হয়েছিল।
১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। সেবার বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল থেকে ৬৩ জন ছাত্র পরীক্ষা দেয় এবং সকলেই পাশ করে। স্কুলের ফার্স্ট বয় শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল ৪টি বিষয়ে লেটার ও স্টার পায়। সেকেণ্ড বয় শ্রী শ্যামলচন্দ্র ব্যানার্জী ৪টি বিষয়ে লেটার ও স্টার পায়। থার্ড বয় শ্রীবিমলচন্দ্র চ্যাটার্জী ৩টি বিষয়ে লেটারসহ স্টার পায়। আরও অনেকে দু-একটি বিষয়ে লেটার বিষয়ে ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হই। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে ২০ টাকার সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল পরে ডি পি আই-এর সম্মানজনক পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন।

হেডমাস্টার আদ্যনাথ চ্যাটার্জী ঃ তিনি ছিলেন এম এ পাশ। ভাল ছাত্র হিসাবে পরিচিতি পাওয়ায় তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। কোনদিন ক্লাশে অনুপস্থিত হইলে তিনি খোঁজখবর করিতেন। তাঁহার পুত্র শ্রীবিমলচন্দ্র চ্যাটার্জী আমার সহপাঠী ছিল। সে এম বি পাশ করিয়া গলসীতে ডাক্তারি করিতেছে। হেডমাস্টার মহাশয় খুব সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। খেলার মাঠে আমাদের সহিত খেলা দেখিতে যাইতেন। ডিবেটিং ক্লাশে আমাদের সহিত ডিবেট করিতেন এবং মিলাছন্নবী ইত্যাদি কর্মসূচীতে আমাদের সঙ্গী হইতেন। তিনি আমাদের খুবই প্রিয়জন ছিলেন।